বিপ্লব-তীর্থে

[বিনয়-বাদল-দীনেশ]

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

বীণা লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীসুরেন্দ্রলাল সরকার
বীণা লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৩
মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীনলিনীরঞ্জন দাশ
সবিতা প্রেস
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

"বিপ্লবতীর্থে" বইখানা বিপ্লবী-বাঙলার পটভূমে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তর জীবন-ইতিহাস। বইখানা গল্পের টেক্‌নিকে লেখা হলেও বিনয়-বাদল-দীনেশের কর্ম্মজীবনের ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম এতে অণুমাত্র-ও ঘটেনি। এই তিনটি বীর শহিদের নাম ব্যতীত তাঁদের সহকর্ম্মী বা নেতাদের কারো যথার্থ নামই এতে দেয়া হয় নি। নামগুলো ব্যক্ত না করার মূল কারণ হলো, বিনয়-বাদল-দীনেশের বহু বন্ধু আছেন যাঁরা আজো অনামী থাকতে চান। ব্যক্তিক-পরিচয়ে পরিচিত না-হয়ে এ-ক্ষেত্রে শহিদত্রয়ের মধ্য দিয়েই নিজেদের পরিচয়কে অক্ষয় কোরে রাখার চেষ্টা তাঁদের ভাল লাগে। তা ছাড়া এ পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে যেসব কল্পিত নামের উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে তৎকালীন 'বি. ভি' কর্ম্মী বা 'বি. ভি'-র নেতৃবর্গ অনেক সময়ই মিলেমিশে আছেন। কোন কল্পিত নাম-ই কোনো ব্যক্তিবিশেষকে একান্ত কোরে বুঝায় না। আরো একটি কথা—বিনয়-বাদল-দীনেশ যে-দলের সভ্য ছিলেন সেই দলের কর্ম্মইতিহাস শুধু নয়, প্রাসঙ্গিক ভাবে অপরাপর দলের ইতিহাসের কথাও (অন্তত প্রথম পরিচ্ছেদে ও পরিশেষে) গল্পের ছাঁচে আলোচ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে। কারণ, যাবতীয় বিপ্লবীদলগুলোর সমন্বিত ইতিহাসের পশ্চাদ্‌ভূমিতেই কেবল তৎকালীন বাঙলার যেকোন দল-বিশেষের পরিচয়-প্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে। একেবারে আলাদা কোরে কোন দলের কথা লেখা অবাস্তব হতে বাধ্য। বিপ্লব-ধারাকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের কোন তরঙ্গশীর্ষকে বোঝা চলে না। বাঙলার বিপ্লবধারার এক-একটি তরঙ্গশীর্ষ হলো ছোটবড় এই বিপ্লবীদলগুলো।

সংগোপনে লালিত বিপ্লবীদলগুলোর সার্ব্বিক সাধনার পরিস্ফুরণ হোতো এক-একটি 'কাজ' বা **action**-এর মধ্য দিয়ে। বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎ ঝলসে যেত জনসাধারণের চোখ শহিদের দুঃসহ এই কর্ম্মশিখায়। চমক অস্তে আঁধারে লুক্কায়িত গগনের

মতই বিপ্লবীর জগৎ-ও লোকচক্ষুর অগোচরে যেত বিলুপ্ত হয়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ-উৎসকে বাদ দিয়ে যেমন বিদ্যুতের অস্তিত্ব মিথ্যে—বিপ্লবীদল ব্যতীত-ও তেমনি শহিদের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা মিথ্যে শুধু নয়, অর্থহীন। কোন শহিদই একজন অনন্যসংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষ বা **isolated individual** মাত্র নন। তিনি সমগ্র দলের সারাংশ, সমগ্র দলের কর্ম্ম ও সাধনার মানসপুত্র তথা প্রতীক।

এ জন্যেই পুস্তকের শেষে "বিনয়-বাদল-দীনেশ যে-দলে ছিলেন" এবং "মেদিনীপুরে দীনেশগুপ্ত অর্থাৎ বি-ভি" নামক প্রবন্ধদ্বয় সন্নিবেশিত কোরেছি। এই প্রবন্ধদ্বয়ের প্রথমটি সাপ্তাহিক ভারত-পথিকের এবং দ্বিতীয়টি ('দীনেশের মেদিনীপুর' নামে) চাবুকের শহিদ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লিখিত দুইটি প্রবন্ধেই শহিদত্রয় যে-দলের সভ্য ও স্বেচ্ছাসৈনিক ছিলেন সেই দলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা কোরেছি।

পুস্তকের শেষাংশে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে লিখিত ফাঁসির অপেক্ষায় বন্দী দীনেশগুপ্তর অপূর্ব্ব পত্রাবলীও অধুনালুপ্ত **বেণু** পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

বিনয়, বাদল ও দীনেশের ব্লক্ তিনখানা চাবুক-সম্পাদক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র সাহার সৌজন্যে পাওয়া গেছে।

এই গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য পেয়েছি কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধুর। তাঁদের ঐকান্তিকতা ও সহানুভূতি পরম সৌভাগ্যলব্ধ এক বস্তু। অধিকন্তু গ্রন্থ-প্রকাশনের জন্য প্রকাশকের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাবদ্ধ।

১০৪-সি কড়েয়া রোড,
কলিকাতা—১৭,
পার্ক্ সার্কাস

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

উৎসর্গ-পত্র

মাতৃদেবী এবং স্বর্গগত পিতৃদেবের

আশীর্ব্বাদ কামনায়

শহীদ বিনয় বসু
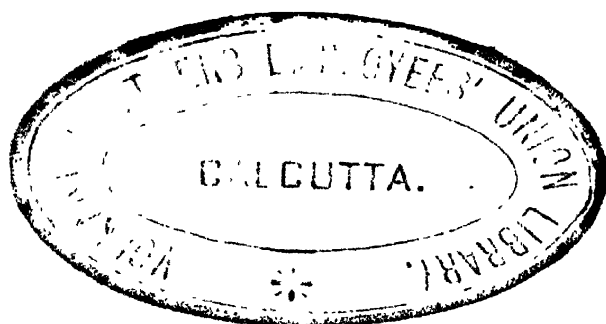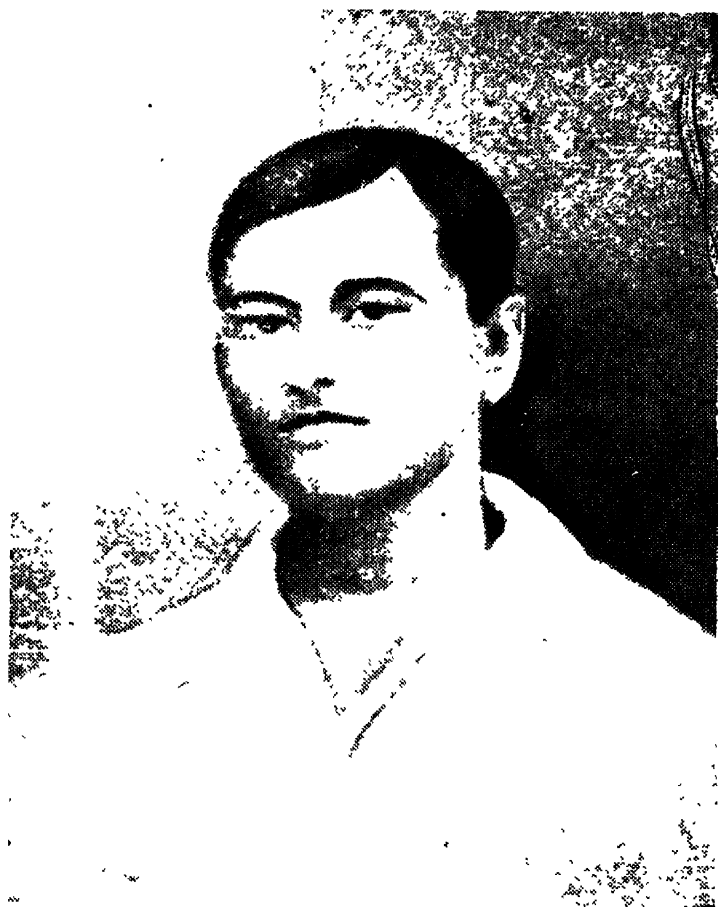
প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

তোমার আলোয় নাইতো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।

রবীন্দ্রনাথের এ-গানখানি তন্ময় হয়ে গাইছে সম্পূর্ণা। ঘরে কেউ নেই। তখনো সন্ধ্যা নাবে নি। মাঘের শেষ। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে আছে। বাতায়ন পথে দূর গগনে অস্তগামী সূর্য্যের করুণ আসক্তি শ্বসিয়ে উঠেছে সেই গানের মর্ম্মে। সম্পূর্ণার পরিপার্শ্ব তাই আরো ধ্যানঘন, বাক্‌হীন-স্পন্দনে আরো গম্ভীর অথচ জীবন্ত।

সম্পূর্ণা আলগোছে পিয়ানোর ঘাটে ঘাটে আঙুল বুলিয়ে যায়। সুর অনায়াসে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। কণ্ঠ তার সেই সুরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিগন্তের পায়ে নিবেদন জানায়। এলো চুল পিঠ ছাপিয়ে দুলতে থাকে। দু'এক গাছি অলক উড়ে উড়ে মুখের উপর এসে পড়ে। কানের অলঙ্কারে স্তিমিত সূর্য্যালোক চক চক করে। দুইটি বাহুলতায় নিটোল গরিমা। অনাড়ম্বর বেশবিন্যাসে একটু বৈশিষ্ট্য, একটু সংস্কৃতির বিভা। শ্যামোজ্জ্বল আনন জুড়ে সুদূরলোভী সুখানুভূতি।

সম্পূর্ণার মাথার উপরে, সম্মুখের দেয়ালে টাঙ্গানো একটি বৃহৎ ছবি। দুর্দ্দান্ত এক ঘোড়া উড়ে চলার বেগে লম্ফ দিয়েছে—তার সওয়ার ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। রাণীর হাতে উন্মুক্ত অসি—বিদ্যুৎফলার মত। চোখে তাঁর দ্যুতিশিখা। মুখে পথ-কণ্টক অমূল উপড়ে ফেলে এগিয়ে চলার একাগ্রতা। সম্পূর্ণারই হাতে আঁকা এই ছবি।

ক্রমে সূর্য্য ডুবে গেল। সম্পূর্ণার কণ্ঠ করুণতর হয়ে-হয়ে নৈঃশব্দ্যে ঢলে পড়ল। ভাবস্তব্ধ সম্পূর্ণা। রাণীর আলেখ্য পানে তাকিয়ে থাকলো সে কতকক্ষণ। তারপর পশ্চিম-আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কোরে স্থির হয়ে বোসে রইল সে। যেন সর্ব্বব্যাকুলতা-বিজয়িনী ধ্যানী শবরীর প্রতীক! দেহ মন জুড়ে তার বুঝি সন্ধ্যার হাত ধোরে আবির্ভূত হয়েছে সাধনার নিঃসীমতা।···

'দিদি!'—কোমল কণ্ঠের আহ্বানে সম্পূর্ণার তপস্যা ভেঙ্গে গেল। পেছন ফিরে তাকিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বল্ল সে: কখন এলি, উত্তর?

—অনেকক্ষণ।

—অনেক ক্ষণ! সে কতক্ষণ? আমি টের পাই নি তো?

—টের পাবে কি কোরে? তুমি কি তোমাতে ছিলে?··· উঃ, কি অদ্ভুত গান-ই না গাইছিলে, দিদি!

সম্পূর্ণা সলজ্জ-হাসি সামলে নিয়ে কপট শাসনের সুরে বল্ল: ডেঁপোমি হচ্ছে বুঝি? তামাসা দেখ্‌ছিলে? ডাকিসনি কেন, দুষ্টু?

—আমি-ই-তো তোমায় ডাকলাম, দিদি? ওরা তো চোখ বুজে পাশের ঘরে বোসে-বোসে এখনো গানই শুনছেন।

সম্পূর্ণা ব্যস্ত হয়ে উত্তরের হাতখানায় ঝাঁকুনি দিয়ে বল্ল : ওরা কারা? কই? কোন্ ঘরে?—বোলেই ছুটে সে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পাশের ঘরে ঢুকে সম্পূর্ণা বিব্রতভাবে আগন্তুকদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে চেষ্টা সত্ত্বে-ও কোন কথা বেরুলো না।

দুই

তক্তাপোষের উপর অপরিচিত তিনটি যুবকের সংগে প্রৌঢ় বিপুলদা বোসে আছেন। বিপুলদার চোখের দৃষ্টিতে সুদূরের মায়া। সম্পূর্ণা ঘরে ঢুকতেই তা'র পানে গভীর ভাবে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তিনি তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাছে এগিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণার মাথায় নিজের হাতখানা রেখে সস্নেহে তিনি বল্লেন : তোর এ-সন্ধ্যার সাধনা ব্যর্থ হোতে পারে না, বোন্। মহা-মৃত্যুর ছায়াবিহীন আলো দিয়ে অন্ধ দেশবাসীকে পথ-চলার আলোক তোরা দিতে পারবি—সত্যি পারবি।···

—আপনার এ-বাণী সত্য হোক।—বিপুলদাকে হেঁট হয়ে প্রণাম কোরতে কোরতে আবেগ ভরে বলে সম্পূর্ণা।

বিপুলদা কিছুক্ষণ দূরমনস্কের মত চুপ কোরে থেকে সহসা সহজ হয়ে বোল্লেন : ভাল, তোকে তাগিদ দিতে এলাম। ভুলিস নি তো আমার নেমন্তনের কথা?

সহাস্যে সম্পূর্ণা বলে : সর্ব্বনাশ, ও কি ভুলবার বস্তু? তা' এ-জন্যেই অত কষ্ট কোরে কেন এলেন, দাদা?

—তোরা সবাইতো অনেক কষ্ট কোরে পাওয়া ভাইবোন। তোদের কাছে আসায় আবার কষ্ট নাকি?···যাকগে, উত্তরকে রেখে

যাচ্ছি—তোর সাথী হবে সে। ঠিক সাড়ে সাতটায় পৌঁছে যাস কিন্তু।

তৎপর বিপুলদা যুবকদেরকে সহাস্যে বল্লেন : কি গো, তোমরা উঠবে না? গান শুনে যে হারিয়ে গেলে! চোক বোজার পালায় আর কাজ নেই—চল, চল।

যুবকত্রয় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। একজন বল্লে : আপনারা সম্মোহন-বিদ্যা জানেন যে, দাদা! নইলে গানের আসরে কোন কালে কথা বন্ধ করি নি, কথা-বলার তাগিদ-ই বরঞ্চ পেয়ে এসেছি চিরকাল! ··

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। বিপুলদার খোলা হাসি সবার হাসি ছাড়িয়ে জানালা-পথে বহু দূরে ভেসে গেল। সম্পূর্ণা-ও অনাবিল হাসির সেই উৎসবে যোগ না-দিয়ে পারল না।

—আচ্ছা, আসি বোন।—বোলেই যুবকত্রয়কে সংগে নিয়ে বিপুলদা পথে নেবে গেলেন। অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ওতে উঠে বোসতেই কোচোয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে পৃথিবীর সব কিছুকেই অকথ্য গালি দিতে দিতে তীব্র বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। সম্পূর্ণা দোতলার জানালা থেকে নিরীক্ষণ কোরে কোচোয়ানকে দেখে নিল। তার ওষ্ঠে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। ততক্ষণে গাড়ি গলির বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে কোচোয়ানের হিন্দুস্থানী কণ্ঠ :

"ম্যাঁয় মরুঁ কাটারি মার্,
পাপইয়া বোলী বোলে!"

তিন

টালিগঞ্জের বর্ত্তমান ট্রাম ডিপো পেরিয়ে হাঁটাপথে কিছুদূর এসে একখানা ছোট্ট একতলা বাড়ি। সহরের উপান্তে গ্রামের মত স্থান। বাড়িটা পুরানো। সদরদরজা আলগোছে ভেজান। রাস্তার সুমুখের ছোট্ট ঘরে বড় একখানা মাদুর বিছান। বিপুলদা একাকী বোসে আছেন। হেরিকেন লণ্ঠন জ্বলছে পাশে। মাঝারী গোছের একটি কাঠের আলমারি ভরা বই। আলমারীর উপর রাশিকৃত পুরাতন খবরের কাগজ। ঘরে আসবাবপত্রের বালাই নেই। দেয়ালে টাঙ্গানো ভারতবর্ষের একখানা বিরাট মানচিত্র, তাতে রেল-লাইনের রেখাগুলি খুব স্পষ্ট কোরে চিহ্নিত।

বিপুলদার সম্মুখে শূন্য চায়ের পেয়ালা এবং ইতস্তত ছড়ান দৈনিকপত্র কতগুলো। ঠিক সাড়ে সাতটার ঘরে ঘড়ির কাঁটা এলো কিনা দেখবার জন্যে বুকের পকেট থেকে ব্যাণ্ড্‌বিহীন হাতঘড়িটা তিনি খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ভেজান দরজা ঠেলে সম্পূর্ণা ও উত্তর এসে ঘরে ঢুকলো।

—তবে আর ঘড়ি দেখলাম না। তোমাদের পায়ের ধ্বনিতেই সাড়ে সাতটার ঘণ্টা বেজে উঠল!—সহাস্যে বিপুলদা বল্লেন।

সম্পূর্ণা: তবু তো ঘড়ি দেখতে যাচ্ছিলেন? এক সেকেণ্ড্ অপেক্ষা কোরেই না হয় আমাদের পাংচুয়ালিটির জ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষা নিতেন?

—ঘাট হয়েছে, বোন। যাক, যাক- বোসো।...হাঁ, একটু চা কোরে নিয়ে আসি—নেমন্তন তো?

—থাক, আর আপ্যায়নে কাজ নেই! আপনি চা খাবেন তো বলুন—আমি কোরে নিয়ে আসছি। উনুনে আগুন রেখে গেছেন কি সাধের ভৃত্য?

—তা রেখেছে। টুক কোরে তা হলে তিন পেয়ালা চা কোরে আনো, লক্ষ্মী মেয়ে। চায়ে চুমুক না দিলেতো তোমার মাথাই খোলে না?

—আমার?—বোলেই একটু হেসে সম্পূর্ণা ভিতরে ঢুকে গেল।

বিপুলদা স্মিতহাস্যে উত্তরের পানে তাকালেন। বল্লেন তাকে: খুব সাবধানে এসেছিস তো? কেউ দাঁড়িয়েছিল কি রাস্তার মোড়ে বা আশপাশে?

সোৎসাহে উত্তর বলে চলে: না দাদা, আমরা ট্যাক্সি বোদলে-বোদলে নানা পথ ঘুরে শেষটায় পায়ে হেঁটে আপনার বাসায় এসেছি। কেউ টের পায় নি।

বিপুলদা: তোর দিদি যখন বাসা থেকে বেরুলেন তখন তাঁর মা কিছু বলেন নি?

উত্তর: জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কখন তিনি ফিরবেন।

—হুঁ, বোলেই বিপুলদা চুপ কোরে গেলেন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তিন কাপ চা নিয়ে সম্পূর্ণা ঘরে ঢুকলো। লোলুপ-দৃষ্টিতে চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে বিপুলদা নড়ে বসলেন। তারপর পেয়ালা টেনে নিয়েই চোঁ কোরে এক চুমুক চা গলাধঃকরণ কোরতে কোরতে একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

সম্পূর্ণা সস্নেহে বিপুলদার পানে তাকিয়ে নিজেও পেয়ালায় চুমুক দিল। তারপর সহাস্যে বল্লে: দাদা, খাদ্যের মধ্যে এই চা-ই কেবল আপনাকে উৎসাহিত করে। আপনি লোভাতুর শিশুর মত একটি বস্তুর জন্যেই সকল সংযম বিসর্জ্জন দেন। হাত পুড়িয়ে এই তো কিছুক্ষণ আগে নিজে চা তৈরি কোরেছিলেন—আবার

আমি আসতেই আমার-ও হাত-পোড়ান চাই। বাব্বাঃ, কী নেশাখোর মানুষ!

দুষ্টু-হাসি হেসে বিপুলদা বল্লেন: আরে পাগলী, গরীবের ঐ একটি খাদ্যইতো রয়েছে! শস্তায় সে তোমাকে খোরাক দিচ্ছে, নেশা দিচ্ছে, ভদ্রতা রক্ষা করার সুবিধে দিচ্ছে। তুমি সম্পূর্ণা দেবী—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারিণী বিত্তশালী-পিতার একমাত্র তরুণী কন্যা—আজ আমার গৃহে আমন্ত্রিতা! তোমাকে ঐ এক পেয়ালা চা দিয়ে-ই তো বিদায় কোরতে পারছি, কোন সংকোচ হচ্ছে-না। শুধু তা-ই নয়—আমার মহামান্য অতিথি শ্রীউত্তর এবং আমি-ও তোমার সংগে একত্রে বোসে এ হেন ভোজের অংশীদার হতে পারছি। বল বোন, চা বিহনে আর কোন দ্রব্যে এ সম্ভব হত?

ইতিমধ্যে বিপুলদার শূন্য পেয়ালা মাদুরের উপর স্থাপিত হয়েছে দেখে সম্পূর্ণা পাশের ঘর থেকে কেত্‌লিটা এনে ঐ পেয়ালাটা ভরে বাকি চাটুকু ঢেলে দিতে দিতে বল্ল: শেষ হয়ে গেল কিন্তু।

বিপুলদা: তা হোক। সবটুকু ঢালো। হাঁ, বড্ড বেশি হয়ে গেল। যাক্, সারাদিনে এই একুশ কাপ হতে যাচ্ছে।

চোখ কপালে তুলে সম্পূর্ণা বল্ল: একুশ কাপ? বলেন কি! ভাতটাত কিছু খেয়েছেন? খান নি নিশ্চয়? এ কোরলে শরীর থাকবে কি কোরে?

—খেয়েছি, খেয়েছি। অন্তত ছ'বার ভাত খেয়েছি।

—কিচ্ছু খান নি। আমায় মিথ্যে ভোলাচ্ছেন।—সম্পূর্ণার কণ্ঠ ভারী হয়ে এল।

চা পান সমাপ্ত হতেই বিপুলদা গম্ভীর হয়ে উঠলেন। উত্তরের পানে তাকিয়ে বল্লেন: তুই এবার চলে যা, ভাই। সিধে বাড়ি যাস কিন্তু।...

কিশোর উত্তর নিশ্চুপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।...

টালিগঞ্জের এই পাড়াটা শীতের সাড়ে সাতটায় নিশুতি রাতের রূপ ধারণ করেছিল। জনমানবের সাড়া নেই। বিপুলদার গৃহে অপর প্রাণী ছিল না। সম্পূর্ণা ও বিপুলদা মুখোমুখি বসে আছেন গম্ভীর হয়ে। দূরে টিম্ টিম্ কোরে জ্বলছে হেরিকেন। এত নিস্তব্ধতায় পকেটের ঘড়িটার টিকটিক শব্দ-ও যেন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল।

মিনিটখানেক পর বিপুলদা ধীর কণ্ঠে বলে চল্লেন: শোনো সম্পূর্ণা, আজ এক বিশিষ্ট লগ্নে তোমায় আমি যে সব কথা বোলে যাব তার গুরুত্ব একান্ত।...তুমি জান, এই পদানত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির স্বপ্ন আমরা দেখে এসেছি। তুমি জান, সেই স্বপ্নকে রূপ দেবার কামনায় বন্ধুর দল সংগঠিত শক্তিতে কর্ম্মমুখর। কিন্তু তুমি জানো না, আমাদের এই কর্ম্মযাত্রা ইংরেজের কবল থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করার কাজে কত সামান্য। আজ তোমাকে তাই আমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতার পূর্ণ ইতিহাস জানিয়ে, সমস্ত সত্য উদ্ঘাটিত কোরে তোমার পথ চলার নির্দ্দেশ দিয়ে যাব।... আমার সংগে হয়তো বহুদিন কারো-ই দেখা হবে না। বিপ্লবী দলের নিয়ম অনুসারে কোথায় কি কাজে যাচ্ছি তা তোমাকে জানাতে পারছি না। কিন্তু এইটুকু জেনো, আমি যেখানেই থাকি—কর্ম্মসূত্রে তোমাদের সংগে সংযোগ আমার থেকে যাবে নিশ্চয়ই।

সম্পূর্ণা: দেখা না হলে আমি কার সংগে রাখবো প্রতিদিনের যোগাযোগ? কে আমাকে আপনারই মত কোরে বুঝে পথ-চলায় কোরবে সাহায্য?

—সব হবে, বোন। সব কিছুই ঠিক কোরে দিয়ে যাব আজ।...হাঁ, শোনো, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কর্ম্মক্ষমতা সম্পর্কে

তুমি সবকিছু জেনে নাও। আমাদের শক্তি ও দুর্ব্বলতার সংবাদ গ্রহণ করো। তারপর স্থির কর কি ভাবে কেমন কোরে তুমি কাজ কোরবে।···ছাখো সম্পূর্ণা, এই ভারতবর্ষ তেত্রিশ কোটি নরনারীর বাসভূমি। কিন্তু বিপুল এই জনসংখ্যার মধ্যে তুমি মানুষের মর্য্যাদায় বসাতে পার এমন লোক আজ দশবিশ হাজারে একটিও পাবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং অমানুষের ভিড়ে বোসে মনুষ্যত্বের বাণী শোনাতে চাইবে যখন, তখন তুমি জেনে রেখো, তোমাকে সর্ব্ব-কঠিন বাধা পেতে হবে ঐ তাদেরি কাছ থেকে যাদের ভাল তুমি চাইছ।···গুটিকয় যুবকযুবতী—যাদের চোখে আছে স্বপ্ন, বুকে আছে দরদ, অন্তরে আছে বীরের কামনা—তারা সহ্য কোরতে পারল না পরাধীনতার জ্বালা। তারা সর্ব্বস্ব পণ কোরেছে স্বাধীনতা পবার আশাকে জাগ্রত করার সাধনায়। তারা জানে, বিপুল ভারতবর্ষের স্বাধিকার-লাভ অসম্ভব, বিপুলতর জন-জাগরণ ব্যতীত। তারা জানে, মুষ্টিমেয় যুবকযুবতীর সাধ্য নয় ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষময় স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা।

—তা আমিও জানি, দাদা।

—তুমিও জান? খুব ভাল কথা। কিন্তু যা হবে না, যা পারবোনা তার পেছনে আমাদের এই ছুটে-চলা কেন তা-ও কি তুমি জানতে পেরেছ?

— না।

—তবে শোনো। আঁধারাচ্ছন্ন এই মহাদেশে মানুষের দল নিজেদেরকে পশুর পর্য্যায়ে যে নিয়ে গেছে তা-ও তারা জানে না। তারা জানে, তাদের আকাশে সূর্য্য নেই। তারা জানে, তাদের ধমনিতে যে-রক্ত বয় তা' উষ্ণ নয়। তারা জানে, ইংরেজ-'দেবতা'র

পায়ে ছাগ-রূপী ভারতীয়দের বলি হবার বিধান বিধাতা-দত্ত। কিন্তু তারা জানে-না, নির্ব্বাপিত জীবন-শিখা জ্বালিয়ে তুলবার ক্ষমতা তাদের মধ্যে-ও সুপ্ত। তারা জানে-না, তাদের হুংকারে পৃথিবী টলে উঠতে পারে, ব্রিটিশের মসনদ ধুলোয় গুড়ো হয়ে যেতে পারে।…আজ তোমার-আমার মত বিপ্লবীদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই অগণিত নরনারীর প্রাণে আশার প্রবাহ সঞ্চারিত করা। তমসাক্লিন্ন তাদের জগতে আলোকের দীপ্ত-শিখা জ্বালিয়ে ধোরে তাদেরকে শোনাতে হবে—তোমাদের গগনে ঘটেছে অরুণোদয়; ওঠো, জাগো।…মৃত্যুকে ভয় করে-না এমন বীরবৃন্দের আনাগোনা যে-জাতির জীবনভূমিতে পরিস্ফুট, সে-জাতি তার বাঁচার পথ খুঁজে পেতে বাধ্য।…

সম্পূর্ণা ঃ নিঃশেষে জীবন দিয়ে আমরা গুটিকয় মানুষ যে-আলো জ্বালিয়ে দেব, তাতো আমাদের মৃত্যুর সাথেসাথেই যাবে নিঃশেষে নিভে ?

—তার প্রতিকার তোমাদেরই করে যেতে হবে। তোমরা জ্বালবে দীপশিখা—সে-শিখা থেকে শিখা গ্রহণ কোরে অনির্ব্বাণ আলোকচ্ছ্যতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে ততদিন পর্য্যন্ত, যতদিন না জনসাধারণের চোক্ষে সেই আলোকচ্ছটা স্থায়ী প্রাণোল্লাস তুলেছে। শহিদের পর শহিদ এসে অক্ষয় কোরে রাখবেন আলোকের মিছিল—তারপর সেই আলোকস্নানের অক্ষুণ্ণ ধারায় বিরচিত হবে গণ-স্বার্থে গণ-জাগরণের ইতিহাস।…'আমি বেঁচে আছি', 'আমি বেঁচে থাকবো'—এই বোধ একদা সাধারণ্যের ইচ্ছায় দীপ্ত হয়ে উঠলেই ভারতবর্ষের সত্যিকারের স্বাধীনতালাভ হবে সম্ভব।

—আমাদের কি কোরতে হবে তা-ই বলুন, দাদা।

—বহুর জন্যে মুষ্টিমেয়কে ত্যাগ কোরতে হবে সর্ব্বস্ব। এবং সেই ত্যাগব্রত উদযাপন পর্ব্বেই হয়তো ঘটবে আমাদের এ-জন্মের কর্ম্ম-অবসান। কিন্তু, বোলেছিতো, আমাদের ধারা যাতে নিঃশেষ না-হয়ে যায়, তার বহমানতা যাতে অটুট থাকে—সে-চেষ্টাও আমাদেরই কার্য্যক্রমের অন্তর্ভূ'ক্ত।

বিপুলদা একটু চুপ কোরে রইলেন। এমন সময় দোরগোড়ায় একটি ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল। বিপুলদা সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন কোরলেন: পশুপতি নাকি ?

—হ্যাঁ।—বোলেই একটি তরুণ ঘরে ঢুকলো। তার পরনে পায়জামা, গায়ে ঝুলদার কামিজ, মাথায় ফেজ, চোখে নীল চশমা। ঘরে ঢুকেই টুপি ও চশমা খুলে মাদুরের উপর বোসে পোড়ে সে বল্ল: দেরি হয় নি তো ?

বিপুলদা ঘড়ি খুলে বল্লেন: তোমার হবে দেরি ?·· Just in time !

তারপর পূর্ব্ব মূড্-এ মনকে ফিরিয়ে নিয়ে শুরু করলেন তিনি: হ্যাঁ, শোনো সম্পূর্ণা, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু বোলেছি তো, যেখানেই যাই কর্ম্মসূত্রে থাকবো তোমাদের সংগে বাঁধা। পশুপতিকে তুমি ভাল কোরে চেন এবং জান। তোমরা বিপ্লবীদলে পরস্পরের বন্ধু ও সাথী রূপে কাজ কোরে যাবে। বিরাট যুদ্ধ বেঁধে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৪ সাল এক যুগপরিবর্ত্তনকারী কাল। এই কালের যাত্রী আমাদের হতে হবে। ইংরেজের শত্রু জর্ম্মানি—জর্ম্মানি তাই ভারতবর্ষের বন্ধু। আমরা জর্ম্মানির সাহায্যে ইংরেজকে হানবো মারণ-আঘাত, আমাদের দুরন্ত দুঃসাহসিকতায় ভারতবর্ষ

স্বাধীন হোক আর না-ই হোক ভারতবাসীর বুকে সঞ্চিত হবে সাহস, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পথ হবে সন্নিকট।

সম্পূর্ণা ঃ আমার কি করণীয় তা বোলে যান, দাদা।

বিপুলদা আরো গভীর হয়ে ঃ তুমি তোমার মনের রঙ্ ফলিয়ে লক্ষ্মীবাঈয়ের আলেখ্য এঁকেছ না? সেই আলেখ্যকেই জীবনের রঙে রঙ্ ফলিয়ে সারা সত্তা দিয়ে গ্রহণ কর।···পুরুষ ও মেয়েতে মিলে এই দেশ। এই দেশের পরাধীনতা এবং সকল দুর্ব্বলতা-গ্লানি-ক্লৈব্য মেয়ে ও পুরুষের মধ্যেই বর্ত্তমান। প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষ 'মানুষ' না-হয়ে উঠলে স্বাধীনতা আসবে না, স্বাধীনতা এলেও তাকে জন-কল্যাণে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। নারী-জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে নারীকে। তুমি সেই ভার গ্রহণ কর। পশুপতির মারফত ছেলেদের সংগে তোমার যোগ রাখবার ব্যবস্থা আমি কোরে যাব। বাঙলা দেশে আমাদের সংঘের জন্য ছোট একটি কার্য্যকরী-সভা আমি গড়ে দেব—তার সভ্যা রূপে তুমি সংঘ-পরিচালনার দায়িত্বে অংশ নেবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংগে যাতে তোমাদের যোগাযোগ থাকে তার বন্দোবস্ত ও করে দেবো যথাসময়ে।

সম্পূর্ণা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তার আননে তখন সুদূরমনস্কতার চিহ্ন। নয়নে ভবিষ্যৎ আশা ও উত্তেজনার ছায়াপাত। মনের কানায় কানায় বহুর মুক্তিযজ্ঞের অগ্নিস্পর্শ।···

বিপুলদা বল্লেন ঃ অজিত, আশু ও নিরঞ্জনকে আসতে বোলেছি। তারা দশ মিনিটের মধ্যে এসে যাবে। তোমার বাড়ি তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলাম আজ, কিন্তু পরিচয় করিয়ে দেই নি তখন। অনলস কর্ম্মী তারা। বিপ্লবের বন্ধুরূপে পরিচয় করিয়ে দেব এখন।

তারপর পশুপতির দিকে তাকিয়ে হাল্কা-কণ্ঠে বল্লেন বিপুলদা : হ্যাঁরে, তুই খেয়ে এসেছিস তো? নইলে আবার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কোরতে হয়।

পশুপতি হেসে বলে : ইস্, যে-ব্যবস্থা আপনার!···পেট ভরে খেয়ে এসেছি সম্পূর্ণাদেবীর গৃহ থেকে। আমি না খেয়ে অমন ট্যাট্যা কোরে ঘুরতে পারিনে আপনার মত।

বিপুলদা ও সম্পূর্ণা অবাক হয়ে পশুপতির দিকে তাকালেন। বিস্ময়ে প্রশ্ন করে সম্পূর্ণা : আমাদের গৃহে? অসম্ভব। মিথ্যে বানান হচ্ছে।

—গরজ পড়েছে আমার বানিয়ে কারো বদান্যতার ব্যাখ্যা করা। বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞেস কোরবেন।

—আপনার সংগে মার পরিচয় নেই; তা ছাড়া আমার সংগে আপনার জানাশোনা যতই থাক, বাড়ির কেউ সে-খবর রাখেন-ও না। কোন্ সুবাদে, বলুন, মা আপনাকে ডেকে খাওয়াবেন?···মিথ্যে কথা।···দাদা, পশুপতিবাবুর স্টেট্‌মেন্ট্ অবিশ্বাসযোগ্য।

বিপুলদা হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি বোমার মত যেন চতুর্দ্দিকে ফেটে পড়ল। পশুপতিকে জিজ্ঞেস করলেন : চা-ও খেয়েছিস?

সম্পূর্ণা ও পশুপতি এই প্রশ্নে একত্রে হেসে উঠল।

সম্পূর্ণা তাড়াতাড়ি বল্ল : ঐ চা ছাড়া আর কোন খাবার জিনিস আপনার মনে পড়েনা বুঝি?

বিপুলদা : দিদি, এখনতো চলেই যাবি—উনুনে আগুন-ও আছে—না রে?

কপট-উষ্মায় সম্পূর্ণা বল্ল ঃ কেন ? কিসের জন্যে, শুনি ?

অপরাধীর সুরে ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বিপুলদা উত্তর দেন ঃ এই তোদের জন্যে একটু চার ব্যবস্থা কোরতাম।

কিন্তু ব্যবস্থা করার কোন লক্ষণ-ই দেখা গেল না।···মোটা চাদরটা গায়ে ভাল কোরে জড়িয়ে গ্যাঁট হয়ে বোসে মিষ্টি হেসে বলে চল্লেন ঃ চট্ কোরে কয়েক কাপ চা ঢেলে নিয়ে ভাইবোনেরা মিলে শীতের রাতে তার সদ্ব্যবহার করা কি কম সৌভাগ্যের কথা ?···আর কবে তোদেরকে কাছে পাব কে জানে ?···

সম্পূর্ণার চোখ দুটি ব্যথাতুর হয়ে উঠল। করুণ-হাস্যে বল্ল ঃ দাদা, চা আমি কোরে আনছি। উনুনে আগুন আছে, আপনি ভাববেন না। তারপর উঠতে গিয়েই বোসে পড়ে বল্ল ঃ অজিতবাবুরা এলে পর-ই যাব। ইতিমধ্যে পশুপতিবাবুর কীর্ত্তি শোনা যাক।—বোলেই ঘাড় ফিরিয়ে দুষ্টু-চোখে প্রশ্ন করল ঃ হাঁ, এবার আপনার য়্যাড্ভেঞ্চার-কাহিনী বোলবেন কি, পশুপতিবাবু ?

বিপুলদাও সম্পূর্ণাকে সাগ্রহে অনুমোদন কোরলেন।

পশুপতি মৃদুমৃদু হাসছে আর সম্পূর্ণার দিকে তাকিয়ে মজা দেখছে। সম্পূর্ণার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সে বল্ল ঃ আপনার অপূর্ব্ব কণ্ঠের মধুর গান শুনে, না কোচোয়ানের নিখুঁত রোল্-এ তুষ্ট হয়ে আমার মা আপনাকে ডেকে খাইয়েছেন—বলুন ?

পশুপতি আশ্চর্য্য হয়ে ঃ আমাকে কোচোয়ানের বেসে চিনতে পেরেছিলেন নাকি ? উঃ, শ্যেনপক্ষীর দৃষ্টি দেখছি !

—চিনতে আবার পারবো না ?···আহা, কী কণ্ঠ ! সঙ্গীতের কী পদবিন্যাস ! বাব্বাঃ, এই দারুণ শীতের সন্ধ্যায় 'পাপিয়া,' 'কাটারি' কতো কিছু !!

পশুপতি সহাস্যে : আমার ছদ্মবেশ বৃথাই গেল !···যাক্, শুনুন তা হলে। দাদা ও বন্ধুদের যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আমি গাড়ি নিয়ে ফিরে চলছি ওটাকে-ও যথাস্থানে রেখে আসবার ইচ্ছায়। কিন্তু শেষোক্ত যথাস্থানটি বহু দূর। দাদাতো গাড়িতে সওয়ার হয়েই খালাস। আমাকে কোচোয়ান হিসেবে একটি পয়সা ভাড়া দেবার-ও নাম নেই।

বিপুলদা কপট উষ্মায় পশুপতিকে থামিয়ে বল্লেন : চোর কোথাকার। দু'পয়সা নিলিনে চেয়ে, বিড়ি কিনবার জন্যে।

—হাঁ হাঁ, আপনার পয়সার বিড়ি খেয়েইতো আমার গলাটা গেল খারাপ হয়ে! গান হলো বেসুরো। বদনাম কিনলাম শেষটায় সম্পূর্ণাদেবীর কাছে।

তিন জনেই হেসে উঠলেন।

পশুপতি সম্পূর্ণাকে লক্ষ্য করে বলে চল্ল : ভীষণ খিদে পেয়েছিল। সারাদিন আহারের কর্ম্ম হয়নি। ট্যাঁকে পয়সা নাস্তি। মনেমনে তাই প্ল্যান্ এল—দিব্যি প্ল্যান্! 'Necessity is the mother of invention'—নির্ঘাত আপ্তবচন এটা।··· ভাবলাম, পথ থেকে যাত্রী তুলে নি—এক খেপে-ই আমার খাবারের পয়সা জুটবে। কিছুদূর আসতেই দেখি আপনার বাবা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে এগিয়ে বল্লাম : বাবুসাহেব, গাড়ী খাড়ী হ্যায়, তশ্রিফ্ লাইয়ে!—আপনার বাবার-ও বোধহয় প্রয়োজন ছিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি তাঁর গৃহদ্বারে পৌঁছতেই খুশী হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুই আমার বাড়ি চিনতিস? আমি বল্লাম উত্তরে : হুজুর, দুনিয়া আপকো প্যায়্ছান্তে, ম্যাঁয় কেয়া হুঁ?

...পিতৃদেব অধিকতর খুশী হয়ে গাড়ি থেকে নেবে আমার হাতে নগদ একটি টাকা দিতে যাচ্ছিলেন। আমি ততক্ষণে মাটিতে নেবে এসে বল্লাম: নেহি হুজুর, প্যায়সা নেহি লুঙ্গা। মাতাজীকা পরসাদ মাঙ্‌তা হুঁ। ...আপনার বাবাতো অবাক। তিনি কোচোয়ান অতিথিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মাতাজী এলেন। দণ্ডবৎ হয়ে নিবেদন জানালাম! পেট ঢোল কোরে খাওয়া গেল। এবং খেতে খেতে এইটুকুও শুনলাম যে, শীতের এই রাতে তাঁদের মেয়ে কোথায় যে ভ্রমণে গেছেন তা মাতৃদেবীর-ও জানা নেই। আপনার পিতা রেগে আগুন। ..সাবধান!

সম্পূর্ণা চোখের দৃষ্টিতে হাসি ছড়িয়ে বিপুলদাকে বল্ল: দেখেছেন দাদা, আপনার পয়সা দিয়ে খাবার না খেয়ে বিড়ি খাওয়া হয়—আর আমার বাড়িতে ঢুকে খিদে মেটান হয় চুরি কোরে!

বিপুলদা: পশুপতির কোচোয়ানের রোল্‌ এত পার্ফেক্ট হয়েছিল যে বিধাতা খুশী হয়ে তোর মার হাতেই তাকে পুরস্কার পাঠিয়ে দিলেন।

সম্পূর্ণা: চোরের স্বপক্ষে বিধাতা শুধু নয়, আপনিও থাকলেন কিন্তু, দাদা?

তিনজনে আবার ছেলে মানুষের মত হেসে উঠলেন।

ইতিমধ্যে অজিত, আশু ও নিরঞ্জন এসে উপস্থিত। তারা আসতেই সম্পূর্ণা চলে গেল চা তৈরী কোরতে। মিনিট দশেকের মধ্যে নতুন কোরে চা এসে গেছে। একান্ত সহজতায় ছয়টি বিপ্লবীর আসর তখন জম্‌জমাট। কিছুক্ষণ পর বিপুলদা তাঁর পেয়ালায় শেষ চুমুকটি দিয়ে স্থির হয়ে বোসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে সুরু করলেন: অজিত, আশু, নিরঞ্জন! পার্টির বন্ধুরূপে

সম্পূর্ণার সংগে ফর্ম্যালি পরিচয় কোরে নাও এখন। ···সম্পূর্ণা, তুমিও এদেরকে বিপ্লব-যাত্রার ভাই বোলে গ্রহণ কর। ···হাঁ শোনো এবার সবাই, বিশ্বযুদ্ধের দৌলতে আন্তর্জাতিক-পরিবেশে আমাদেরও একটি স্থান হয়েছে। জর্ম্মানির সাহায্য আমরা পেয়ে গেছি। ভারতবর্ষময় বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেবার মত অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ বোঝাই হয়ে আসছে। তোমরা তয়ের হও। আমাদের রক্তপাতে রক্তহীন কোটি কোটি দেশবাসীর ধমনিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে। স্বাধীনতা লাভের এই যে বনিয়াদ—এখানে ফাঁকি থাকলে চলবে না।

বিপুলদা চুপ কোরে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। গৃহে স্তব্ধতা গভীর হয়ে উঠল। তারপর সে স্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে সহজ কণ্ঠে বন্ধুদের পানে তাকিয়ে তিনি বল্লেন: এবার সভা ভঙ্গ হোক। ···অজিত, আশু, নিরঞ্জন, তোমরা চলে যাও প্রথমে। —তারপর সম্পূর্ণাকে ট্রাম লাইনের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে যথাস্থানে চলে যাও, পশুপতি। অজিত-আশু-নিরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিপুলদা গভীর হয়ে বোসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি যেন ভবিষ্যতের পানে একাগ্রতায় নিস্তব্ধ! কিছুক্ষণ পর পশুপতি উঠে দাঁড়াল। বিপুলদা গাম্ভীর্য্যভরা কণ্ঠে বল্লেন: আচ্ছা, তোমরাও যাও।

সম্পূর্ণা বিপুলদাকে প্রণাম কোরে উঠে দাঁড়াতেই তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। সম্পূর্ণাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন: যাও বোন, তোমার আজকের সন্ধ্যার গান-গাওয়া সফল হবে। তোমার নামের সার্থকতা অস্বীকার কোরবার উপায় থাকবে না কারো। তুমি যে স্বয়ংসম্পূর্ণা, বোন! যে আলোকের জন্যে আজ তুমি আকুল আহ্বান জানিয়েছ, তার বিভায় একদিন ভারতভূমির সত্যকারের রূপ উদ্ভাসিত হবে।

সে আলোক-সংরচনায় তোমাদের কৃতিত্ব অক্ষয় হয়ে থাকবে, এ আমার নির্ভুল ধারণা।···

সম্পূর্ণা ধরা-গলায় প্রশ্ন করে : আপনার সংগে আর দেখা হবে না, দাদা ?

—হয়তো হবে না।···আর দেরি নয়—এবার তোরা যা।

সম্পূর্ণা ও পশুপতি বেরিয়ে গেল।

বিপুলদা সদর দরজা বন্ধ কোরে দেয়াল থেকে ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা নাবিয়ে হেরিকেনের আলোয় নিবিষ্টচিত্তে দেখতে লাগলেন।···পৃথিবীর সর্ব্বরন্ধ্র তখন নিঝুম ঘুমে যেন অচৈতন্য—অথচ টালিগঞ্জের এই অংশ পেরিয়ে কালীঘাটের ট্রামে যখন সম্পূর্ণা উঠেছে তখন রাত পৌনে দশটা, লোক-চলাচল বন্ধ হয় নি। পশুপতি কিছু পূর্ব্বেই আলাদা হয়ে তার গন্তব্যস্থানের দিকে চলে গিয়েছিল। সম্পূর্ণার ট্রাম ছুটে চলেছে। কিন্তু মন তার ছুটে চলেছে আরো, আরো বেগে—আলোক-গতিকেও পেরিয়ে।···

বিপ্লবী-ভারতবর্ষের সকল স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে। বিশ্ববিশ্রুত 'জর্ম্মান-প্লট্' গেছে ফেঁসে। ব্রিটিশের অফুরন্ত অর্থ বিনিময়ে কয়েকটি ভারতীয় বিপ্লবী ও জনৈক জর্ম্মান প্রতিনিধি গোপন-সংবাদ বিক্রয় কোরে বাঙলা তথা ভারতের বিপ্লব আয়োজন দিয়েছে ব্যর্থ কোরে।

ইতিমধ্যে হরিদাস দত্তের নেতৃত্বে, 'রডা কোম্পানি'র মাল-সরবরাহ কালে দিনেদুপুরে কোলকাতার রাজপথে গাড়ি-বোঝাই 'মাউজার পিস্তল' ও কার্তুজ সরিয়ে ফেলবার সুদক্ষ ও দুঃসাহসী ঘটনা পুলিশের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। সেই অস্ত্রশস্ত্র বাঙলার বিপ্লবীরা

হস্তগত কোরে কিছুটা আত্মরক্ষার চেষ্টায় তৈয়ের ছিলেন। এবং পরিশেষে সর্ব্ব আয়োজন পণ্ড হওয়ায় যতীন মুখার্জির কামনায় জেগে উঠল বীরের মৃত্যু। চারটি তরুণের সংগে বালাসোরের প্রান্তরে তিনি ইংরেজের সৈন্যবাহিনীদ্বারা আক্রান্ত হতেই খণ্ড-যুদ্ধ রচনা কোরলেন। আঁধার গগনে জ্বলে উঠল বহ্নিশিখা। নিভে গেল তা মুহূর্ত্তেই। কিন্তু তবু বাঙালী-তরুণের চোখে সে-আলোক স্বর্ণলেখা লিখে দিল। পুলিশের অকথ্য অত্যাচার, দেশব্যাপী তাদের তাণ্ডব, দলে দলে তরুণকিশোরের বন্ধন ও কারাযন্ত্রণার কাহিনী মানুষকে ভয়াবনত কোরে দিলেও হরিদাস দত্ত প্রমুখের দুঃসাহসিকতা, যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে চিত্তপ্রিয়-নীরেনদাসগুপ্ত-মনোরঞ্জনসেন-জ্যোতিশপাল প্রমুখের বালাসোর-যুদ্ধ ও আত্মদান, রাসবিহারীর রোমাঞ্চকর পলায়ন দেশবাসীকে বিস্ময়বিমুগ্ধ কোরে দিল। তারা দেবতার আসনে বসিয়ে বিপ্লবী-জাতটাকে প্রণাম কোরলো, গোপনে এই দুঃসাহসীদেরকে ত্রাণকর্ত্তার আসনে বসিয়ে তারা খুশী হল। কিন্তু সে-প্রণাম, সে-খুশীতো অর্থহীন। বিপ্লবীরা 'দেবতা' হতে তো চান নি—কারণ 'দেবতা'র প্রাপ্য শুধুই যে প্রণাম! ··

বিপুলদার কোন সংবাদ নেই।···অজিত প্রমুখ তরুণরা কোন্ এক পাহাড়তলিতে পুলিশ কর্ত্তৃক তাড়িত হতে হতে পিস্তল চালাতে বাধ্য হয়। সে-সংঘর্ষে তাদের ঘটেছে রক্তক্ষরিত-মৃত্যু।···উত্তর ধরা পড়েছিল আসানসোলের এক হোটেলে। আন্দামানের নির্জ্জন সেল্-এ বোসে সে এখন নারকেলের ছোব্‌ড়া পিট্‌ছে।···

সম্পূর্ণা নিজের গৃহে প্রায় বন্দিনীর মতোই দিন কাটাচ্ছে। কোথাও বেরুবার উপায় নেই। কারো সংগে দেখা করার সুযোগ

হয় না। দেখিয়েশুনিয়েই তার গৃহদ্বারে পুলিশের চর বোসে থাকে। তাই সম্বলের মধ্যে সঙ্গী রূপে তার রয়েছে কিছু বই এবং পিয়ানোটা, আর বাইরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে নিয়ত খুঁজে বেড়ায় সে দৈনিকপত্রের অক্ষরগুলো। বিপ্লব দমনের তুঃসংবাদ দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রতি প্রভাতে কাগজের কলম্-এ পাঠ করা ছাড়া সম্পূর্ণার অপর কোন কাজ নেই।···

একদিন গভীর রাত্তিরে সম্পূর্ণার ঘুম সহসা ভেঙে গেল! তার জানলার নীচে, সদর রাস্তায় চেনা-কণ্ঠের সেই গান :

"ম্যাঁয় মরু কাটারি মার্,
পাপইয়া বোলী বোলে!"···

আনন্দে ও অস্থিরতায় জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে সম্পূর্ণা দেখতে পেল এক হিন্দুস্থানী ভিক্ষুককে। সম্পূর্ণার প্রাণে আশার দীপ উঠল জ্বলে। সাবধানে সদর দরজা খুলে ইশারা কোরতেই ভিক্ষুক তার গৃহে উঠে এল।

—সেলাম, বহিন্‌জী?···দাদা awaiting you!···

সম্পূর্ণার রহস্যে যোগ দেবার অবকাশ ছিল না। রুদ্ধশ্বাসে পশুপতির হাতখানা চেপে ধোরে সে বল্ল : দাদা! কোথায়? কখন?··· এ-বেশেই আসবো?

—না। এই নিন্ সাল্‌ওয়ার, সার্ট আর পাগড়ি।···তরুণ-শিখের বেশে বেরিয়ে আসুন এই ভিক্ষুকের সংগে!···

সম্পূর্ণার এ-রহস্যে যোগ দেবার-ও অবকাশ নেই। পশুপতির হাত থেকে জিনিসগুলি এক রকম ছিনিয়ে নিয়েই সে চলে গেল পাশের ঘরে বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্যে।

পাঁচ

এক মাস পর পাঞ্জাবের একখানা ইংরেজি দৈনিকে সংবাদ বেরুলো : Police, on suspicion, challanged a Sikh youth at 'Pindi. It happened to be a necessity to shoot him down when he whipped out a revolver & fired. The deadbody of the man was found at last to be the body of a young girl! The whole affair is shrouded with mistery. Vigorous investigation continues.

কোলকাতার কদর্য্য এক বস্তির স্যাঁৎসেঁতে এক মেটে ঘরে বোসে সাশ্রুনয়নে পলাতক পশুপতি এ সংবাদ পড়ল। পরম ভালোবাসায় এবং একান্ত শ্রদ্ধায় নিবিড় একটি প্রণাম তার সারা তনুপ্রাণের তন্ময়তায় পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সংবাদপত্রের হরফগুলির পানে উদাসদৃষ্টি তার নিবদ্ধ। মন তার চলে গেছে তখন ইহ সংসারের সকল গণ্ডি পেরিয়ে রাওয়ালপিণ্ডির রক্তস্নাত সেই ধূলিপথে, যেখানে সম্পূর্ণার গুলিবিদ্ধ দেহলতা রুধিররঞ্জিত হয়ে পড়ে আছে। সাহসিকার তেজোদীপ্ত আনন জুড়ে হয়তো চরম তৃপ্তির ছাপ। মহামৃত্যুর 'ছায়াবিহীন আলোক' তার মধ্যে 'কায়া' লাভ করেছে, তারই 'অশ্রুজালে' 'সুন্দর-বিধুর' হয়েছে। মনে পড়ে পশুপতির সেদিনের সন্ধ্যায় শোনা সেই তপস্বিনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গানখানি।...

পশুপতি তার চিন্তাধারার হারানো সূত্রগুলি যেন খুঁজে বেড়াতে থাকে। সে স্মরণ কোরতে থাকে ঘটনা-পারম্পর্য্য। হঠাৎ পেয়ে যায় সে সেই সূত্র। ...হাঁ, বিপুলদা ও সম্পূর্ণাদেবী পলাতকের বেশে ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন উত্তর ভারতবর্ষের নানা স্থানে। চেষ্টা তাঁদের—সকল ব্যর্থতার মধ্যেও আবার কিছু করা যায় কিনা। ···সম্পূর্ণাদেবীর জীবন-পরিণতি 'শহিদে'র জীবনচ্ছন্দে গুঞ্জরিত হলো—কিন্তু বিপুলদা? কোথায়, কোন্ অবস্থায়, কি কর্ত্তব্যে এই বীর সাধক এখনো একাকী তাঁর অনাহত কর্ম্মযাত্রা রচনা করে যাচ্ছেন ?···পশুপতি পাগলের মত ভাবে—কেবলই ভাবে—তার চোখ দুটো শুকনো থাকে না—ঝরঝর কোরে অশ্রু গড়িয়ে যায়। একে একে পশুপতির সকল বন্ধুবান্ধবই কারাগারে কিংবা মৃত্যুর দ্বারে শরণ নিয়েছে। আজ এই বিপুল বাঙলা দেশে তাদের দলের মধ্যে শুধু সে-ই একাকী মুক্ত অবস্থায় পথে পথে ঘুরছে। কিন্তু আত্মগোপনকারী পলাতকের এই মুক্তি যে সকল বন্ধন থেকেই দুঃসহ, সকল নির্য্যাতন ভোগ থেকেই নিষ্ঠুর!···

শহীদ দীনেশ গুপ্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

১৯২৮ সাল। ডিসেম্বর মাস। জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এবার কোলকাতায় হতে যাচ্ছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ার্‌ম্যান। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর জি-ও-সি।

দেশের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। মহাত্মা গান্ধীর বাণী আসমুদ্রহিমাচল কান পেতে শুনে আসছে ১৯২১ সাল থেকে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে কর্ম্মীর দল স্বাধীনতা-যুদ্ধের নানা আবর্ত্তে ত্যাগবরণ কোরে আসছে। বহু নরনারী কারাকষ্ট ভোগ করেছে, পুলিশের লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছে, অহিংসমন্ত্রের ঋষির আদেশে অহিংস-সংগ্রামের ধ্বজা বহন করে আসছে। জনগণের মধ্যেকার এই জাগরণ বিপ্লবীদের কর্ম্মধারায়-ও পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। তাঁরা কংগ্রেসের ক্ষমতাকে অস্বীকার কোরতে পারেন না। তাঁরা তাই স্থির কোরেছেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে নিজেদের আদর্শানুযায়ী পথে এই বিরাট সংঘশক্তিকে পরিচালিত কোরবেন। দেশবন্ধু একদিন বুঝেছিলেন যে, বিপ্লবীদের সাহায্য ব্যতীত বাঙলাদেশে অন্তত কংগ্রেসের কাজ চলতে পারে না। তিনি বিপ্লবী-নেতাদেরকে আহ্বান করেন তাঁর কার্য্যক্রমে অংশ গ্রহণ কোরতে। এবং তৎকালেই পরস্পরের মধ্যে এই সর্ত্ত স্থির হয় যে, কংগ্রেসের বাইরে না-থেকে কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকেই আপন আদর্শে তাকে অনুপ্রাণিত করার গোপন অধিকার থাকবে যেকোন বিপ্লবীর।

দেশবন্ধুর প্রিয়তম বন্ধু ও শিষ্য সুভাষচন্দ্র জন্ম-বিপ্লবী। তাঁর রক্তের সংগে বিপ্লবীদের রক্তের আত্মীয়তা। তিনি বল্লেন: এই সুযোগ। ভারতবর্ষময় 'স্বেচ্ছাসেবক' নয়, 'স্বেচ্ছাসৈনিক'-বাহিনী গড়ে তুলতে হবে বিরাট রূপে, দেশের তরুণ ও তরুণীদের সাহায্যে। তারাই হবে গণ-আন্দোলনের নিয়মানুবর্ত্তী 'কেডার্'। এই বাহিনীর পত্তন হোক বাঙালা দেশে, ১৯২৮ সালের এই কংগ্রেস-অধিবেশনে।···বিপ্লবী-নেতাদের পছন্দ হোলো সুভাষচন্দ্রের কথাগুলি। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নাম দিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের যে স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী সংরচিত হলো তার কর্ণধার রূপে তাই বিপ্লবী-নেতাদের আবির্ভাব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরিত।

এই কালে সমগ্র বিপ্লবীদলগুলির সভ্যবৃন্দই মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসে ঢুকে গেছেন। কিন্তু প্রত্যেক দলেরই গোপন-বিভাগ সঙ্গেসঙ্গে সংগোপনেও কাজ করে যাচ্ছিল। কারণ বিপ্লবীরা কেহই মনেমনে অহিংসপন্থী হতে পারেন নি।

পুলিশের গুপ্ত-বিভাগও নিশ্চুপ ছিল না। তাদের লোক প্রত্যেকগুলি দলেরই পেছন নিয়েছিল। কিন্তু বিপুলদার দলের কোন সংবাদই পুলিশ আবিষ্কার কোরতে না-পেরে প্রায় স্থির কোরে ফেলেছিল যে ওটা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অজিত-আশু-নিরঞ্জনের মৃতদেহ পুলিশের হাতেই পড়েছিল। সম্পূর্ণাদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পাঞ্জাব-পুলিশই সম্পন্ন করে। বিপুলদা ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে কন্টিনেণ্টে অতি দুঃখে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন কোরছেন—তাঁর আর ফিরে-আসবার পথ নেই ইংরেজ-পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। উত্তর আন্দামান-জেল থেকে বেরিয়ে এসে কোলকাতায় একটি ছাপাখানা চালাচ্ছে—পুলিশ তাকে

নিয়ত ওয়াচ্ কোরে কোরে বুঝেছে-যে তার 'প্রাণ ধারণে প্রাণান্তকর অবস্থা', 'স্বদেশী'করার ফুরসৎ একটুও নেই। কেবলমাত্র পশুপতি নিখোঁজ। কিন্তু এতকাল এই ব্রিটিশ-সিংহের পদচারণ-ভূমিতে এই একটি সম্বলহীন মানুষ আত্মগোপন কোরে থাকবে—এ অসম্ভব। সুতরাং পথেঘাটে কোথাও নিশ্চয় তার ঘটেছে অপমৃত্যু। বিপুলদার দল সম্পর্কে পুলিশের তাই ব্যস্ত হয়ে ওঠার সকল কারণ-ই অপগত।

দুই

পার্কসার্কাস্ অঞ্চলে তখন তেমন বসতি হয় নি। কংগ্রেস-নগর পার্ক্ সার্কাসেরই উপান্তে খোলা ময়দানের মধ্যে অবস্থিত। নগরের পরই গ্রাম শুরু হয়ে গেছে। মাঠের কেন্দ্রস্থলে আকাশচুম্বী হয়ে দুলছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয়পতাকা। পতাকার নীচে কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্ব রাত্রে স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীকে জমায়েত হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশে অজানা অন্তহীনতার বাণী। সে-বাণীসংকেত স্তব্ধতায় প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে নীচের পৃথিবীতে। শুধু মাঝপথে উড়ছে পত্‌পত্ কোরে জাতির বৈজয়ন্তী। জীবনের স্পন্দন তাতে অনুভূত।

পদাতিক স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর জেনারেল্ র‍্যালি। জি-ও-সি মাঝখানে দাঁড়িয়ে। বিরাট পুরুষ। তাঁর সর্ব্বাবয়বে কঠিন দৃঢ়তা। চোখে বহু দূরের স্বপ্ন। অন্তরে বিশ্বজয়ীর কামনা। সুভাষচন্দ্রের পার্শ্বে তাঁর কর্ণেলগণ। মেজরবৃন্দ টর্চ হাতে সেই ঘনতমিস্রায় সমগ্র বাহিনীকে যথাযথ ভাবে দাঁড় করাচ্ছেন। প্রত্যেকটি তরুণ-সৈনিকের

ওষ্ঠে নিয়মানুবর্ত্তিতার আগ্রহ-লিখা, তাদের সম্মুখে জাতির আশাভরসার গর্ব্বোদ্ধত আহ্বান।

সুভাষচন্দ্র বাহিনী পর্য্যবেক্ষণ কোরলেন সামরিক রীতিতে। দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে, আনন্দে ও ভরসায় এই রাত্রিনিশীথের উদ্যোগপর্ব্ব অবলোকন কোরল। হাজার হাজার সৈনিক আজ কিসের ব্রত গ্রহণ কোরছে? এ কি কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব-গ্রহণ-প্রয়াস? না এর পশ্চাতে রয়েছে এমন কোন অব্যক্ত কামনা, যা স্পষ্ট কোরে না হলে-ও সৈনিকদের মর্ম্মনিভৃতে আভাসে উঠেছে চিহ্নিত হয়ে? সুভাষচন্দ্র বাহিনী পর্য্যবেক্ষণ কোরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এসে কেন্দ্রস্থলে। স্বল্প কথায় জলদগম্ভীর-কণ্ঠে যা বল্লেন তার সারাংশ মন্ত্রের মত ধ্বনিত হতে লাগল অনেকক্ষণ: 'ত্যাগের মধ্যে লালিত যে-নিয়মানুবর্ত্তিতা, তা উচ্চারিত হোক আপনাদের প্রতি রক্তকণায়।'

বাঙালীর চিন্তায় এক আকস্মিক দোলা লাগিয়ে দিল এই "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্"। বাঙালীর মেয়ে পায়ে হেঁটে জনবহুল পথে বেরুল শুধু নয়—তারা দল বেঁধে প্যারেড্ কোরবে, লোকচক্ষুর সুমুখে মার্চ কোরে ছুটে চলবে—এযে কল্পনার-ও অতীত। কিন্তু এক আঘাতে বাঙালীর জড়তাকে ছিন্ন কোরে সুভাষচন্দ্র সহসা রচনা কোরলেন নারী-বাহিনী। নির্ব্বাচিত কংগ্রেস সভাপতিকে (মতিলাল নেহেরু) হাওড়া ষ্টেশান থেকে মিছিল কোরে আনবার জন্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্-এর কেবল ছেলেরা নয়, মেয়ে-বাহিনীও দীর্ঘ-পথ হেঁটে পার্কসার্কাস অবধি যখন অনায়াসে এলো—তখন বিহ্বল-আনন্দে ও ভরসায় বাঙালীর অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠল। বাঙালী তরুণের স্বপ্ন বল্‌গা-ছাড়া ঘোড়ার মত উড়ে যাবার সংকেত পেল।...

কংগ্রেস অধিবেশন অন্তে সুভাষচন্দ্র তাঁর 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' ভেঙ্গে দিলেন না। কংগ্রেসেরই কর্ণধারগণ (গান্ধীজি-ও) এ নিয়ে তাঁকে বহু ঠাট্টাবিদ্রূপ কোরলেন। দেশের বহু গণ্যমান্য লোক-ও এর মধ্যে ছেলেমানুষী-ই খুঁজে পেলেন। যে-ব্যক্তির এতদিনে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আই. সি. এস্-এর চাল রপ্ত করা উচিত ছিল, তাঁকে হাপ্ প্যান্ট্ ও বুটপট্টি পরে সং সাজতে দেখলে ইনটেলেক্চুয়েল্রা হাসি চেপে রাখবে কি কোরে? বাঙলার কোন কোন কাগজওয়ালা এবং সাহিত্যিকবৃন্দ-ও সুভাষচন্দ্রকে 'গরু' বোলে ব্যঙ্গ কোরতে লাগলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরোয়া নেই। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, মৃতের দাঁতখিঁচুনি আর সৃজনশীল সমালোচনা এক বস্তু নয়। তিনি জেনে ছিলেন যে, যারা জীবিত অর্থাৎ যারা সত্যিকারের তারুণ্য-শক্তির বাহক, তারা তাঁর বেঙ্গল্ ভলান্টিয়ার্স্কে গ্রহণ করেছে মনেপ্রাণে।

তিনি সমগ্র বাঙলায় বাহিনী-সংগঠনের ভার দিলেন মেজর যতীন দাস, মেজর সত্য গুপ্ত, মেজর জগদীশ চক্রবর্ত্তী ও মেজর প্রতুল ভট্টাচার্য্যের উপর। নারী-বাহিনীর ভার পেলেন কর্ণেল লতিকা বসু (বর্ত্তমানে ঘোষ)। এবং ক্রমে ক্রমে ঢাকা ডিভিশান ও চট্টগ্রাম ডিভিশানের ভার বিশেষ কোরে অর্পিত হয়েছিল জ্যোতিশ জোয়ারদার ও অনন্ত সিং-এর হস্তে। ১৯২৯ সালের শেষাশেষি বাঙলার গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত শোনা যেতে লাগল তরুণ ও বালকদের পদধ্বনি—লেফট্, রাইট্, লেফট্ !! ··

তিন

ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত করোনেশান পার্ক। বিকেলে নদীর বাঁধের উপর সহরের শিশুবৃদ্ধতরুণের ভিড়। পার্কে যুবকদের

খণ্ডখণ্ড আড্ডার আসর জমে ওঠে। এ-রকম একটি আড্ডায় গুটি পাঁচেক যুবক চিনেবাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে এবং বাদাম খেতেখেতে প্রাণখোলা হাসির উৎসবে ও গালগল্পে বৈকালিক-জমায়েৎটিকে মুখর কোরে তুলছে। এরা সবাই মিট্‌ফোর্ড মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। সমবয়সী, অথচ সমরুচিসম্পন্ন নয়।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন কোরে অসিত বল্ল: ভাখো বন্ধুগণ, আমাদের মধ্যে বিনয় কিন্তু সবার চেয়ে ওস্তাদ। মুখে কথাটি নেই, কিন্তু কাজে—

অসিতকে বাধা দিয়ে হরিনারায়ণ: কাজে কি?

অসিত: আরে ইতিমধ্যে পার্টনার যুগিয়েছেন একটি বিদেশিনীকে!

হরিনারায়ণ ডেঁপো ছেলে। সোৎসাহে বলে ফেলে সে: পার্ট্‌নার-ইন্‌-লাইফ্‌?

অসিত: আরে, না। ওর টেনিসের পার্টনার। হাসপাতালের মেট্রনসাহেবা ওকে ছাড়া আর কাউকে নিয়েই খেলতে রাজি নন।

হরি: তাই বল। আমি ভাবলাম, কি জানি? মিট্‌মিটে ডাইনী কাঁটা খাবার যম—বুঝি এরি মধ্যে এ-কম্ম কোরে ফেলেছেন? চেহারাটি সুন্দর, ফিট্‌ফাট কেতাদুরস্ত হয়ে থাকেন সর্ব্বক্ষণ—বাব্বা! মেডিকেলের ছাত্রকে বিশ্বাস আছে নাকি কিছু?

অসিত: তুমি আবার না শুনেই in advance ভেবে বোসে থাক।···আমাদের স্কুলে বিনয়ের মত ভাল টেনিস খেলে না কেউ। এতো cool tempered পার্টনার, এবং unassuming too—তাই মেট্রনের পছন্দ। বাস্তবিক দুজনের চমৎকার understanding।

সেদিন 'ট্রফি' জিতে নিল। দেখিস নি, স্কুলে সেই 'ট্রফি' সমেত ওদের ছবি ?

হরি : 'am neither interested in Tennis nor in 'ছবি'। 'am simply interested in Benoy & his partner-in-life.—বোলেই বিনয়কে ধোরে সে এক ঝাঁকুনি দিল।

বিনয়ের ওষ্ঠে মিষ্টি হাসি। মুখে কোন কথা নেই।

অসিত চুপ কোরে থাকতে পারল না। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলতে লাগল : আমি ভাই সেদিন খেলা দেখছিলাম। ওয়াণ্ডারফুল খেলা! বিনয়ের strokeগুলি মার্ভেলাস।

অরবিন্দ : কেন ? ওর সার্ভিস্ ? কী হার্ড, কী মিস্‌লিডিং!

অসিত : সত্যি!···মেমসাহেবের খেলা-ও খুব উঁচুদরের। আজকেও ওদের খেলা দেখলাম। প্রিন্সিপাল যা বাহবা দিচ্ছিলেন!

হরিনারায়ণ : good!—তারপর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে কপট-গাম্ভীর্য্যে : are you interested in মেমসাহেব ? Be frank, my boy.

বিনয় হাসে। কিছু বলেনা।

অরবিন্দ : ওকে বৃথাই চুলকাচ্ছ, ওর মুখে কথা শুনেছ কোনদিন ? He laughs at everything—তা-ও জোরে নয়, স্মিতমাধুর্য্যে!

হরি : আরে ঐ স্মিতহাস্যেই-তো লুকিয়ে থাকে গোপন অস্ত্র।—বিনয়ের দিকে তাকিয়ে : কি ভাই, হেনছ কি গোপন বাণ ? Is she sweet ?

বিনয় মধুর হাস্যেই উত্তর দেয় : Yes, she is.

বন্ধুরা বিস্ময়ে বিনয়ের পানে তাকায়। হরিনারায়ণ বিনয়ের পিঠ চাপড়ে হুলুস্থুলু বাধায়।

বিনয় হাসিমুখেই আরো বলে : তোর ছোকরা চাকরটা তোর ঘুড়ি ওড়াবার নেশায় মস্ত অংশীদার। ওকে কত সময় আদর-ও করিস। নয় কি? চাকর ছোকরা তোকে 'sweet' মনে করে নিশ্চয়ই? কি বলিস, হরি?

অরবিন্দ : হরিকে সুইট্ মনে কোরবে সবাই। He is really sweet.

হরি (অরবিন্দকে বাধা দিয়ে) : উঁহু! রোসো ভ্রাতা, যে ব্যক্তি মুখ খোলে না, তার মুখের কথা অত সোজা নয়। —বিনয়ের দিকে তাকিয়ে : বড্ড বঙ্কিম-ভঙ্গে বাক্যব্যয় কোরেছ, বন্ধু?

বিনয় হাসলো। কিন্তু মুখর হরিনারায়ণ অন্যমনস্ক হয়ে-ই রইল।

অপর বন্ধুরা ধীরে ধীরে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। চিনেবাদামের স্তূপ ততক্ষণে প্রায় বিলীয়মান।...

সন্ধ্যা ঘনীভূত। পুঞ্জপুঞ্জ আঁধার নেবে আসছে আকাশ থেকে। এমন সময় মুখ ও মস্তক চাদরে ঢাকা এক ব্যক্তি আড্ডাটির পাশ দিয়ে চলে গেল। কারো নজরে না পড়লেও বিনয় যেন তার আবির্ভাবেই সামান্য চঞ্চল হলো। একটু পর জরুরি কাজের দোহাই দিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে সে বিদায় নিল। ...অনেক দূরে দাঁড়িয়েছিল সেই 'চাদরে ঢাকা' মূর্ত্তিটি। মূর্ত্তির সম্মুখীন হতেই উভয়ের মধ্যে কি যেন সংকেত হলো। ...একটু পরেই বিনয় ও আগন্তুক অদৃশ্য হয়ে গেছে। অন্ধকারের সম্প্রসারে তাদের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচরবহির্ভূত।

চার

বিনয়ের বাবা ইঞ্জিনিয়ার। বাঙলার বাইরে তাঁর কর্ম্মস্থল। ছেলেদের পড়াশুনার জন্য কোলকাতায় কালীঘাট অঞ্চলে বাসা নিয়েছেন। বিনয়ের বাবা দিলখোলা লোক। মেজাজ সময়ে সময়ে কড়া। সাহেবসুবার সঙ্গে বনিবনাও কম। অপমান সহ্য কোরে চাকরি করা তাঁর পোষায় না। কাজেই কর্ম্মে ইস্তাফা দিতে হয়েছে তাঁকে নানাক্ষেত্রে বারেবারে। ইঞ্জিনিয়ারের আদর ফুরায় না বোলেই দায়িত্বপূর্ণ বড় চাকরি তাঁর জুটে যায়। তিনি পাকা শিকারী। রাইফেলের গুলি নিজে হাতে তৈয়ের কোরে সেই গুলির ঘায়ে বড় বড় শিকার ফতে করেছেন তিনি উড়িষ্যার জঙ্গলে বহুবার। কিন্তু তাঁর আফসোস ছিল, ছেলেগুলো কেহই বন্দুক ধোরতে শিখলো না। বিনয়কে তিনি ভালবাসতেন বিশিষ্টভাবে। সাধ ছিল তাঁর এই মেধাবী সন্তানটি একটু তৎপর হয়ে উঠুক এবং মেডিক্যাল স্কুল থেকে বেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের condensed course পড়ে ডিগ্রী নিয়ে ভাল ডাক্তার হোক। তারপর চাই কি বিলেত ঘুরে এসে পশার জমাক। কিন্তু ছেলেটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কথাবার্ত্তা বলার স্বভাব তার নেই, পিতা জানেন। তবু গল্পলোভাতুর পিতার ভাল লাগে না পুত্রের এই স্বল্পভাষী স্বভাব। ছেলের চলাফেরা সম্পর্কে নানা সংবাদ তাঁর কানে আসে। তিনি শোনেন যে, ছেলে পড়াশুনা যত না করে তার চেয়ে ঢের বেশি করে নিয়মদ্রোহিতা। স্কুলের মেসে সে থাকে সত্য, কিন্তু মেসের আইনকানুনগুলো যেন বিনয়ের জন্য নয়—মেস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্ট অন্তত তাই। বিনয়ের সংগে যখনই দেখা হয় তখন শঙ্কিত

পিতা শাসনের সুরে কথা কন্। কিন্তু সে শাসনের মর্ম্মে থাকে একটা আবেদনের স্পর্শ।

সেদিন বিনয় ও তার ভগ্নীপতি কালীঘাটের বাসায় বোসে একত্রে আহার কোরছেন। ভগ্নীপতি বল্লেন: তোমরা সাইকেলে এবার ক'বন্ধুতে বেরিয়েছিলে ঢাকা থেকে?

—ছ'জন।

—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক্ রোড্ ধোরে পূর্ব্ব-ভারতের শেষান্ত অবধি যাওয়া স্থির কোরেছিলে বুঝি?

বিনয় চুপ কোরে থাকে।

—জানো, শ্বশুরমশায় খ্যাপে আগুন? ওঁর জানিত কোন্ পুলিশ অফিসার নাকি ওঁকে বোলেছেন-যে ইতিমধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে যে দু'ট্রো ডাকাতি হয়ে গেছে তা তোমাদের কর্ম্ম।

বিনয় সাগ্রহে প্রশ্ন করে: তাই বলে নাকি? আর কি বলে?

—বলে, তুমি এনার্কিষ্ট্-দলে ঢুকেছ; তোমাকে যেন এখুনি সামলানো হয়।

—বাবা কি বল্লেন?

—শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তোমার উপর তাঁর অভিমান একান্ত। একটু সামলে চলো। বুড়ো বাপকে ডোবান উচিত কি?···

বিনয় যা জানবার তা জেনে নিয়ে নিশ্চুপে খেতে লাগল। কোনো চিত্ত-চাঞ্চল্য নেই। আহারান্তে বাসা থেকে যখন সে বেরিয়ে যায় তখন তার পিতাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি-পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এমন সহজে ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় বিনয় তাঁকে অতিক্রম কোরে গলিপথেই বহির্গত হলো-যে তা' বিনয়ের পক্ষেই সম্ভব। বিনয়ের বাবা সন্ধ্যার আবছায়ায় পার্শ্ব-ঘেঁষে

চলে-যেতে-থাকা পুত্রকে লক্ষ্য-ও করলেন-না। তিনি তখনো ভাবছেন-যে, ফিরে এসে অসংযত পুত্রকে কড়ামধুর শাসনে সুসংযত কোরবেন।...

বিনয় সরাসরি চলে গেল তার এক বন্ধুর মেসে। পরিপাটি বেশে দুই বন্ধু এসে যখন নিউ এম্পায়ারের দ্বারে উপস্থিত হলো, তখন শীতের সন্ধ্যা ঘন-কালো বর্ণ বিছিয়ে পৃথিবীকে-ও কালো রূপ দান করেছে। বিনয়ের বন্ধুটি নাম-করা খেলোয়াড়। খেলা, সিনেমা আর সিগারেট্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর প্রতিই তার লোভ ছিল না।...

ছবি দেখতে দেখতে বন্ধু বোল্ল: বাজে শো-তে নিয়ে এলি, বিনয়। ও সব দাঙ্গাফ্যাসাদ লড়াইঝগড়ার ছবি আমার অপছন্দের। রীতিমত নার্ভ্ টেলিং। প্রেম বিহনে ছবি আবার ছবি?

বিনয় হেসে বল্ল: ঐ ছাখ, কী ফার্ষ্ট ক্লাস স্নাইপিং! A real love-affair between the bullet and the aim!

—তোর মাথা। ১৯১৪ সালের কতগুলো যুদ্ধ-ছবি, খুনখারাবি আর মার্চপ্যারেডের দাপাদাপি! ছাই ইণ্টারেষ্টিং। —বোলেই সে জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

বিনয় তন্ময় হয়ে তখন ছবি দেখছে।...

ন'টায় শো ভেঙ্গে গেল। দুই বন্ধু রাস্তায় নেবে এসেছে। নতুন কোরে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বিনয়ের বন্ধু বল্ল: বাঁচলাম। কি বোরিং! Not a whit of রস in it! —তারপর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে কয়: হ্যাঁরে, ফুটবল-টেনিস খেলিস—ভাল কথা। I like you. কিন্তু বন্দুক-পিস্তল ছুঁড়বার সখ হয়েছে নাকি? বাপধন, 'স্বদেশী'র দলে নাক ঢুকিয়ো না।...

বিনয় একটু হেসে বলে ঃ আমার বাবা 'শার্প্ শুটার্'। I look at him in adoration.

—তাই নাকি ? তুই-ও নাড়িসচাড়িস বুঝি তাঁর বন্দুকগুলো ?

বিনয় চুপ করে থাকে।

ঠাট্টার সুরেই বন্ধু বলে ঃ আচ্ছা ভাই, ও-পারের ফুটপাথের উপরে ঐ দোতলায় যে বাতিটা জ্বলছে তা এখান থেকে ফুটো কোরতে পারিস ?

—পারি। —অতি সহজভাবে বিনয় বলে।

হাল্কা-স্বভাবের বন্ধু তাচ্ছিল্যভরে কথাটাকে গ্রহণ কোরে বল্ল ঃ বীর বটে ! কাঁচের-ডোম্-বিদারণকারী বাঙলার ডন্ কুইক্সট্ !

বিনয় হেসেই উত্তর দেয় ঃ ডোম্ কাঁচের হলেও তার মধ্যে রয়েছে আগুন।...

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিনয় বাস-এ উঠতে যাবে এমন সময় চাদরে-মুখ-ঢাকা করোনেশান পার্কের সেই মূর্ত্তিটি তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বিনয় আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল ঃ তুই এখানে, সুশান্ত ?

—তোর খোঁজে।

—গোয়েন্দার ঠাকুর্দা হয়েছিস যে !...এখন খবর কি ?

—তোকে আজই ঢাকা যেতে হবে।

—আচ্ছা।

—'আচ্ছা' বল্লি যে ? তোর বাবা রয়েছেন না কোলকাতা ? এত শর্ট্ নোটিসে বাসা থেকে পালাবি কী কোরে ?

প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে গিয়ে স্বাভাবিক হাসিটির বিনিময়ে বিনয় বল্ল ঃ সাড়ে দশটায় তো ট্রেন ? সওয়া দশটায় শেয়ালদহ ষ্টেশানের এন্কোয়েরি আপিসের সুমুখে আমায় পাবি। টিকিট কেটে রাখিস।...

শহীদ বাদল গুপ্ত

একটা বাস সশব্দে এসে দাঁড়াতেই বিনয় তাতে চেপে বোসল। চাদর ঢাকা সুশান্তও অনতিবিলম্বে ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

পাঁচ

১৯২১ সাল ভারতবর্ষে নারীর চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া এনে দিয়েছিল। মাহাত্মার আহ্বান অবজ্ঞাত এই সমাজের কর্ণে প্রবেশ করেছিল আশাতীত ভাবে। পর্দ্দানসীন মেয়ের দল অবরোধ ভেঙ্গে দিল এক দিনে। তারা জেলে গেল। পথে ঘাটে বেরিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিধানকেও মুহূর্ত্তে অবহেলা কোরল। কিন্তু বিরাট ভারতবর্ষের সুবৃহৎ নারী-সমাজের কুসংস্কার ও যুগব্যাপী অধঃপতনের ইতিহাসকে ধুয়েমুছে ফেলবার পক্ষে এ অতি সামান্য চেষ্টা। কাজেই চাঞ্চল্য তাদের চলায় পরিলক্ষিত হলে-ও শৃঙ্খলমুক্ত চলার বেগ তাতে চিহ্নিত হলো না। তবে এই নব-জাগরণের অবদান স্বরূপ গুটিকয় মহিলা কর্ম্মীর আবির্ভাব লোকচক্ষে আশার দীপ জেলে দিল।

ঢাকা শহরে শীলা চৌধুরির নাম পুরুষ-মেয়ে সবারই কণ্ঠে আলোচিত হয়। সুশ্রী তরুণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি অনায়াসে তাঁর আয়ত্তে এসেছে। মোটা পেন্সনভোগী হাকিমের একমাত্র দুহিতা। ঘরসংসার না-কোরে জনকল্যাণে তাঁর আত্মনিয়োগ ছেলেবুড়ো প্রত্যেকেরই চোখে বিস্ময় জাগিয়েছে।

শীলা চৌধুরি কংগ্রেসের কাজ করেন নাম মাত্র। কিন্তু তাঁর ক্ষমতার পরিচয় একান্ত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তখনই যখন তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার কোরে নিয়েছে ছাত্রীসমাজ পরম আগ্রহে।

মেয়েদের স্কুল, মেয়েদের সমাজ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠান, মেয়েদের শারীরচর্চ্চার নানাবিধ প্ল্যান অজস্র বাধাবিঘ্ন অন্তে তিনি সাফল্যস্নাত করে যশস্বিনী হয়ে উঠেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই যুগে মেয়ে মহলের একমাত্র আশার দীপশিখার মত প্রতিভাত হতে থাকায় শীলা চৌধুরির পরিচয় অনন্য সুন্দর হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়ই।

সে দিন রবিবার। শীলা চৌধুরির গৃহের সম্মুখে খোলা মাঠে ছেলেরা সামরিক পোষাক পরে প্যারেড্ কোরছে। জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীরমনস্কতায় মিস্ চৌধুরি কুচকাওয়াজ দেখছেন, আর কল্পনায় তাঁর নানা প্ল্যান্ রূপ ধোরে উঠছে।...পাড়ার ছেলেদের তিনি চেনেন। এদের চলাচল সাধারণ ছেলেদের মত নয়। প্রত্যেকেই স্কুল-কলেজের ছাত্র। পড়াশুনায় ভাল। স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারা। ডনকসরৎ করে। দুর্গতদের সেবা এদের ব্রত। মড়া পোড়ান, রোগীর শুশ্রূষা এবং নানাবিধ সমাজহিতকর কাজ এদেরকে ব্যস্ত রাখে। দুষ্টের দমনও এদের রক্তে। তাই এন্টি-স্যোসাল্-এলিমেন্ট্কে ডাণ্ডার ঘায়ে ঠাণ্ডা করার পদ্ধতি এরা গ্রহণ করেছে। মাঝে মাঝে এ-জন্যেই অভিভাবকশ্রেণীর অসন্তুষ্টির কারণ-ও এরা হয়।

ঢাকা শহরে পাড়ায় পাড়ায় এ-ধারার ইয়ুথ্-মুভ্মেণ্ট জীবন্ত। শীলা চৌধুরি সে-সংবাদ রাখেন। কিন্তু তাঁর পাড়ার দলটিকেই তিনি কেবল এযাবৎ পর্য্যবেক্ষণ কোরে আসছেন। আজ নানা পাড়ার ছেলেরা মিলে এই যে বিরাট প্যারেড্ অনুষ্ঠিত কোরল তার গৃহসম্মুখের মাঠ জুড়ে, তা দেখে তিনি বিস্ময় মানলেন। এই বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কটি তাঁর পরিচিত নয়। নিশ্চয়ই অন্য পাড়

থেকে সে এসেছে। শীলার ইচ্ছা হলো অধিনায়কের সংগে পরিচিত হতে।...

প্যারেড্ সমাপ্ত হয়ে গেছে। অধিনায়কের পার্শ্বে গুটি কয় তরুণ অফিসার দাঁড়িয়ে প্যারেড্ সম্পর্কেই আলোচনা কোরছে, এমন সময় ছোট্ট একটি ছেলে এসে অধিনায়ককে বল্ল: শুনুন, আপনি একটু আমাদের বাড়ি আসবেন? আমার দিদি আপনার সংগে কথা কইতে চান।

—তোমার দিদি? তিনি কে?

—শীলা চৌধুরি।

শীলা চৌধুরির নাম সবারই পরিচিত। অধিনায়ক বন্ধুদের দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেটির সংগে শীলাদের বাড়ির পথে পা বাড়াল।

শীলা সাগ্রহে অধিনায়ককে তাঁর ড্রইং রুমে নিয়ে বসালেন। অধিনায়কের নামটি প্রশ্ন কোরে জেনে শীলা বল্লেন: সুশান্তবাবু, আপনার নাম আমি বহুবার বহু ব্যাপারে শুনেছি। চোখে দেখিনি—সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি তাই।...দেখুন, আমি-ও মেয়েদেরকে প্যারেড্ শেখাতে চাই—কিন্তু আপনাদের সহযোগ ব্যতীত এ-পথে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।...তা ছাড়া আমি প্রত্যয় মেনেছি, এই দেশের কোনবিধ কল্যাণই সম্ভব নয়, যদি নারী ও পুরুষ একত্র হয়ে কাজে না নাবে। আলাদা আলাদা থেকে কুসংস্কারের জগদ্দল-পাথর কি একটুও নড়ান চলে? আপনাদের সাহায্য আমার কাম্য। পারস্পরিক যোগাযোগ না রেখে মেয়ে পুরুষের আত্মস্থ হবার যা কিছু চেষ্টা একপেশে হয়ে যাচ্ছে না কি?

সুশান্ত : আমি মানি আপনার কথা। কিন্তু আমাদের সাহায্য নিয়ে আপনার সত্যিকারের লাভ কিছু হবে না। আমরা ও আপনারা এক হয়ে না-গেলে, একই উদ্দেশে এক কর্ম্মপথের পান্থ না-হলে আমাদের সাহায্য পারস্পরিক হতে পারে না। আপনাদের কাজ যদি আমাদেরই কাজ হয়, এবং আমাদের কাজ-ও যদি আপনাদেরই কাজ হয়—তবেই we help ourselves : কী বলেন ?

শীলা : খুব খাঁটি কথা। বেশ তো, আপনাদের কর্ম্মপথ ও তার উদ্দেশ্য কি তা আমায় বলুন ? আমার কাজকর্ম্মতো আপনাদের অজ্ঞাত নয়—it is all public !···

সুশান্ত : আজ সময় নেই—কিছু মনে কোরবেন না। এর পর আপনার সংগে নিশ্চয়ই ভাল কোরে আলাপ কোরবো।

শীলা : শুভস্য শীঘ্রম্। দেরি হয় না যেন।

সুশান্ত সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ডান হাত তুলে ছোট্ট একটি স্যালুটের কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বন্ধুদের সংগে পা মিলিয়ে লাল-সুরকি-ছাওয়া পথের বুক দুপদাপ্ শব্দে মাড়িয়ে চলে গেল। শীলা জানলা দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে এই স্বেচ্ছাসৈনিকদের পথচলার পানে তাকিয়ে রইলেন।

ছয়

মেদিনীপুর কলেজ। ক্লাস বোসেছে। প্রফেসার পড়াতে পড়াতে পশ্চাতের বেঞ্চ লক্ষ্য কোরে একটু চুপ কোরলেন। তারপর কঠিন স্বরে বল্লেন : No talk, please !

পেছনের বেঞ্চে বোসে ছিল দুইটি তরুণ—পড়াশুনার দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল-না, চাপা-কণ্ঠে কি যেন আলোচনা করে যাচ্ছিল

মাষ্টারের তাড়া খেয়ে তারা থেমে গেল। কিন্তু মাষ্টার পড়ানয় মেতে উঠতেই তাদের কথা-কওয়া আবার শুরু হলো। আবার হুমকি এল ধমকের সুরে। তরুণদ্বয় মাথা গুঁজে চুপ কোরে রইল। পড়ান শুরু হয়েছে। সবার অজ্ঞাতে তরুণ দু'টি ক্লাসের বাইরে চলে গেল। অনেকক্ষণ পর শূন্য বেঞ্চের দিকে মাষ্টারের দৃষ্টি পড়ল। গম্ভীর হয়ে রইলেন একটু। রেজিষ্টারি খাতা খুলে লিখতে লিখতে বল্লেন: I mark them absent···তারপর রাগতস্বরেই আরো বল্লেন: That boy from Dacca—I don't understand what he is running after! ··

ছাত্ররা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি কোরল। মাষ্টার পড়িয়ে চল্লেন।···

* *

*

তরুণদ্বয় কলেজ-প্রাঙ্গণে এসে বোসেছে। ধীরে ধীরে তাদের কাছে কোত্থেকে যেন আরো কয়েকটি ছেলে এসে বোসল। দুপুর রোদে গাছের নীচে এই কিশোর-সভা তখন জমে উঠেছে।

একটি কিশোর—নাম তার বিনিময়—বল্ল: দেখুন দীনেশদা আমাদের মেদিনীপুর জেলাটাই ভয়ানক পেছনে পড়ে আছে। আপনাদের ঢাকার লোকের মত এখানকার লোকেদের প্রাণ নেই।

দীনেশ: বল কি? বীরেন শাসমলের এই দেশ—এখানকার লোকেদের প্রাণ নেই? এরা কতো আন্দোলন, কত ত্যাগ স্বীকার কোরে আসছে সেই একুশ সাল থেকে?

বিনিময়: তা হোক। ছাত্রদের কথা-ই আমি বিশেষ কোরে বলছি। তারা ভয়কাতর। কোন প্রাণ নেই তাদের।

দীনেশ : কিন্তু সত্যেন বসুর * এই মেদিনীপুর। তাঁকে ভুলবে কি কোরে এখানকার যুবকসম্প্রদায় ?

বিনিময় : সত্যেন বসুর নাম-ও জানে না আজকালকার ছেলেরা।

দীনেশ : এ নাম ভুলতে পারে না কোন তরুণ। তাদের রক্তে লিখা রয়েছে এ-নাম। তাদেরকে তন্দ্রামুক্ত কর তোমরা, দেখবে অজস্র সত্যেন বসু এই মেদিনীপুর শহরেই আবার জন্মে গেছেন।

বিনিময়, নিখিল, করুণা, কল্যাণ প্রমুখ প্রত্যেক কিশোরের চোখগুলি চক্‌চক কোরে উঠল। তারা বল্ল : দীনেশদা, আপনি সাহায্য করুন ; ঢাকা ও কোলকাতা থেকে লোক আনুন—আমরা মানুষ হয়ে উঠবার সাধনায় তাঁদের সান্নিধ্য একান্ত ভাবে গ্রহণ কোরবো।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর সভা ভঙ্গ হল।

সাত

এক বৎসর পরের কথা। গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক রাত্রি। কলেজের অনতিদূরের শূন্য মাঠ। বিনিময় প্রমুখ গুটি দশেক কশোর বোসে আছে দীনেশের অপেক্ষায়। নির্দ্দিষ্ট সময় তখনো উত্তীর্ণ হয় নি। দূরে দেখা গেল দুইটি ছায়ামূর্ত্তি। তারা সম্মুখে আসতেই কিশোর দল দীনেশকে চিনতে পারল। দীনেশের সঙ্গীটি কিশোরদের অপরিচিত।

দীনেশ বোসতে বোসতেই বলে চলল : ইনি তোমাদের নতুন দাদা, কোলকাতা থেকে এসেছেন। আমার বদলে ইনিই থাকবেন মেদিনীপুরের চার্জ নিয়ে। তোমরা এঁর কথামত কাজ কোরে যেয়ো।

কল্যাণ আবদারের স্বরে বল্ল : দীনেশদা, আপনি আমাদের ছেড়ে গেলে চলবে না। আমরা অকূল-পাথারে ভাসবো। নতুন অর্গেনাইজেশান্—আপনার হাতে গড়া—আর আপনি-ই চলে যাচ্ছেন ?

সস্নেহে দীনেশ উত্তর দেয় : আমার ডাক এসেছে ঢাকা থেকে। এ ডাক মৃত্যুর চেয়ে-ও অভ্রান্ত। যাঁকে সবাই মিলে তোমাদেরই জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি আমার চেয়ে-ও উপযুক্ত ব্যক্তি। তোমরা অবুঝ হবে কেন ?

বিনিময় বল্ল : তা' আপনি কিন্তু মাঝে মাঝে আসবেন।

—আমিতো কোন কিছুরই কর্ত্তা নই। পার্টির নির্দ্দেশ মত তোমাদের-ও চলতে হয়, আমারও চলতে হয়। যে-ব্যক্তির মুখ দিয়ে নির্দ্দেশ নির্গত হয় সে দলের প্রতিনিধি মাত্র, কর্ত্তা নয়।

—বুঝলাম-না আপনার কথা।

—এসব দল কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এ-দল তোমাদের প্রত্যেকের। তোমাদেরই ইচ্ছায় যাঁরা এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কণ্ঠ-নিঃসৃত আদেশ তোমাদেরই নিজস্ব আদেশ। অতএব আমার কর্ম্মক্ষেত্র ঢাকাতে যদি স্থির হয়ে থাকে তবে তা দলের তথা তোমাদের ইচ্ছায়-ই হয়েছে বোলে ধোরে নেবে।

তারপর একটু চুপ কোরে থেকে দীনেশ বলে চল্ল : ছ্যাখো, এই এক বৎসরে তোমাদের কাজ বহুদূর এগিয়ে গেছে। মেদিনীপুর শহরেই তোমরা ভাল একটা 'ইউনিট্' দাঁড় করাতে পার, যার মধ্য থেকে মরতে পারে এমন ছেলে সংখ্যাধিক্যে বেরিয়ে আসতে পারে। কাঁথিকে ঘিরেও তোমাদের কাজ ভাল চলছে। এবার একটু নজর দাও ঝাড়গ্রাম ও ঘাঁটাল অঞ্চলের দিকে।

নিখিল : টাকাপয়সার ভারি অভাব। কোলকাতা থেকে বইপত্তর, টাকাপয়সা না-পাঠালে আমরা বেশি দূর এগুবো কী কোরে ?

দীনেশ : টাকাপয়সা নিজেদের যোগাড় করতে হবে। পরের টাকায় চালবাজী চলে, দেশের কাজ চলে না। নিজে না-খেয়ে প্রত্যেক কর্ম্মী যদি টাকা যোগাড় করে তবেই তার চতুষ্পার্শ্ব থেকে টাকা আসে। কোলকাতা তোমাদের জন্য টাকা দেবে না—দেবে অন্য সবকিছু। টাকা দেবে মেদিনীপুর—তবেই মেদিনীপুর গড়তে পারবে তার দল।

বিনিময় : টাকা আমরা যোগাড় কোরবো-ই।···অরুণাদি বোলেছেন দু'শ বই কেনার টাকা তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের কাছ থেকে তুলে দেবেন। তা দিয়ে ক'টা নাইট্ স্কুল চলবে।

দীনেশ : এইতো চাই। বিপ্লবের ইতিহাসে মেদিনীপুরের দান ক্ষয়হীন-সৌন্দর্য্যে চিহ্নিত হবে, জেনে রেখো।

দীনেশ, নতুনদাদা এবং ছেলেরা অনেকক্ষণ ধোরে নানা আলোচনা করার পর সভা ভঙ্গ হলো। কল্যাণকে দীনেশ বল্ল : তুমি তোমাদের নতুনদাদাকে তাঁর বাসায় পৌঁছে দাও।—তারপর বিনিময়কে বল্ল : চল, অরুণাদির কাছে।···

শহরের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি। সে-পাড়ায় তখন নিশুতি রাত। সবার গৃহদ্বার-ই অর্গলবদ্ধ। অরুণাদির সদর দরজায় সামান্য আঘাত পড়তেই তিনি বেরিয়ে এলেন।···তাঁর পরনে শুভ্র থানধুতি। সৌম্য বিধবার মূর্ত্তি। বয়স চল্লিশের কোঠা পেরিয়েছে। তিনি জানতেন যে এরা আসবে। ঘরে ঢুকেই দীনেশ

উচ্ছ্বসিত হর্ষে বল্ল : দিদি, আপনি নাকি দু'শ বই-এর টাকা তুলবার ভার নিয়েছেন ?

সহাস্যে অরুণাদি বল্লেন : কে বল্ল তোকে ? বিনিময় বুঝি ?

দীনেশ : যে-ই বলুক। অত অল্প টাকায় কী হবে ?

অরুণাদি : অমন আদেখ্‌লেপনা করিস্‌নে। এই মরা শহর থেকে অত টাকা-ও তোলা যায় নাকি ? ছেলেরা কাপড়জামা বেচে, টিফিনের পয়সা জমিয়ে কত কষ্টে দু'চার পয়সা সংগ্রহ কোরছে দেখে আমি ভাবলাম যা কোরে হোক শ' দুই টাকা তুলে দেব। এর বেশি পাব কোথায় ? 'দেশের কাজ' 'দেশের কাজ' করিস—দেশতো মরে ঢোল হয়ে আছে ? কেউ সাড়া দেয় নাকি ?

দেশের অন্তরাত্মা সাড়া দিয়েছে, দিদি। নইলে ছেলেরা কি অমন পাগল হয়ে যেতে পারতো ? আপনি কি অমন সর্ব্বংসহা হয়ে এই ছেলেদের সকল আব্দার বরদাস্ত কোরতে পারতেন ?

অরুণাদি একটু হেসে বল্লেন : আমি শীগ্‌গিরই কোলকাতা যাচ্ছি। ওখানে ক'টা বড় বড় ঘরের সংগে আমার পরিচয় আছে—ওরা মেদিনীপুরেরই লোক! দেখি কিছু সংগ্রহ কোরতে পারি কিনা।

—কোলকাতা যাচ্ছেন ? তা হলে সুশান্তদা'র সঙ্গে দেখা হবে ?

—দেখা হবে সবার সংগেই। তুই ঢাকা যাচ্ছিস কবে ? এখানে কাকে বসিয়ে যাচ্ছিস ?

—ঢাকা যাব কাল। আজ সমর এসেছে কোলকাতা থেকে এখানকার দায়িত্ব নেবার জন্যে। আসবে সে যথাসময়ে আপনাকে প্রণাম কোরতে।

ইতিমধ্যে অরুণাদির ভৃত্য দুইখানা থালা বোঝাই অজস্র খাবার দিয়ে গেল।

দীনেশ মুহূর্ত্তে নিজের থালা উজার কোরে বিনিময় যা খেতে পারবে না বোলে তুলে দিল তা-ও নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্ল: দিদি, সত্যি বোলছি, আপনি হচ্ছেন মেদিনীপুর ইউনিট্-এর জননী।

অরুণাদি একটু হেসে বল্লেন: এটা হলো পেটুকের সার্টিফিকেট, দেশকর্ম্মীর নয়।

—দেশকর্ম্মীর ক্ষুধা পেটুকের ক্ষুধার চেয়ে ঢের বেসি। তাদের ক্ষুধা সর্ব্ব সত্তার, সর্ব্ব চিন্তার, সর্ব্ব প্রাণের। সেই বুভুক্ষু দেশকর্ম্মীদের সবল আত্মস্থতা লাভের বুভুক্ষা দূর কোরবেন বোলেই-তো আপনি তাদের মা, তাদের দলের জননী।

—হয়েছে, হয়েছে, আর বোক্‌তে হবে না।...শোন্, কাল ষ্টেশানে যাবার সময় আমার বাসা হয়ে যাস। কাজ আছে।

—তা যাব।...কিন্তু তখন আবার খেতেটেতে পারবো না।—বোলেই দীনেশ চঞ্চলতায় হেসে উঠল।

অরুণাদি উত্তর দিলেন: কাল হরতাল, কাল আবার খাওয়াদাওয়া কিরে?

দীনেশ বল্ল: হরতাল তো চারটেয় শেষ। যাবো সাতটার গাড়িতে। ফাঁকি দেয়া চলছে না, দিদি।

অরুণাদি শুধু হাসলেন।

দীনেশ ও বিনিময় উৎফুল্ল উচ্ছলতায় ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

আট

রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। কোলকাতা নগরী স্তব্ধ হয়ে আসছে। বৈঠকখানা রোডে (৯৩-১ এফ্) ত্রিতল গৃহের একতলায় একটি ছোট্ট ছাপাখানার দরজা খোলা। ছাপাখানার কম্পোজিটাররা ওভারটাইম্ খাটছে। মেসিনের দাপাদাপি শোনা যায়। ছোট্ট হলেও ছাপাখানায় কাজের ভিড় খুব বেশি। এমন সময় কুলিশ্রেণীর একটি লোক শূন্য ঝাঁকা মাথায় প্রেসের আপিস-ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্ল: উঁয় লোক মাল কর্ লে লিয়া, লেকেন্ হিসাব পূরা করনে মে এত্তে দের!

আপিসে উত্তর একা বোসে বোসে প্রুফ্ দেখছিল। কুলিকে ঢুকতে দেখেই সে বল্ল: আচ্ছা, উপর্ যানা। হাম্ আতে হেঁ।

একটু পরেই উত্তর দোতলায় উঠে এল। দোতলায় তা'র দু'খানা ঘর। একখানা কাগজপত্র ও টাইপে ভর্ত্তি। অপর খানায় তা'র থাকবার স্থান। দোতলায় তখন অন্য ব্যক্তি নেই! ঘরে ঢুকেই উত্তর দেখল, পশুপতি কুলির বেশ ত্যাগ কোরে অর্দ্ধ-এলায়িত অবস্থায় বোসে সানন্দে ছোলা ভাজা খাচ্ছেন। পশুপতির চুলে পাক ধরেছে। পলাতকের দুঃখময়-জীবনের চিহ্ন তাঁর ললাটে পরিব্যাপ্ত। স্বাস্থ্য এখন আর যেন অটুট নেই। চোখ দুটোর দীপ্তি কিন্তু বেড়েই গেছে। চল্লিশের নীচে বয়স, কিন্তু মনে হয় চল্লিশ পেরিয়ে গেছে বহু দিন। দুর্দ্দান্ত ঝড়ে অতি সহজে হাল ধোরবার প্রত্যয়লিখা তাঁর ওষ্ঠে অঙ্কিত। সারা আননে নেতৃত্বের আভাস পরিস্ফুট।...উত্তরকে দেখেই পশুপতি বোলে উঠলেন: হ্যাঁরে, জলের কুজোটা দেখছিনে তো?

বাইরে থেকে কুজোটা ঘরে নিয়ে এসে উত্তর পশুপতিকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দিতে দিতে বল্ল : খাবার রেখে দিয়েছি ঢেকে। আগে খেয়ে নিন না ?

—পরে খাব। এখন কথাগুলো সেরে নি।···হাঁ, বল্‌তো আর কতোকাল এমন কোরে পলাতকের জীবন বহন কোরব ?

—না, এবার আত্মপ্রকাশ করুন। আমাদের দল খুব ভাল দানা বেঁধে উঠেছে। পুলিশ কিছুই বুঝতে পারছে না। ঢাকা মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশালের কথা বাদ-ই দিলাম—মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা, কোলকাতায়ও দলের শক্তি আশাপ্রদ। এখন আপনার ডাইরেক্ট্ টাচ্ প্রয়োজনীয়।

—শোন্ উত্তর, আমি-ও স্থির করেছি এবার দলের ভালভাল কর্ম্মীদের সংগে পরিচিত হবো এবং কোলকাতার আশেপাশে কোথাও সন্দেহাতীত ভাবে খোলাখুলি আস্তানা গেড়ে বোসবো।

—খুব ভাল কথা, পশুপতিদা। আপনার সংস্পর্শে এলে এই দল সোনা ফলাবে—স্বপ্ন আপনার সার্থক হবে।

কস্‌বা অঞ্চলে খুব ভাল এবং নিরালা একটি একতলা বাড়ি পেয়েছি। আমার এক বন্ধু বৈষ্ণবের বাড়ি। তিনি একখানা ঘর আমায় ছেড়ে দিচ্ছেন তো বটে-ই, আমাকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য কোরবার জন্যে-ও তিনি ব্যস্ত। আমি ভেবেছি ওখানে বাসস্থান পেলেই কংগ্রেসে-ও ঢুকে যাব। বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে যাঁরা আমার বন্ধু তাঁহা বার বার কোরে বোলছেন বি. পি. সি. সি-র সভ্য হতে। কংগ্রেসে না-ঢুকলে পুলিশের উপদ্রব অত্যধিক হয়ে উঠবে।

—বেশতো।

—তুই কাল-ই একবার আমার ডেরাটা চিনে আসিস। তোর পেছনে টিক্‌টিকি লেগেছে নাকি?

—আজকাল খুব ওয়াচ্ কোরছে মনে হয়। তবে আমি যথেষ্ট সাবধানে চলি। এই ছাপাখানাটা আমাদের মস্ত ক্যামোফ্লাজ্। তবে 'বেণু' বেরুচ্ছে এখান থেকে। 'বেণুর' সর্ব্বরন্ধ্রে একটি অনাগত যুগের আগমন-ধ্বনি। বিনিদ্র জাতির রক্তে তার দোলা লেগেছে। পুলিশের কানে তা সুরালো ঠেকছে-না ঠিকই। তবু ওরা এখনো বোঝেনি 'বেণু'র অন্তর্নিহিত সম্ভাবিত-ক্ষমতা কতটুকু। ওদের এই অজ্ঞতার ফাঁকে ত্বরান্বিত গতিতে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে সংগঠন কার্য্যকে সম্পূর্ণ কোরে তোলার দিকে।

উভয়ে একটু চুপ কোরে থাকার পর উত্তর-ই আবার বলে: আচ্ছা, পশুপতিদা, আগামী সোমবার সম্পূর্ণাদির মৃত্যু-তারিখ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুহীন হবার দিন—সেদিন আপনার সংগে গুটিকয় বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দি।...আপনার নাম তাঁরা জানেন—সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তাঁদের ঐ পুণ্যলগ্নেই হোক?

পশুপতি সম্মতিসূচক সংকেত কোরতেই উত্তর উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিরাট দায়িত্বভার বাঞ্ছিত জনের স্কন্ধে চাপিয়ে হাঁপ ছাড়বার অবকাশলোভী উত্তরের চতুষ্পার্শ্ব যেন হাল্কা বোধ হল। পুরাতন দিনের আব্দারের সুরেই সে বল্ল: রাত অনেক হলো, পশুপতিদা। এবার খেয়েদেয়ে ঘুমুতে না-পারলে হচ্ছে না।

—তুই বুঝি এখনো ঘুম-কাতুরে আছিস?

—আপনার মত নিদ্রা-ত্যাগের ব্রত আমি নিয়েছি নাকি?

—থাম্। মাংস রেঁধেছিসতো? দেখবো, খাবার বেলায় তোর ঘুম থাকে কিনা?...

দু'জনের আহার-পর্ব্বের প্রস্তুতি চলল।

নয়

সোমবারের রাত্রি বিশিষ্ট একটি ক্ষণ হয়ে বাঙলার গুটিকয় তরুণের ভাগ্যে উপস্থিত হলো। উত্তরদের ছাপাখানার দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে সুশান্ত, বিনয়, দীনেশ প্রমুখ আটদশটি তরুণ পরম নিষ্ঠা নিয়ে বোসে আছে—তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ আর থাকে না। আটটায় তাদের সর্ব্বময় নেতা, কল্পনার আদর্শ পুরুষ, মহোত্তম বিপ্লবী পশুপতিদার সংগে সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটবে। জীবনের বৈপ্লবিক-পরিবেশে এর চেয়ে পুণ্যতম-লগ্ন আর কী হোতে পারে? কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যেন নড়ে না? কই, আটটা বাজছে-না তো কিছুতেই? ...সহসা সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল।...উত্তরের সংগে সংগে এক পুরুষ ঘরে ঢুকলেন। মাথায় তাঁর অবিন্যস্ত এক রাশ সাদা-পাকা চুল। পরনে খদ্দর। চোখেমুখে দীপ্তি। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। দীর্ঘকায় এই পুরুষের স্বাস্থ্য এককালে অজস্র হয়ে ছিল, আজ তাঁর দেহের সর্ব্ব রন্ধ্রে কৃচ্ছ্রতার কষাঘাত পরিস্ফুট। ঘরে ঢুকতেই ছেলেরা তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল—জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তার পদতলে ভাগ্যকামীদের অনবদ্য প্রণাম!

পশুপতিকে মাঝখানে বসিয়ে উত্তর একে একে প্রত্যেকটি তরুণের পরিচয় দিল। সহাস্যে পশুপতি বল্লেন: তোমাদের খুঁটিনাটি সংবাদ আমার জানা। কেবল মুখ-চেনা বাকি ছিল। তোমাদের উত্তরদা আমাকে এক ফোঁটা সংবাদ জানাতে-ও কার্পণ্য করেন নি। উত্তর ডিটেল্‌স্‌-এর মাষ্টার!

তারপর প্রত্যেকটি ছেলের নামগোত্র বাড়িঘর ও আত্মীয়স্বজনের বহু সংবাদ সংগ্রহ কোরে পশুপতি কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে শুরু

কোরলেন : দ্যাখো, আজ আমার খুশীর অন্ত নেই। 'একুশ সালে উত্তর আন্দামান থেকে ফিরে এসে দেখলো—আমাদের দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবলমাত্র উত্তর, আমি ও দু'একটি অজ্ঞাতনামা (পুলিশের কাছে) বন্ধু বেঁচে আছি বিপুলদা-সম্পূর্ণাদেবী-অজিত-আশু-নিরঞ্জন যে-দীপশিখা জ্বালিয়ে গেছেন তাকে আগ্লাবার জন্যে! বিপুলদা নির্ব্বাচিত। তাঁর দেশে ফিরে আসবার পথ নেই বোলেই তিনি জীবন্মৃত। আমি পলাতকের জীবনযাত্রা কোনপ্রকারে নির্ব্বাহ কোরে যাচ্ছি—আর উত্তর জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে সম্বলহীন অবস্থায় সংসারে খেয়েপরে বাঁচবার পথটুকু হাতড়ে বেড়াচ্ছে···তারপর বহু কষ্টে, বহু চেষ্টায় ধীরে ধীরে তোমরা এসে উত্তরের পাশে আজ দাঁড়িয়েছ। দল আবার নতুন আশা ও রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই দল-সংগঠনে উত্তরের অবদান তুলনারহিত। তাঁকে তোমরা আমার চেয়ে কম চেন-না। আজ তোমাদের সমবেত চেষ্টায় দল সারা বাঙলায় শুধু নয়, বাঙলার বাইরে-ও কতকগুলি ঘাঁটি করেছে। তোমাদের যথার্থ শক্তি তোমাদের মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষায়। পুলিশ জানে—তোমরা সমাজ সংস্কার কর, মড়া পোড়াও, বন্যায় প্লাবনে অথবা মেলাপার্ব্বণের ভিড়ে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব নাও। তা ছাড়া জানে—তোমরা নাইট-স্কুল কর, একটু স্বাস্থ্যচর্চ্চা কর, আর হাতে লেখা কাগজ-ও বার কর দু'চারখানা। এর বেশি তারা কিছুই জানে না। এখন অবশ্য 'বেণু' বার কোরছ, গরম গরম বই লিখছ আর মিলিটারি কায়দায় মার্চপ্যারেড্ শুরু করেছ। আত্মগোপন চেষ্টা তাই আর বেশিকাল সফল হবে না। ইংরেজের পুলিশ এ-ধারার নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং খাকি প্যাণ্ট্-সার্ট্কে বড় ভয় করে। গরম কথাবার্ত্তাও পছন্দ করে না—লেখার মধ্য দিয়ে তো নয়ই।···

একটু দম নিয়ে পশুপতি আবার শুরু করলেন : হাঁ, দলে দলে ছেলে মেয়ে জোগাড় কর। অনাগত সংগ্রাম যখন সত্যি আসবে তখন তার পুরোভাগে স্থান নিলেই কেবল চলবে না, তাকে সাফল্যের দিকেও নিয়ে যেতে হবে তোমাদেরই। তোমাদের তৈয়েরি তাই নিখুঁত না-হলে চলবে না।

বিনয় বল্ল : আমাদের পূর্ব্ব-চেষ্টা ব্যর্থ হল কেন, দাদা ?

পশুপতি : তার মূল কারণ, আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব। পৃথিবীর ইতিহাস পড়ে আমরা বিপ্লবের চেষ্টা করেছিলাম—আমাদের জাতির নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, এক ফোঁটা রক্ত-ঝরানর অভিজ্ঞতাও নয় !

সুশান্ত : কেন ? ভারতবর্ষের অতীত কি বীর্য্যে ও ত্যাগে কম গৌরবময় ?

পশুপতি : কম নয়। কিন্তু সে হলো অতীতের ইতিহাস। সেই অতীত বর্ত্তমানের মধ্যে বেঁচে নেই বোলেইতো যত দুঃখ। বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা আত্মসম্মানবর্জ্জিত পঙ্গু এক দাস জাতির কলঙ্কলিপ্ত অভিজ্ঞতা। সে-অভিজ্ঞতায় বিব্রতদের স্বাধীনতা-লাভের দুঃসহ ইচ্ছা জাগ্রত হতে পারে, কিন্তু সে-ইচ্ছাকে সফল কোরে তুলবার নৈপুণ্য তাতে থাকে না। আমাদের ব্যর্থতার কারণ এইখানেই।

দীনেশ : তবে কি আপনাদের চেষ্টা কেবল মাত্র ব্যর্থতায়-ই পর্য্যবসতি হয়েছিল ? তার কি কোন অবদান নেই ?

পশুপতি : নিশ্চয় রয়েছে। তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান বর্ত্তমানের তোমরা। আমাদের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে আজকের তরুণ যে-সংগ্রাম রচিত কোরবে তা হবে ঢের বেশি সফল, ঢের বেশি কার্যকরী। আমাদের চেষ্টার সার্থকতাতো এই পথে-ই।

পশুপতি আবার শুরু কোরলেন: আমরা ধার কোরে প্রেরণা যুগিয়েছি ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডি, নয়তো লক্ষীবাই-শিবাজি-প্রতাপ-সিংহের জীবন থেকে। আজ তোমরা প্রেরণা পাচ্ছ সম্পূর্ণাদেবী-অজিত-আশু-নিরঞ্জনের মৃত্যুবরণ থেকে, প্রেরণা পাচ্ছ কানাই-ক্ষুদি-চিত্তপ্রিয়-মনোরঞ্জন-নীরেন-সত্যেনের আত্মদান-থেকে, প্রেরণা পাচ্ছ রাসবিহারী-যতীনমুখার্জ্জি-বিপুলদার মত নেতৃবর্গের অসামান্য লীডারশিপের প্রভাব থেকে। তোমাদের কর্ম্ম-পরিবেশ তাই বাস্তবতর, প্রশস্ততর।

দীনেশ: কিন্তু গান্ধিজির অহিংস-আন্দোলন আমাদের বিস্তর ক্ষতি কোরছে। আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজের সহায়ক রূপেই গান্ধিপন্থিরা কাজ করে যাচ্ছে যেন। মেদিনীপুরে অন্তত আমি তা-ই দেখেছি!

পশুপতি: উঁহু। অন্যভাবে বস্তুর বিচার কর। গণ-আন্দোলন ব্যতীত দেশের স্বাধীনতা তুমি আনতে পার না। মহাত্মা ছাড়া এই অল্প সময়ে এই বিপুল ভারতবর্ষে গণ-জাগরণ ঘটানো আর কারো পক্ষেই সম্ভব হতো-না। কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা সঞ্জীবিত করা কি সহজ? বিশেষ কোরে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে এ-ভাব পরিস্ফুট কোরে তোলা তো সম্ভব। আমি বোলবো, মহাত্মার অবদান অপূর্ব্ব। তিনি ঘুমন্ত মনোয়াড়ের ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছেন। দেশশুদ্ধ যে-আলোড়ন তিনি সৃষ্টি কোরলেন তাতে তোমাদেরই সুবিধে। মানুষ জেগে থাকলে তো পথের বিচার কোরবে? তিনি জাগিয়ে দিলেন যাদেরকে, তাদের পথ বাত্‌লাও-না তোমরা? তোমাদের সংগে গান্ধিপন্থীরা পাল্লা দেবেন কী কোরে?

দীনেশ : আমাদের যাচ্ছেতাই নিন্দে কোরে বেড়ায়। বলে-যে আমরা নাকি ডাকাতের দল, মানুষ খুন করা নাকি আমাদের পেশা।

পশুপতি : তা বলুক। যারা মরতে পারে, তাদের সংগে যারা মরতে ভয় পায় তাদের কম্পিটিশন টেকে না।

বিনয় : আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনার মুখে কিছু শুনতে ইচ্ছা করে, দাদা।

পশুপতি : উদ্দেশ্য ? উদ্দেশ্য হলো সশস্ত্র-বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা। সে-স্বাধীনতার স্বরূপ তোমাদের কল্পনায় পরিস্ফুট থাকা প্রয়োজন। আমি সে-সম্পর্কে কিছু বোলবো।··· হাঁ, আমরা চাই ভারতবর্ষের সমগ্র নরনারীর রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও মানসিক মুক্তি। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকটি ভারতবাসী যুক্ত হবে এবং রাষ্ট্রিক-ব্যবস্থার মালিক হবে। গণস্বার্থে গণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত কোরবার কোন স্তরেই দেশীবিদেশী ধনিককুলের কোন অভিসন্ধি মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াতে পারবে না, কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর স্বার্থই জাতির স্বার্থকে ব্যাহত কোরবার সুযোগ পাবে না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনবার জন্য চাই অজস্র কেডার্—যারা জীবন নিয়ে খেলা কোরতে জানে, যারা ত্যাগের পথে পথ-চলতে ভালবাসে। এই কেডার্‌শ্রেণী অর্থাৎ স্বাধীনতাযুদ্ধের সজ্ঞান-সৈনিকেরাই ধীরে ধীরে কৃষকমজদুরদের মধ্যে ঢুকে তাদের হয়ে কাজ কোরবে, তাদেরকে গণ-সৈনিকে পরিণত কোরবে। মহাত্মার পথ, আমাদের পথ নয়। কিন্তু মহাত্মা-বিরচিত-পথেও আমাদেরকে হেঁটে চলতে হবে। অহিংস-মন্ত্রের আহ্বানে কেউ আসে-নি, এসেছে অহিংস ঋষির আহ্বানে। কাজেই দেশবাসীর মেকী-অহিংসার প্রহসন দেখে

ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেন ? এ যখনই দেখবে যে হিংস্র-ইংরেজকে তোমরা লাঠিপেটা কোরছ, তক্ষুনি ছুটে আসবে তোমাদের পেছনে। কিন্তু সেই কালে তাদেরকে পেছনে নিয়ে চলবার শক্তি যদি না-দেখাতে পার তবে সে-জন্য দায়ি হবে তোমাদের অক্ষমতা, অহিংস-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা নয়।

দীনেশ : আমরা কি কংগ্রেস-মুভ্‌মেণ্ট কিছু কিছু কোরব ?

পশুপতি : নিশ্চয়ই। ওপেন্ মুভ্‌মেণ্ট কোরবে তোমরা কংগ্রেসের সংগে 'কংগ্রেসী' হয়ে; আর গোপনে গড়বে বিপুল দল সশস্ত্র-বিপ্লবকে সার্থক করার স্বপ্নে। তাজা ছেলেমেয়ে যোগাড় কর, অজস্র শেল্টার-এর বন্দোবস্ত কর, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা কর। উত্তর রয়েছেন, আমি রয়েছি—আমরা তোমাদের সহায়ক হব সর্ব্ব কর্ম্মে। কালক্ষয় কোর না—তোমরা তৈয়ের হও—দিন আগত ঐ।...

উপস্থিত যুবকবৃন্দ উৎসাহ ও উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। পশুপতি তাঁর কথা শেষ কোরলেন এই বোলে : বন্ধু তোমরা, যে-মৃত্যু জীবনকে অক্ষয় কোরে রাখে সেই মৃত্যুকামী বন্ধু তোমরা! তোমাদেরকে আমার নমস্কার। যৌবনদেবতা তোমাদের রক্তে সাড়া তুলেছেন—আমি আজ সে-দেবতার দাক্ষিণ্য থেকে দূরে সরে গেছি। তোমরা সম্পূর্ণাদেবী-অজিত-আশু-নিরঞ্জনের বংশধর—তোমরা বিপুলদার উত্তরাধিকারী—তোমরা যে-কাজের ভার নিয়েছ তার সাফল্য বিপ্লবী-ভারতের মুখ বর্ণোজ্জ্বল করুক, বীরের মৃত্যুভাগ্য যেন তোমাদের সামর্থ্যে আমি-ও অর্জ্জন কোরতে পারি।...

পশুপতি নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর গভীর হয়ে প্রণাম জানালেন তাঁর পুরোযায়ীদের রক্তবিধৌত পথ-ধূলির উদ্দেশ্যে।...

সভা ভঙ্গ হলো। তরুণবৃন্দ একে একে পশুপতিকে প্রণাম কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পশুপতি উত্তরকে বল্লেন : নীচে বোসে যারা কম্পোজ কোরছে তারা কি দলের লোক ?

উত্তর : হাঁ।

পশুপতি : তোরা করিৎকর্ম্মা ব্যক্তি বটে।···আজ বিপুলদা নির্ব্বাসিত। তিনি থাকলে তোদের এই অদ্ভুত দলগঠনশক্তি দেখে আত্মহারা হতেন। যাক্, সুদূর থেকে তাঁর অনাহত আশীর্ব্বাদধারা নিশ্চয় তোদের উপর বর্ষিত হচ্ছে—নইলে how could you create a wonderful world out of void ?···

উত্তর চুপ করে রইল।

দশ

বালীগঞ্জ রেলওয়ে ক্রসিং পেরিয়ে কস্‌বায় ঢুকেই হরিশরণ গোস্বামীর এক তলা গৃহ। সে-গৃহে হরিশরণবাবু ও তাঁর স্ত্রী ব্যতীত অপর লোক নেই। ওঁরা স্বামীস্ত্রী কোন্ এক বাবাজির দারুণ ভক্ত। কিন্তু পশুপতিকে তাঁর পলাতক-জীবনে ওঁরা পরম আত্মীয় বোলে গ্রহণ করেছিলেন। পশুপতির জন্য ওঁরা সব কিছু কোরতে পারেন। ওঁদেরই গৃহের একখানা ঘর পশুপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট রয়েছে।

তখনো আকাশ ফর্সা হয়নি। স্নানান্তে ধপধপে ধুতি পরে খোলা-বারান্দায় পশুপতি বোসে আছেন। কণ্ঠে তাঁর গুণগুণ-ধ্বনি "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম-সমান।" বৃদ্ধ বৈষ্ণব-দম্পতি রোজই প্রত্যুষে পশুপতির কণ্ঠে এই গুঞ্জনধ্বনি দূর থেকে শুনে আনন্দ পান

…ঠিক এমনি সময় উত্তর এসে উপস্থিত। পশুপতি ইসারায় তাকে বোসতে বোলে তন্ময় হয়ে গুণগুণিয়ে যাচ্ছেন।…গান সমাপ্ত হলে একটু হেসে পশুপতি বল্লেন: বড় সুন্দর সময়ে এসেছ। সংগে টিক্‌টিকি আনোনি তো?

—রাত থাকতে এ-জন্যেইতো বেরিয়েছি। সংগ নেবার সৌভাগ্য কোনো ব্যাটার হয়নি।

—বেশ, বেশ! চল পেছনের বারান্দায় গিয়ে বসি—কেউ বিরক্ত কোরবে না।

পশ্চাতের বারান্দার অদূরেই ছোট্ট সরষেক্ষেত। সরষেফুলে-ছেয়ে-থাকা ক্ষেতখানি পেরিয়ে একটা পুকুর। পুকুর-ভরা ফুটে আছে রক্তকমল। বাড়িঘর ওদিকটায় বিশেষ কিছু ওঠেনি বলে অনেকটা দূর ফাঁকা। গাছগাছালির সবুজ সংকেত কেমন যেন মায়াঘন।

বোসতে বোসতে উত্তর বল্ল: বেড়ে জায়গাটি বেছে নিয়েছেন কিন্তু? ভারী চমৎকার! আপনার বন্ধু-বাবাজি কি হিংসা-মন্ত্রের পরিপোষক?

—আঃ, শুনতে পাবেন ওঁরা।…আলাপ করিয়ে দেব তোকে তখন দেখবি ওঁরা স্বামীস্ত্রী ঠিক এ-জগতের লোক নন। অহিংস তো বটেই—আমার মত হিংস্র লোককেও ঘৃণা করেন না।—বোলেই পশুপতি হেসে উঠলেন।

—তাই নাকি? চা-টা দেবে তো খেতে?

—পাবি, পাবি—সব-ই পাবি। একটু বোস্‌ তো স্থির হয়ে?

উত্তর: আপনার কাছে এলেই আমার পুরানো দিনগুলি ফিরে আসে, পশুপতিদা। আমি ছেলেমানুষ হয়ে যাই।…

পশুপতি কিছু বল্লেন না। সস্নেহে উত্তরের ডান হাতখানার আঙ্গুল কটি নিয়ে নাড়াচাড়া কোরতে থাকেন।

এমন সময় একটি বালক ভৃত্য ছুইটি বড় কাঁচের গেলাসে কোরে টাট্‌কা ঘন দুধ এনে পশুপতিদের কাছে রেখে গেল। পশুপতি সহাস্যে উত্তরকে বল্লেন : এ দিয়ে সুরু করো। ধীরে ধীরে চা এবং টা-ও আসবে। ভেবো না।

—বাঁচালেন! বোলেই উত্তর তার গেলাসে চুমুক দিল।

দুধ খাওয়া সাঙ্গ হলে পশুপতি বল্লেন : তারপর সংবাদ কি?

—হাঁ, বোলছি।...সংবাদ হলো—সেদিন আপনি যে-মেয়েটির সঙ্গে আলাপ কোরলেন তাকে ভোলেন-নি তো? ঐ যে গড়ের মাঠে?

—ভুলবো কেন?...আমি খুশী হয়েছিলাম তার সঙ্গে আলাপ কোরে!...তারপর ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেছে যে-জন্যে সে মেয়ে আমার মনে গভীর দাগ কেটে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস কোরেছি, সে-মেয়ে সম্পূর্ণাদেবীরই জাতভাই।...

উত্তর কৌতুহলপরবশ হয়ে প্রশ্ন কোরলো : কী ঘটলো, পশুপতিদা?

শ্রদ্ধাঙ্কিত-কণ্ঠে পশুপতি বলে চল্লেন : আমি পায়ে হেঁটে আসছি লোয়ার সারকুলার রোড্ দিয়ে। জোড়া-গীর্জ্জা পেরুতেই দেখলাম অপর ফুটপাথে ভিড়। ঔৎসুক্য হলো। এগিয়ে গেলাম। চোখে পড়ল, ছুটো গোরা সৈন্য। ওদের যেটা অধিক জোয়ান তার নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে এবং পরনের প্যাণ্ট ও জামা স-রক্তস্রাবে ভিজে যাচ্ছে। অপর সৈন্যটিকে ক্রুদ্ধা এক বাঙালী-তরুণী মুষ্টি পাকিয়ে বোলছে : come on, share thy friend's

fortune! সাহেবনন্দনেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় !…এমন সময় ছুটে আসতে থাকে একটা ট্যাক্সি, দেখেই তাদের বুদ্ধি খুলে গেল। মুহূর্ত্তে সেই ট্যাক্সিটি চেপে মাণিকেরা উধাও। তরুণী ফুটপাথে লুণ্ঠিত তার ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ্‌টি তুলে বাস-এ উঠে পড়্‌ল। আমি বিস্ময়ানন্দে দূর থেকে মনেমনে সেলাম ঠুকে বল্লাম: সাবাস, সর্ব্বাণী! তোর জাতের জয় অনিবার্য্য।…

উত্তর আশ্চর্য্য হয়ে: সে কি আমাদের সর্ব্বাণী?

—হাঁগো হাঁ। আমাদেরই সর্ব্বাণী—যার সংগে তুমি আমায় আলাপ করিয়ে দিয়েছ।

—আপনাকে চিনলো না?

—আমায় দেখলো কই? আমি-ই তো ভিড়ের ফাঁকে দেখলাম সেই চণ্ডিকার সংহার-পিয়াসিনী রূপ! মেয়ে বটে।…হাঁ সাহেবদ্বয় ও তাদের হস্ত্রীঠাকুরাণী স্থান ত্যাগ কোরে গেলে ভিড়ের বাক্যস্ফুরণ হলো। অনেক কষ্টে তথ্যাদি যোগাড় কোরে বুঝলাম যে, সর্ব্বাণী একা চলছিল রাস্তা দিয়ে। গোরা দুটো তার কাছে এসে বেসামাল কথা বলে। সর্ব্বাণী প্রত্যুত্তর দেয় জোয়ান সাহেবের রক্ত ঝরিয়ে এবং তার সঙ্গীকে মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান কোরে।…দু' একটি যুবক নাকি পরিশেষে সাহায্য কোরতে চেয়েছিল। সর্ব্বাণী তাদের ধমকের সুরে বলেছিল: That's my business. Stand aside.

—বিপদে পড়লে ও-মেয়ে কারো সাহায্যই নিতে চায় না। ও বলে, আমি মরে গিয়েও প্রমাণ কোরবো· যে আমি হারতে পারি, কিন্তু আমি 'অবলা' নই।—উত্তর বল্ল।

পশুপতি: এ মেয়ের অমন কথা বলা-ইতো স্বাভাবিক।

একটু চুপ কোরে থাকার পর হাঁ, তোরা যেসব বন্ধু জুটিয়েছিস—তারা সবাই হীরের টুকরো!…জানিস, পরদিনই আমি সর্ব্বাণীকে কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌ কোরে এসেছি।

উত্তর সাশ্চর্য্যে ঃ তাই নাকি ?…সর্ব্বাণীর ভাগ্যি সত্যি।

—উঁহু, ভাগ্যি আমার, সর্ব্বাণীর নয়। সম্পূর্ণাদেবীর বংশধর ওরা, ওদের সংগে কাজ কোরবার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি কি কম পুণ্যের কথা ?

উত্তর চুপ কোরে রইল। পশুপতির শেষোক্ত কথাগুলোর সংগে সে যেন বিশেষ সায় দিতে পারল না। পশুপতি তা লক্ষ্য করে বল্লেন ঃ কি ভাই, চুপ কোরে গেলে যে ?

উত্তর সসংকোচে শুরু কোরল ঃ পশুপতিদা, আজ আপনাকে সর্ব্বাণীর কথাই বিশেষ কোরে বোলতে এসেছিলাম। কিন্তু কথাটা উঠে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে, আপনার দিক থেকেই।…সর্ব্বাণী বস্তুতই অদ্ভুত মেয়ে ; তার সাহসের অবধি নেই ; কিন্তু দোষ-ও মারাত্মক।…সম্পূর্ণাদির কথা আনবেন না—বাঙলাদেশে তাঁর পায়ের কাছে এগুতে পারে এমন মেয়ে দেখিনে।

পশুপতি ঃ সর্ব্বাণীর বিরুদ্ধে তোমার নালিশ জমেছে ? বল, কি তার দোষ।

উত্তর ঃ অবাধ্যতা তার মস্ত ব্যাধি। দলের নিয়মকানুন সে মানবে না। চালচলন ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে রিপাল্‌সিভ্‌। ছেলে-মেয়েরা খ্যেপে গেছে। ছোকরা প্রফেসরদের সংগে দহরম মহরম চিরকালই খুব বেশি। কেমেষ্ট্রির হেড্‌-অব্‌-দি ডিপার্টমেণ্ট ঐ আয়ারটার সংগে হালে ওর ভাব এত হয়েছে যে শহরময় ঢিঢি পড়ে গেছে। দিনের পর দিন ওর সংগে সিনেমা দেখে ফার্পোর

ডিনার খায়;—শুনি আবার নাচের মহড়া-ও নাকি চলে। মোট্, রিপাল্‌সিভ্।...

পশুপতি : তোমরা ডেকে পাঠালে সে আসেনা বোলছ?

উত্তর : আসে তখনই, যখন রোমান্টিক কোন কিছু ব্যাপারের সংগে জড়িত হবার সম্ভাবনা তার থাকে।

পশুপতি : মানে?

উত্তর :—অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে-রাখা অথবা সংগ্রহ-করার যেকোন সম্ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠায় তার আনন্দ। আপনি দলের কাছে একটি রোমান্টিক ফিগার—আপনার সংগে পরিচিত হবার আগ্রহ ছিল তার খুব বেশি। এ ছাড়া মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা কোরতে সে ওস্তাদ। থ্রিল্ আছে যেসব কাজে, সেসব কাজ তাকে দেয় পূর্ণ উৎসাহ।...কিন্তু, চালচলন বিশ্রী। সর্ব্বাণীর সংগে জড়িত থাকা মানে সর্ব্বত্র আন্‌পপুলার হওয়া।...

পশুপতি হেসে বল্লেন: তবু বলি, এ-মেয়ে সম্পূর্ণাদেবীর সগোত্র। এ মেয়ের প্রতি রক্তকণায় কন্‌ভেন্‌শান্-মুক্তির আহ্বান। এ সত্যিকারের বিপ্লবী। এ মেয়ে নিজের বিধান নিজে গড়ে। মিথ্যার সংগে কারবার নেই বোলে এর বিধানগুলো নিজস্ব পথ কোরে নেয়। সে পথকে তাই উপেক্ষা করা যায় না।

উত্তর : ওর চালচলন কি কোরে সমর্থন কোরছেন, পশুপতিদা?

পশুপতি : চালচলনের কথা হচ্ছে না। এই চালচলনের পেছনে যে-মানুষটি রয়েছে তাকে চিনতে চেষ্টা কোরছি। চালচলন যা বাইরে থেকে দেখ, তাকেই হয়ত একদিন গর্ব্বের সঙ্গে গ্রহণ কোরবে তার শেষ কাজটি দেখে। তখন 'বিশ্রী'র সংগে সুশ্রীর

যোগসূত্র পেয়ে আজকের 'বিশ্রী'কে পরম রমনীয় কোরে স্পর্শ কোরবে হয়তো।

উত্তর: আপনি নিজেই তা'হলে ওর সংগে ডিল্ করুন। অন্য সবায়ের কাছ থেকে থাকুক ও দূরে দূরে। নইলে মঙ্গল হবেনা কারু ই।

পশুপতি: বেশ···ওর শক্তি ও সামর্থ্য মেয়েদের মধ্যে তো দূরের কথা, ছেলেদের মধ্যে-ও খুঁজে পাওয়া ভার। ওকে ওর পথ তোমরা ধরিয়ে দিতে পারো নি। ওর নিজস্ব পথ ব্যতীত তোমাদের গড়া পথে চলতে গেলে ও যাবে ব্যর্থ হয়ে।···ওর ভার আজ থেকে ওকেই দেব আমি। নিজের জীবন দিয়ে, দেখো, পাল্টে দেবে সর্ব্বাণী তোমাদের ভুল ধারণা।

উত্তর: আপনার ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হোক। কিন্তু আপাতত এ আমি জানিয়ে রাখি যে, দলের মেয়েদের ইম্‌প্রেশান্ ওর উপর বড্ড খারাপ।

পশুপতি: তাদের মিথ্যে ইম্‌প্রেশান্ বিলীন কোরে দেবার দায়িত্ব সর্ব্বাণীর। সর্ব্বাণীর সেই সামর্থ্য-যে রয়েছে তা কেবল তোমায় বিশ্বেস কোরতে বলছি, উত্তর। দলের ছেলেমেয়েরা কি ভাবল তা নিয়ে এ-ক্ষেত্রে আমি কথা বলছি না।···

উভয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে ভৃত্য দুই থালা খাবার ও চা রেখে গেল। খাবারের পরিমাণ দেখে উত্তর খুশী হয়ে বল্ল: নাঃ, এঁরা লোক ভাল দেখছি।

পশুপতি একটু হেসে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।···

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

১৯২৯ সালের শেষাশেষি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব্ব। রাষ্ট্রিক-গগন ঘনমেঘে সমাকুল। কূলপ্লাবি বর্ষণের পূর্ব্বাভাস। সাইমন্ কমিশনের হাবভাবে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট। মহাত্মা গান্ধি জাতিকে ঘোর সংগ্রামের তীরে নিয়ে যাচ্ছেন। ইংরেজ সে-চ্যালেঞ্জ মনে মনে গ্রহণ কোরে তৈয়ারির বাকি রাখেনি। কংগ্রেস-ও 'যুদ্ধং দেহি' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। বিপ্লবীরা অহিংস-আন্দোলনে বিশ্বাস না-কোরলেও এ-আন্দোলনের সবটুকু সুযোগ গ্রহণে ইচ্ছুক। সুতরাং তাঁরা-ও কংগ্রেসের সংগ্রাম-চেষ্টার সংগে সাগ্রহে জড়িত। কিন্তু এই বিপ্লবীদের মধ্যেই কতিপয় তরুণ একান্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু কোরবার পূর্ব্বেই ব্রিটিশ সিংহকে আঘাত দিতে বদ্ধপরিকর। ভকৎসিংহের সেন্ট্রাল্ য়্যাসেম্ব্লির-গৃহে বোমা নিক্ষেপ করার মূলে ঐ নীতি—বুড়ো-কংগ্রেসীদেরকে যুদ্ধে নাবাতে হলে জাতির তারুণ্যশক্তিকেই হান্‌তে হবে এই মুহূর্ত্তে এমন আঘাত, যাতে ইংরেজের মসনদ কেঁপে ওঠে।···ভকৎসিংহের কার্য্যকলাপে বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু যতীনদাসের মৃত্যুবরণে শুধু বিপ্লবী নয়—সমগ্র জাতিই অদ্ভুত ঐকান্তিকতায় অভিভূত হয়ে পড়ল। বাঙলার যুব-সমাজ ভারতের এই 'টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনি'কে বরণ কোরে প্রাণ থেকে বোলে উঠলো :

"তিমিরান্তক শিবশঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে!"

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর—যুবসম্প্রদায়ের অস্থিমজ্জার আত্মীয় এই বীর—বাঙালীর ঘরে ঘরে তরুণ-তরুণীর প্রাণে রক্তাক্ষরে প্রত্যুত্তর দেবার সংকল্প উচ্চারিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি কোরে গেল।...

ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্-এর কাজ বৈপ্লবিক-সত্তায় গড়ে ওঠার সংবাদ পুলিশেরও অজানা রইল না। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর সামরিক-জীবনযাত্রা লাভের কামনা নানাভাবেই পরিস্ফুট হয়ে চল্ল।

দীনেশ গুপ্ত, বিনয় বসু, সুশান্ত রায়, ঢাকা জেলায় পূর্ণ বেগে স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী গড়ে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে, থানায় থানায়, শহরের পাড়ায় প্রাতে-সন্ধ্যায়-দুপুরে মার্চ-প্যারেডের হিড়িক।

তখনো আঁধার কাটেনি। দীনেশ বিনয়দের মেসে ঢুকলো। কলতলায় ঠাকুরচাকরের দল সবায় ভিড় জমিয়েছে। বাবুদের ঘুম তখনো ভাঙ্গেনি। বিনয়ের সিটের কাছে গিয়ে দীনেশ আলগোছে তাকে জাগিয়ে বল্ল: আজ গ্রামের দিকে এক্স্কার্শনে যাচ্ছে তিন নম্বর ইউনিট্। কাল রাতে হঠাৎ ঠিক কোরেছি। আপনাকে পূর্ব্বে খবর দেবার সুবিধে পাই নি। আপনাকে যেতে হচ্ছে—

—সুশান্তদাও যাচ্ছেন।

—কখন?

—এক্ষুণি।

—তুমি যাচ্ছ-না?

—হাঁ, আমি-ও যাচ্ছি।

—চল।—বোলেই বিনয় জামাটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—হাতমুখ ধুয়ে নেবেন-না, বিনয়দা ?

—দেরি হয়ে যাবে। ইউনিফর্ম পরতে আপিসেতো যাচ্ছই—সেখানে সেরে নেব'খন।

পল্টনের মাঠ। অফিসারের ইউনিফর্ম পরে বিনয়-দীনেশ-সুশান্ত যখন সামরিক উর্দি-পরা এক দল তরুণের কাছে এসে দাঁড়াল, তখন পূব-আকাশে একটু লালিমা ফুটে উঠেছে। পাঁচসাত মিনিটের মধ্যেই নানা দিক থেকে আরো ছেলের দল এসে উপস্থিত। প্রত্যেকের নয়নে প্রত্যয় লিখা, অবয়বে দৃপ্ত সৌকর্য্য।

বিনয় ও সুশান্ত দীনেশের সিনিয়র অফিসার। ঘড়ি দেখে, তাদের অনুমতি নিয়ে দীনেশ গম্ভীর নির্ঘোষে হুকুম দিল: Friends, fall in !

বুটের খটাখট্ শব্দে দিগন্ত একবার কেঁপে উঠল। কিশোর-সৈনিকের দল পংক্তি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল।

সংখ্যা গুন্‌তি নিয়ে জানা গেল, একজন অনুপস্থিত। ইউনিট্ কমাণ্ডারকে প্রশ্ন কোরে বোঝা গেল-যে সুশীল আসেনি।

দীনেশ কিছু না বোলে কমাণ্ড দিতে যাচ্ছে এমন সময় দেখা গেল, একটি কিশোর দৌড়েদৌড়ে আসছে। মুহূর্ত্তে কাছে এসেই সে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে পড়ল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। লজ্জায় তাকাতে পারছে না সে।

দীনেশ কোন দিকে চাইলো-না। তার বাহিনী তখন কমাণ্ড্ পেয়েছে: লেফ্‌ট, রাইট্, লেফট্—মার্চ্ !

সঙ্গেসঙ্গে সুশান্ত এবং বিনয়-ও পা মিলিয়ে রওনা হল। তিনটি অফিসারের সমভিব্যাহারে 'বঙ্গল্ ভলান্টিয়ার্স্'-এর এই ইউনিট্ মাঠ পেরিয়ে, রেলওয়ে ক্রসিং অতিক্রম কোরে, লোকালয়ে ঢুকে, রাজপথের বুকে খটাখট্ ধ্বনি তুলে দৃপ্ত-লাস্যে যখন চলে যাচ্ছিল—তখন পূর্ব্বগগনে অরুণলিখা সুচিহ্নিত হয়ে গেছে। শহরবাসী নরনারী লুব্ধের মত এই তরুণ-বাহিনীর মধ্যে যেন জাতির আলোকদয় আবিষ্কার কোরল। তাদের চোখেমুখেও ভরসার ছাপ। ··

পল্টনের মাঠ শূন্য পড়ে আছে। অপরাধী তরুণ বালক তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থাণুর মত!···ঘড়িতে এলার্ম্ দিয়ে রাখা সত্ত্বেও ঠিক সময়ে তার ঘুম ভাঙে-নি। বাড়ি থেকে না-খেয়ে দৌড়ে এসেছে সে—তবু পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড লেট্!···তার সুমুখ দিয়ে বাহিনী চলে গেল—তার স্থান হলো-না সেখানে!···দীনেশদা চিনলেন-না, সুশান্তদা-ও না। কিন্তু বিনয়দা? অমন হাসিউচ্ছল মধুর মানুষটি—তিনি-ও চিনলেন না! কিশোরের দুটি চোখ বেয়ে ঝরঝর কোরে জল বেরিয়ে এল। তার সারা অঙ্গে বুক-ফাটা কান্না কাঁপছে থর্থর কোরে!···

বিক্রমপুর অঞ্চলের একটি গ্রাম। বিনয়-দীনেশের ইউনিট সেখানে এসে উপস্থিত। গ্রামের মধ্যেই একটি বাগান-ঘেরা পুকুর। পুকুরের তীরে এসে ইউনিট্ হুকুম পেল: হল্ট্! ··

ষ্ট্যাণ্ড-এট্-ইজ্!···ডিস্পার্স্!···

হুড়হুড় কোরে তরুণ সেনানীর দল ছড়িয়ে পড়ল। বুট-পট্টি-বেল্ট খোলার ধুম পড়ে গেল। হৈহল্লা-চিৎকার-হাসিঠাট্টায় গ্রামখানা

মুখরিত হয়ে উঠল। কেউ গাছে উঠে এ-ডালে ও-ডালে ঝুলছে, কেউ ফল পাড়বার চেষ্টায় কেউ কেউ গ্রামের ছোট ছেলেদের হাত থেকে গুলাত নিয়ে কাক-চিল নিশানা করছে, আবার কেউ কেউ পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জুড়ে দিয়েছে দুর্দ্দান্ত দাপাদাপি।

বিনয় ও সুশান্ত গ্রামের বন্ধুদের নিয়ে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। দীনেশ ততক্ষণে গ্রামীয় বেঙল্ ভলান্টিয়ার্স্ ইউনিটের কয়েকটি স্বেচ্ছা-সৈনিককে দাঁড় করিয়ে প্যারেডের পাঠ দিচ্ছে।

দুপুর ঢলে পড়ল ছেলেদের খাওয়া দাওয়া শেষ কোরতে।... তারপর পনর মিনিট বিশ্রাম।..সবাই পরস্পরের কাঁধে মিলিটারি কায়দায় মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। কারো চোখে ঘুম নেই। দু'একজন নাক ডাকাতেই তাদের বিশেষ দুর্দ্দশা হলো। বিশ্বরূপ স্থূলদেহী! তার আহারের মাত্রা অধিক, ঘুমের পরিমাণ-ও কম নয়! বেচারার নাসিকা-গর্জ্জন প্রসিদ্ধ। কিন্তু সুখ কোথায়? নাক গর্জ্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে সহসা লম্ফ দিয়ে উঠে ফ্যাঁচ্-ফ্যাঁচ্, হেঁইচ্চো-হেঁইচ্চো ধ্বনিতে বনপ্রান্তর কাঁপিয়ে তুল্ল। ছেলের দল হেসে অস্থির। নস্যের কৌটো যার পকেটে ছিল তার ঘুমের ভাণ দেখে আর এক দফা হাসির রোল পড়ে গেল।

পাঁচটার সময় 'ফল্-ইন্' অর্ডার।...শান্ত, সুসংযত বাহিনী আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।...গ্রামবাসী আনন্দে ও উৎসাহে এদেরকে বিদায় দিল। মৌন-পল্লীর সকল স্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে দীনেশের বাহিনী চল্ছে : লেফ্ট, রাইট্, লেফ্ট।...

পথে দু'তিনটা গ্রাম ঘুরে এরা এসে মাঠে যখন পড়েছে তখন সন্ধ্যা পুঞ্জীভূত-আঁধারে ডুব দিয়েছে। শীতের কাল। কুয়াশাচ্ছন্ন

আকাশ। অন্তত ছ-সাত মাইল অতিক্রম কোরলে এরা ষ্টেশনে পৌছবে।

কমাণ্ডাণ্টের হুকুম। অন্ধকারের নিষেধ ছিন্ন কোরে মাঠে বন্ধুর পথ দিয়ে ঐ রাত্তিরে চলতেই হবে পথ। পরিশ্রান্ত সবাই রাস্তা ভুল হয়ে গেছে। হারা-উদ্দেশে চলছে দীনেশের বাহিনী বহুক্ষণ পর দূরে একটু আলো দেখা গেল। সেই আলো লক্ষ কোরে চল্ল সবাই। মাঠ থেকে একটা রাস্তায় তারা উঠে এল সম্মুখে বাজার। ভরসায় খুশী হলো সবার চিত্ত। ঘড়ি দেখল বিনয়—রাত তখন ন'টা। একে শীতের কাল, তাতে আবার গ্রামদেশ। রাত ন'টায় কেউ জেগে থাকে না। কিন্তু বাজার বোলে-ই দু'চারটে দোকান খোলা ছিল তখনো। একটা মেঠাইয়ের দোকানে সামান্য বিকিকিনি চলছে। সুশান্ত বল্ল: দীনেশ ভাই কিছু রসগোল্লা কেন। খিদের জ্বালায় ছটফট কোরছি সবাই

দীনেশ মেঠাইওয়ালার কাছে গিয়ে রসগোল্লার দাম জিজ্ঞে কোরতেই লোকটা কেমন যেন নিশিতে-পাওয়া ব্যক্তির মত তা দিকে তাকাতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে দোকন বন্ধ কো দিল। দীনেশ চেয়ে দেখে—দোকানপাট খটাখট্ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভেজান-দরজাগুলো ফাঁক কোরেকোরে দেখছে দোকানীরা এ লোকগুলোকে। ফিরে এসে সুশান্তকে সব কথা বোলতেই দীনেশকে সে বল্ল: বুঝেছি, ওরা ভয় পেয়েছে। দিনকাল খারাপ ভেবেছে, আমরা বুঝি ডাকাত।

বিনয় বল্ল: বুঝিয়ে বল-না যে আমরা ডাকাত নই, আমরা শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক?

দীনেশ ঃ পয়সা রয়েছে ট্যাঁকে, রসগোল্লা রয়েছে কড়াইভর্ত্তি –তবু ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি যে-দেশে, সেখানে আবার বুঝিয়ে-সুজিয়ে ুজ হবে? চলুন, ব্যাটাদের ঘাড়ে তুই গাঁট্টা কষিয়ে কড়াইসুদ্ধ মঠাই এনে পেটের জ্বালা মিটিয়ে দি।

সুশান্ত নির্নিমেষে দূরের পানে তাকিয়ে থেকেই বল্ল: না ভাই, ক্ষণ ভাল নয়। ঐ দূরে লোক দেখছ না? খাকি-পোষাক পরনে যন? রাইফেল্-ও দেখছি? এরা থানায় খবর দিয়েছে মনে হয়।

বিনয় একটু একটু হাসছিল। সুশান্তর কথায় সায় দিয়ে বল্ল: লিশ-ই এসেছে। পজিশান নিয়ে বোসেছে—কাউয়ার্ডগুলো গুলি ড়বার মতলব করছে।

দীনেশ ঃ দেখছেন, ব্যাটাদের হাত কাঁপছে। গুলির নিশানা তেই পারে না।

বিশ্বরূপ এগিয়ে এসে বল্ল: কী কোরে বুঝলেন, দীনেশদা, দের হাত কাঁপছে?

বিনয় হেসে উত্তর দেয়: ব্যাটাদের সাহস দেখে তাই মনে হয়। খছো-না, কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে? রেঞ্জের বাইরে বোসে তাই ইফেল্ উচিয়েছে?

সুশান্ত ঃ চল বিনয়-দীনেশ, এগিয়ে গিয়ে ওদের অভয় দি— হলে কেলেঙ্কারি হবে।

ওরা তিন জনে এগিয়ে গেল। হাত ঊর্দ্ধে তুলে হাঁক দিল: riends comming to you!

পুলিশের রাইফেল্ তখনো নিশানাবদ্ধ। সুশান্তরা নিকটবর্ত্তী তই সাব ইন্সপেক্টর রিভলভার নিশানা কোরে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সুশান্ত বল্ল: কি মশায়, বীরত্ব কি আমাদের উপর?

—আরে মশায়, আপনারা কারা? কোত্থেকে এসেছেন? কি ব্যাপার? গ্রামের লোকগুলো তো ডাকাত পড়েছে ভেবে হিম হয়ে গেছে।

—তাই বুঝি তাদের গরম কোরবার জন্যে রাইফেল্ হস্তে বাজারে প্রবেশ?

উভয় পক্ষের হাসির রোলে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের বিক্ষুব্ধ-আবহ উৎকণ্ঠামুক্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে দারোগার সংগে সুশান্তদে রসাল-গল্প জমে উঠল। দারোগা খুশী হলেন অপর্য্যাপ্ত। বাজারে লোকদের সংগে থানার লোকেরা মিলিত হয়ে অতিথি-সৎকারে লেগে গেল।

কড়াই-ভরা রসগোল্লা শুধু নয়—দোকানের প্রায় সমস্ত মি ও দৈ নিঃশেষ কোরে ছেলের দল যখন শুয়ে পড়েছে, তখন সুশান্ত বল্ল: দীনেশভাই, তুমি যদি 'গাঁট্টা' মেরে বোসতে তা হলে গিয়েছিলাম আর কি।

দীনেশ হেসে বল্ল: মেঠাইওয়ালাটা আমায় কিন্তু পথে খাবার জন্যে এক টিন রসগোল্লা দেবে বলেছে—অবশ্য কাল আটটার পরে বেরুলে।

—সর্ত্তাধীনে কেন?

—বাঃ, তার আগে যে ওর মাল-ই তৈয়ের হবে না।

বিশ্বরূপ বল্ল: রাধেশ কি বোলছে জানেন, দীনেশদা?

—কি বোলছে রাধেশ?

—বোলছে, ঐ মেঠাইওয়ালার বুড়ি মা নাকি তার ছেলের খুব তারিফ কোরেছে তার পাকা-বুদ্ধির জন্যে।

—কি রকম?

—বুড়ির ছেলে নাকি আপনার পাতে পচা-রসগোল্লার হাড়িটা
;পুর কোরে দিয়েছিল। এতগুলো পচা বস্তু একজনের পাতে
ালান তো সোজা নয়?

সুশান্ত হেসে বল্ল: কথাটা সত্যি হতে পারে। দীনেশের কি
ার ভালমন্দ বিচারের ধৈর্য্য ছিল? 'মিষ্টদ্রব্য' হলেই হলো।
ক বল, ভায়া?

দীনেশ হোহো কোরে হেসে বল্ল: একটু টের পেয়েছিলাম
কন্তু। তবে, আমার পেটে বৈশ্বানর। ওখানে যা পড়বে তা'
স্ম হয়ে যেতে বাধ্য।

সুশান্ত বিরক্তি ও বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে: তুমি টের পেয়ে-ও
গুলো খেলে?

দীনেশ নির্ব্বিকার চিত্তে: আমি বৈশ্বানর, আমি খাই ইঁটপাথর !!

দীনেশের এই আবৃত্তি শুনে সবাই না হেসে থাকতে পারে না।
বনয় সহাস্যে বলে: তুমি ঠিকই বৈশ্বানর। আর জ্বালিয়োনা।
মোয়। রাত শেষ না-হতেই আবারতো দেবে মার্চ্-এর অর্ডার।···

রাধেশ: এবং তৎকালে এত রসগোল্লার রস যাবে
কাথায় উড়ে! দীনেশদা'র কণ্ঠ থেকে বেরুতে থাকবে কেবলই
টাখট্-খট্ !!···

ছেলের দল হোহো কোরে হেসে উঠল। দীনেশের অট্টহাসি
বার কণ্ঠ ছাপিয়ে গেল।···

ঢাকা শহরে 'রায় কোম্পানি' হলো বিলাতী মদের প্রসিদ্ধ
দাকান। সাহেবসুবাদের এখানে বিশেষ আনাগোনা। মহাত্মার

আন্দোলন শুরু হতেই গাঁজা ও মদের দোকানগুলোর সম্মুখে চলেছে জোর পিকেটিং। রায় কোম্পানি-ও বাদ গেল না। সাহেবের দল প্রমাদ গণল। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শ্বেত-অতিথিদের কণ্ঠ থাকবে শুকনো—এ-বস্তু বরদাস্ত করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং পুলিশে খবর পৌছতেই সিটি সুপারিন্টেণ্ডেট দলবল নিয়ে এসে পিকেটারদের উপর চালিয়েছেন জুলুম। গোলমাল পেকে উঠল। স্বয়ং এস্-পি অকুস্থানে উপস্থিত ··কুখ্যাত হড্সন্ সাহেব সে সময় ঢাকা জিলার এস্. পি। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে রাজনৈতিক-আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক দানবের পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টায় তাঁর প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছে। ঢাকাবাসী এই দস্যুর অত্যাচারে বিপর্য্যস্ত। সহরবাসী একে যমের মত ভয় কোরতে শিখেছে। এ-হেন হড্সন দৈত্যের মত বিরাট দেহ নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবককে পাকড়াও কোরে শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় কোত্থেকে ইউনিফর্ম পরিহিত দীনেশগুপ্ত এসে হাজির। কোন এক পাড়ায় ছেলেদের প্যারেড্ সমাপ্ত কোরে ফিরছিল সে তার উয়ারির বাসায়। পথে পড়েছে রায় কোম্পানি। ভিড়ের মধ্যে হড্সনের ঐ রুদ্র রূপ দেখেই সাইকেল্ থেকে তড়াক্ কোরে নেমে সাহেবের মুখোমুখী হয়ে তর্জ্জনী হেলনে বোল্ল সে : Stop! That's none of your business to beat him.

ঢাকা জিলার সর্ব্বাধীশ্বর, কালা আদমীর পরম বিধাতা, মহাপ্রতাপান্বিত হড্সন সাহেব সামান্য এক বাঙালী যুবকের অসম্ভব এই ঔদ্ধত্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমটা সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে চিৎকার কোরে বোলে উঠলেন : What!

দ্বিগুণতর চিৎকারে দীনেশ উত্তর দিল : Stop, I Say. You have no right to beat him.

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সাহেব কোমর থেকে রিভলভার টেনে এনে দীনেশের দিকে লক্ষ্য কোরে বল্লেন : Get away—or, I shoot you down !

সাহেবের রিভল্‌ভারের কাছে মুহূর্ত্তে এগিয়ে গিয়ে প্রশস্ত-বক্ষ খুলে দৃপ্ত-কণ্ঠে দীনেশ বল্ল : Shoot here--if you are n't a coward !

অবাক বিস্ময়ে হড্‌সন্ তাকিয়ে রইলেন ! ঢাকা শহরের বুকে বোসে এমন একটা অভিজ্ঞতা তাঁর আজ লাভ হবে—এ দুঃস্বপ্নেরও অতীত। মন্ত্রাহতের ন্যায় ধীরে ধীরে রিভলভারটি পকেটে পুরে দীনেশের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ কোরে সাহেব উধাও হলেন। দীনেশও সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে উঠে একান্ত সহজতায় বাসার দিকে রওনা হল।...

পুলিশের দম্ভ, ব্রিটিশ-রাজের অব্যাহত ক্ষমতা, শাসনযন্ত্রের পরুষ নিষ্ঠুরতা আচম্বিতে ধূলায় চূর্ণ হয়ে গেল। স্তম্ভিত জনতা ভাবে—তাদেরই জাতির এই তরুণ কুমার কোথা থেকে পেল এতো শক্তি, এতো তেজ, এতো শৌর্য্য যে হড্‌সন্ সাহেবের উদ্যত রিভল্‌ভারের গুলিকে আজ বিনা অস্ত্রে দিলো সে অমন ভোঁতা কোরে !...

তিন

ফরাসগঞ্জ ঢাকা শহরের প্রাচীন পল্লী। বুড়িগঙ্গার উপর ঐ পল্লীতে সুশান্তদের বাসা। ছোট্ট একখানি পুরাতন দ্বিতল গৃহ।

সুশান্তর বাবা অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি। তাঁকে শ্রদ্ধা করে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই। নির্লোভ নির্ব্বিরোধ এই বৃদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরকাল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এসেছেন, অথচ সাংসারিক-জীবনে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল-না কারো সংগে। সাহিত্যে ও কলাশিল্পে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, দক্ষতা ছিল।···সুশান্তর মা-ও এক অনন্যসাধারণ মহিলা। বুদ্ধিদীপ্ত-নয়নে তাঁর মায়ের স্নেহ বিজড়িত তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে এমন বুদ্ধি অনেকেরই নেই। প্রখর ধীসম্পন্না এই নারী পরিজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিয়ত ব্যস্ত কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে তিনিও জানেন-না। সুশান্তর বন্ধু-বান্ধব এই বাড়িতে নিত্য আনাগোনা করে। তার মা প্রত্যেকেরই মাতৃস্থানটি সহজ-অধিকারে গ্রহণ করেছেন। সুশান্তদের কার্য্যকলাপ তিনি অনায়াসে বুঝতে পারেন। নানা ভাবে সাহায্য কোরে কোরে তাঁর সন্তানের বন্ধু এই ছেলে-মেয়েগুলোকে তিনি পরম আত্মীয় কোরে তুলেছেন।

সুশান্তদের গৃহছাদে পশুপতি উপবিষ্ট। বুড়িগঙ্গায় তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্য রঙ ঢেলে দিয়েছে। ভাল লাগছিল পশুপতির সোনার রঙে রঙিন-হয়ে-থাকা ঐ নিস্তরঙ্গ নদীটির রূপ—যেন প্রশান্তির স্পর্শে সানন্দিত ঐ জলধারা। সুশান্ত-ও চুপ কোরে পাশে বোসে পশুপতিকে নিরীক্ষণ কোরছিল। এমন সময় নীচে থেকে মা ডেকে বল্লেন : হ্যাঁরে শান্ত, দ্যাখ্‌তো সদর দরজায় কে কড়া নাড়ছে।

প্রশান্ত নীচে নেমে গেল খানিক পরে ছাদে উঠে এল—সংগে লীলাচৌধুরি ও উত্তর।

শীলাকে দেখেই পশুপতি নমস্কার কোরলেন হাত দু'খানা তুলে। বল্লেন: আসুন, আসুন—আপনার কথা সব শুনেছি।

প্রতি-নমস্কার কোরতে কোরতে শীলাচৌধুরি বল্লেন: আপনাকে দেখবার অদম্য সাধ ছিল। এতো শুনেছি আপনার কথা!

পশুপতি সহাস্যে বল্লেন: চিড়িয়াখানার জীব দেখবার উৎসাহ বুঝি?

প্রতিহাস্যে শীলা বল্লেন: হাঁ, সেকল-ছেঁড়া দুর্দ্দান্ত সিংহ দেখার আকুলতা নিশ্চয়ই।

—সর্ব্বনাশ! এযে দারুণ সার্টিফিকেট্—একেবারে 'বজ্রসম ভারি'!...

সবাই হো হো কোরে হেসে উঠল।

পশুপতি একটু চুপ কোরে থেকে বলে চল্লেন: দেখুন শীলাদেবী, সুশান্ত ও উত্তর-ভাইয়ের কাছে আপনার পরিচয় আমি নিখুঁত কোরে পেতে চেষ্টা করেছি। আপনার কর্ম্মশক্তি, প্রতিপত্তি, এবং কর্ম্ম করার ইচ্ছা বাঙলাদেশের নারী সমাজকে আশার বাণী শুনিয়েছে। আমাদের সংগে এক হয়ে কাজ কোরবার যে-অভিরুচি আপনার হয়েছে তা আমাদের পক্ষে লোভনীয়, আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। কারণ, সমাজসংস্কারের লাইন্ রিফর্মিষ্ট্-এর, বিপ্লবীর নয়। বিপ্লবী কখনো জাতির গলদ ও দুর্ব্বলতা সংস্কার কোরতে যায় না, সে তাদের মূল ধোরে টান দেয়। জাতির ইমারৎ-এর ফাঁটল সংস্কার করা তার কর্ত্তব্য নয়, সে-ইমারৎ উপড়ে ফেলে নতুনতর ইমারৎ গড়া তার ধর্ম্ম। বিপ্লব-পন্থায় ধ্বংস-সংঘটনার অণুতে অণুতে সৃষ্টির রসশালা। আপনাকে তাই আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুশী হয়ে উঠেছি।

শীলা : আমি তখন স্কুলের ছাত্রী। কাগজে পড়েছিলাম সিন্ধুবালার উপর পুলিশের সেই অত্যাচার কাহিনী। আমার মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা বিজাতীয় ক্রোধ তখন থেকেই জমে উঠেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বড় হতে হতে আমি বুঝলাম যে, সিন্ধুবালার দুর্দ্দশার মূলে এই সমাজ। জঘন্য স্বার্থপরতা, অর্থহীন কুসংস্কার, মনুষ্যত্বশূন্য রুচি এই সমাজের নারীপুরুষকে পশুর স্তরে নিয়ে গেছে। বিশেষ কোরে নারীজাতির যতো দুর্দ্দশা তার জন্যে পুরুষের চেয়ে নারীসমাজ-ই অধিক দায়ী। এদের মৃত্যুমুখী-যাত্রার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কামনা আমার উদগ্র হয়ে উঠল—আমি তাই নিজের চেষ্টায় রিফর্মিষ্টের কাজে লিপ্ত হ'লাম। কিন্তু আমি জাত-রিফর্মার নই। কাজেই শেষটায় বুঝলাম—আমার একক চেষ্টার কোন মূল্যই নেই, আপনাদের মত বহুর চেষ্টার সংগে সে-চেষ্টা সম্মিলিত ও সংযুক্ত না হলে।

পশুপাতি : সার্থকের পথে আমরা পা বাড়িয়েছি। আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমি, আপনি বা আমাদের বন্ধুরা সে-জয়ের ধ্বনি না-ও শুনতে পারি—কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীদের কানে জয়বার্ত্তা গুঞ্জরিত হবে নিশ্চয়ই।

একটু চুপ কোরে থেকে পশুপতি আবার বল্লেন : আমাদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য রয়েছে কি ?

—তেমন কিছু না।···তবু সামান্য দু'একটা কথা আলোচনা কোরবো।···

পশুপতি : বেশতো।···(সুশান্তর প্রতি তাকিয়ে) তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা কর অন্য বন্ধুদের জন্যে।

শীলা : উত্তরবাবুর সংগে আমার নানা বিষয়ে গভীর ভাবে দিনের

পর দিন আলোচনা হয়েছে। আমি সে-আলাপ আলোচনায় উপকৃত হয়েছি, তুষ্ট হয়েছি। তবু আপনাকে কাছে পাবার সৌভাগ্য হয়েছে বোলে দু'একটি কথা জিজ্ঞেস কোরবো।···আচ্ছা, মহাত্মার অহিংসাবাদ আমাদের কাজের পরিপন্থী হয়ে উঠছে না কি?

—অহিংসাবাদ যদি দেশের স্বাধীনতা আনতে পারতো তবে মাথা নুইয়ে আমি সে-বাদ গ্রহণ কোরতাম। গান্ধিজি মহাপুরুষ, তাঁর বাণী কেবল মাত্র ভারতের জন্য নয়—সমগ্র পৃথিবীর জন্যেই। সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ না কোরলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষে এই বাণী গ্রহণ করা অসম্ভব।

—কেন, ভারতবর্ষ থেকে-ই তো এর প্রচার হবে, যেমন প্রচারিত হয়েছিল বুদ্ধের বাণী?

—বুদ্ধের বাণী প্রচার কোরেছিল স্বাধীন ভারত, দাস্যতাক্লিষ্ট পরাধীন ভারত নয়।···তামসিকতার শেষ ধাপে নেবে গিয়ে কি সহসা সাত্ত্বিক হওয়া সম্ভব? Tha's an utopia! তাই মহাত্মার চতুষ্পার্শ্বে তামসিক অহিংসের দল কিল্‌বিল্‌ কোরছে। এক ডজন সত্ত্বগুণী অহিংস চেলা-ও যদি মহাত্মা গড়তে পারতেন তবে আমি তাঁর কথা শুনতে চেষ্টা পেতাম।···আমাদের ভয় নেই, শীলাদেবী। মহাত্মার বিশাল ব্যক্তিত্বের আহ্বানে দেশবাসী যে-সাড়া দিয়েছে তা আমাদের কাজে লাগবে; কিন্তু তাঁর মেকী অহিংস-অনুবর্ত্তীদের যে বিরুদ্ধতা তা' যতীনমুখাজ্জি-কানাইলাল-ক্ষুদিরাম-সম্পূর্ণাদেবীর আরব্ধ-কর্ম্মের মৃত্যুহীন প্রবাহে মিথ্যে হয়ে যাবে।···সশস্ত্র-বিপ্লব তামসিকতাক্লিষ্ট আবহে অনুষ্ঠিত হয়-না—সত্যমুখী আপনাদের রজগুণের প্রভাবেই কেবল বিরচিত হতে পারবে সেই পরিপার্শ্ব। সে-পরিপার্শ্ব গঠনের চেষ্টায়-ই আত্মনিয়োগ করুন। মহাত্মার শিষ্যরা

যদি প্রকৃত অহিংস কর্ম্মী হয়ে দেশের স্বাধীনতা আনতে পারেন তবে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? আমরা তো চাই জনগণের যথার্থ মুক্তি—পথের বিচার সেখানে বড় নয় তো? কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার কোরতে পারা যায় না বোলেই আমরা বিশ্বাস করি সশস্ত্র-বিপ্লবই ভারতবর্ষের যতো পাপ ও গ্লানি ধুয়েমুছে দিতে পারে, এবং সেই পাপমুক্ত ও গ্লানিমুক্ত কর্ম্মীদের দ্বারাই গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

শীলা প্রসন্ন মুখে প্রশ্ন কোরলেন: গভর্ণমেণ্টের প্রচার-বাণীতে আমরা 'টেররিষ্ট' নামে অভিহিত। তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু দেশের লোক-ও যে আমাদের সে-আখ্যা দেয় তার কি প্রতিকার?

—প্রতিকার আমাদের কর্ম্মের মধ্যে রয়েছে নিহিত।···দেশের লোক 'তোতা পাখী'র মত প্রভুর কথা আওড়াবেই—ওরা তো আর মানুষ হয়ে বেঁচে নেই! আমাদের আদর্শ, আমাদের কর্ম্মশক্তি ওদের কাছে যতই প্রচারিত হবে ততোই ওরা বুঝবে আমাদের কথা। ইংরেজ আজ দুর্ণাম দিয়ে লোকচোক্ষে আমাদের হেয় কোরতে চায়। ইংরেজের সে-চেষ্টা ব্যর্থ কোরতে হলে আমাদের প্রয়োজন প্যাম্ফ্লেটিয়ারিং করা, ছোট ছোট পুস্তক বের কোরে দেশবাসীকে জানান-যে আমরা কি কোরতে চাই, কি কোরেছি, কি কোরছি।···ইংরেজের টেররিজম্-এর প্রত্যুত্তর পাল্টা ভাওলেন্ট্-য়্যাক্‌শানে আমাদের দিতে হয়। তা দেব-ও আমরা। কারণ তাতে ইংরেজ ভয় পায়, দেশবাসীর দুর্ব্বল-প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু যে গণবিপ্লবের উদ্দেশে সমগ্র দেশকে তৈয়ের কোরবার মত আবহ-সৃষ্টির ভার আমরা নিয়েছি, সে-গণবিপ্লব সংঘটনার পূর্ব্ব-সূচনা যে এই 'কাউণ্টার ভাওলেন্স' তা-ও আমাদের বোঝা দরকার। কিন্তু

জনসাধারণের সঙ্গে যোগ না-রেখে আমরা যদি দূর থেকে কাজ করে চলি তা হলে 'দেবতার প্রণাম' পাবো, অসুরের বিরুদ্ধে 'দেবতার যুদ্ধ' রচনা সম্ভব হবে না। কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার কোরবার জন্যে তাই আমরা কাজ কোরে যাচ্ছি। আমাদের অস্তিত্ব সেখানে স্বীকৃত না হলে ইংরেজের প্রচারগুণে আমরা চিরকাল দেশের লোকের কাছে অপরিচিতই থেকে যাবো।…

শীলা খুশী হলেন। একটু পর পশুপতির দিকে তাকিয়ে বল্লেন: আমার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল। এবার একটা ব্যক্তিগত কথা বলি।

পশুপতি চোখ তুলে তাকাতেই শীলা বল্লেন: আমাকে ছোট বোনের পর্য্যায়ে গ্রহণ করুন। 'আপনি' সম্বোধনটা বড্ড লজ্জা দেয়।

—বোনের আসনে নাম শুনেই গ্রহণ করেছিলাম। বয়সে যখন ছোট, তখন আর বড় বোন ভাববো কেন? তবে 'তুমি'-বলাটার উপর এক্ষুনি অত জোর দেবেন না, রপ্ত হতে একটু সময় লাগবে তো?—বোলেই পশুপতি হেসে ফেল্লেন।

—হ্যাঁ, দূরত্ব না-যেতে ও বোলবেন-ই-বা কি কোরে?—শীলার কণ্ঠে অনুযোগের সুর।

—আরে তা নয়। কি যে বোলছ, বোন।

—এবার, পশুপতিদা, সত্যি আমরা এক গোষ্ঠীর হয়ে গেলাম। ধমনীতে একই রক্তস্রোত অনুভব বোরছি—শীলার। কণ্ঠভরা পরিতৃপ্তি।

গভীর হয়ে পশুপতি বল্লেন: তুমি সফল হও তোমার পথে, দিদি। সম্পূর্ণাদেবীর বাণী তোমার সকল কর্ম্মে অনাবিল প্রাচুর্য্যে গুঞ্জরিত হোক।…

সুশান্ত দ্বারদেশে উঠে এসে বল্ল : ওরা সবাই এসেছে। উপরে নিয়ে আসবো ?

পশুপতি সম্মতিসূচক ইঙ্গিত কোরলেন।···মুহূর্ত্ত পরেই দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে ছেলেরা উঠে এল।

বিনয় ও সুশান্তর পশ্চাতে গুটিদশেক তরুণ। সান্ধ্য-সভা জম্‌জম্ কোরে উঠল। পশুপতিকে সবাই প্রণাম করল। একে একে সবার পরিচয় নিয়ে পশুপতি বুঝলেন-যে এই তরুণদের প্রত্যেকেই ঢাকা জিলার নানা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল কর্ম্মী। বিনয় বিশেষ কোরে একটি ছেলেকে পরিচিত কোরতে গিয়ে বল্ল : ওর নাম রহমন্। ইউনিভার্সিটিতে থার্ড্ ইয়ারে পড়ে। খুব ভাল ছেলে। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব আছে। তা ছাড়া গ্রামে ওরা বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার—কৃষকদের মধ্যে ওর প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

পশুপতি খুশী হয়ে রহমনকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন : কি ভাই, বাঙলার আসফাক্‌উল্লা হবে নাকি ?···(স্বগত বলে চল্লেন) হাঁ, বীর বটে। কেমন সৌন্দর্য্যে ফাঁসির রজ্জু সে-পুরুষ চুম্বন কোরে গেলেন ! ··(তারপর একটু দম নিয়ে সুরু কোরলেন) ছাখো রহমন, তোমাকে পেয়ে আমার সেই পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল। দাদার (বিপুলদার) এক মুসলমান বন্ধু ছিলেন এই ঢাকা শহরেই। উর্দু অঞ্চলে তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁর আখড়ায় অজিত-আশু-নিরঞ্জন-উত্তর কুস্তি শিখতো। 'মাষ্টার সাহেব' বোলে আমরা তাঁকে ডাকতাম। বহু মুসলমান ছেলে তিনি জুটিয়েছিলেন। বিপ্লবের কাজে তখনকার দিনে তাঁর সাহায্য ছিল অমূল্য। তারপর আমাদের উপর এল পুলিশের নির্য্যাতন— আমরা নানা দিকে ছিটকে পড়লাম —দল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আন্দামান থেকে ফিরে এসে

উত্তর যখন মাষ্টারসাহেবের খোঁজ কোরল তখন জানা গেল যে দারিদ্র্য ও দুঃখের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে শেষটায় এই সাধক যক্ষারোগে মৃত্যুর শরণ নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি। তোমার মধ্যে, রহমন, তিনি আবার নব প্রাণ নিয়ে বেঁচে উঠেছেন। তুমি তাঁকে আমাদেরই মত স্মরণ কোরো।

পশুপতির বক্তব্য শেষ হয়ে এল। তিনি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিনয়কে প্রশ্ন কোরলেন: দীনেশ এলো না?

—এখনো আসে নি। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে, নইলে তার দেরি হওয়া অসম্ভব।

—ঘটবে আবার কি? সাহেব ঠেঙ্গাচ্ছে হয়তো।

সবাই হেসে উঠল।

সুশান্ত বল্ল: বাগে পেলে ছাড়বেও না।

কথাগুলো শেষ হোতে না-হোতেই দুমদাম শব্দে ঝড়ের বেগে দীনেশ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। এসেই চলমান-ইঞ্জিনের হঠাৎ-থেমেপড়ার চঞ্চল স্থৈর্য্যে পশুপতির পায়ের কাছে বোসে পড়ল। পশুপতি সস্নেহে তার পিঠে হাতখানা রেখে বল্লে: কিরে, দেরি যে? বন্ধু হড্‌সনের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল নাকি?

হেসে দীনেশ নড়েচড়ে বোসল। তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে চল্ল: বোলবেন-না দাদা, আমাদের পাড়ায় একটা মস্ত গুণ্ডার আবির্ভাব হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরা ওর দাপটে অস্থির। ব্যাটা আবার ছেলে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে দল কোরতে চায়—গুণ্ডার দল। ভারি মুস্কিলে পড়েছিলাম। পথে আসতে ওর সংগে দেখা—চলছেন তিনি শিষ্যসামন্ত পরিবৃত হয়ে। কাছে গিয়ে ব্যাটাকে টুঁটি চেপে ধোরে খুব মার দিতে হলো—নইলে ইজ্জৎ থাকে না।

—বেশ কোরেছিস। তোকে মারল-না?

অতগুলো লোকের সংগে লড়তে গিয়ে দু'চারটে গুতো খেতেই হবে। কিন্তু দলপতি যখন নাকেমুখে রক্ত নিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিল, তখন শিষ্যের দল উধাও।

—তুমি কেবল মেরেছ? বাক্যব্যয় করোনি?

—কোরেছি বই কি। বল্লাম: বাছাধন, হাকিমের আরদালি-গিরি কোরো বাপের সুপুত্র হয়ে; আমাদের সংগে লড়তে এসো না। তোমার হাকিমের চোদ্দ পুরুষকে আমি থেঁতলে দেব—যদি মার খেয়ে তাদের কাছে গিয়ে ধন্না দাও।

একটু থেমে, সারা অঙ্গ দুলিয়ে, হাসির ফোয়ারা তুলে দীনেশ আবার বল্ল: ওটা কোন্ এক হাকিমের আরদালি যেন—কাজেই জোর বেশি—গুণ্ডামির আসর ওর জমজমাট।

সুশান্ত বল্ল: লোকটা পুলিশের-ও এজেন্ট।

পশুপতি: খুব ভাল কোরেছে দীনেশ। গোটা ইংরেজ জাতই গুণ্ডামি কোরছে এই ভারতবর্ষে। তাদের ভৃত্যের দল তাই মাঝে মাঝে প্রভুদেরকে-ও ছাড়িয়ে যায়।

এমন সময় ভৃত্যসমভিব্যাহারে সুশান্তর মা প্রচুর খাবার নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম কোরলেন। উত্তর এবং শীলা-ও পশুপতিকে অনুসরণ কোরতে দেরি কোরলেন না। মা হাসিমুখে সবাইকে আশীর্ব্বাদ কোরে জলযোগের আদেশ দিয়ে ভৃত্যসহ নীচে নেবে গেলেন।

হৈ-হল্লায় খাওয়াদাওয়ার পর্ব্ব শেষ হলো।

পশুপতি এবার শুরু কোরলেন: শোন, আর তিন-চার মাসের মধ্যেই আমাদের ডাইরেক্ট্ য়্যাক্শান শুরু কোরতে হবে। দেশের

অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কোরে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি। এটা ১৯৩০ সাল। এই বৎসরের মাঝামাঝি তোমাদের ডাক পড়বে, হয়তো ততটা সময়-ও পাবে না। সুতরাং তোমরা তৈয়ের হতে থাকো। মৃত্যুভয়হীন অসংখ্য ছেলেমেয়ে আমি চাই। তারা তাদের ছোটছোট গ্রুপের বন্ধুদের ছাড়া আর কাউকে চিনবে না। গ্রুপ-লীডাররা পরস্পরের জানিত হবে অবশ্য—কিন্তু তা-ও উইদিন্ সার্টেন্ ইউনিট্। সেণ্টারে যে-কর্ম্মীসংসদ, সেটা সমস্তগুলো জিলা ও কোলকাতার বিশিষ্টতম কতিপয় কর্ম্মীদ্বারা থাকবে গঠিত। সেই কর্ম্মীগোষ্ঠীর দায়িত্ব ভাগ কোরে নিতে হবে সভ্যদেরকে। আমাদের দলের মেয়ে-বিভাগের ভার রইল শীলা চৌধুরির উপর। ছেলেদের দল গড়বে বিনয়-দীনেশ-সুশান্ত। শেল্টারের চার্জ নেবেন অরুণাদি ও উত্তর। 'ডিরেক্ট য়্যাক্শান্' যখন শুরু হবে, তখন তার পশ্চাতের সংগঠন কার্য্যে উত্তরের পার্শ্বে আমরা পাবো সর্ব্বাণী রায়কে। আর সর্ব্ববিধ কার্য্যেই আমার সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকের যোগাযোগ রক্ষা কোরবেন তোমাদের উত্তর দা।

শীলা : আপনাকে কোথায় কি ভাবে পাব, বুঝলাম না।

—তোমাদের সকল কর্ম্মে, সকল অবস্থায় আমি একান্ত সঙ্গী হয়ে-ই থাকবো। উত্তর হলেন 'ডাকবাক্স'—আমাকে ও'র মারফত-ই পেতে হবে। বিদেশী-ভাষায় ও'কে বলা চলবে 'লায়াসোঁ অফিসার'।

দীনেশ উচ্ছ্বসিত আবেগে বল্ল : আগেই জানিয়ে রাখছি, দাদা—আমাকে ফার্ষ্ট চান্স্ দিতে হবে। আমি আর সহ্য কোরতে পারছিনা পশুর জীবন নিয়ে বাঁচবার এই অপচেষ্টা।

পশুপতি সহাস্যে উত্তর দিলেন : হড্‌সনের রিভল্‌ভারটা চুপ কোরে রইল-যে! নইলে তুমিতো কবেই চান্স্‌ নিয়ে ফেলেছিলে।

দীনেশ তবু গজ্‌গজ কোরতে লাগল—তার বক্তব্য যেন শেষ হয়নি।···পশুপতি কিছু না-বোলো তার পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন।···

রাত্রি তখন ঘন হয়ে আসছে। পশুপতি বল্লেন : এবার তোমরা সবাই ভেগে পড়।···শীলা, উত্তর এবং আমি পরে বেরুবো।···

ছেলের দল বেরিয়ে গেল।···কিছুক্ষণ পর উত্তর এবং শীলা-ও উঠে দাঁড়ালেন। শীলা যাবার সময় প্রশ্ন করলেন : আপনাকে আবার কবে পাবো ?

পশুপতি : আজই গোয়ালন্দ মিক্স্‌ড্‌-এ আমি ঢাকা ছাড়বো। প্রয়োজনে কোলকাতায় তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

উত্তর ও শীলা বেরিয়ে গেলেন।

কিছু পরে পশুপতি সুশান্তর সংগে নীচে নেবে এসে সুশান্তর বাবাকে তাঁর ঘরে গিয়ে প্রণাম কোরলেন। উভয়ের অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ হলো। সুশান্তর বাবা ও মাকে বিদায়কালীন প্রণাম কোরে সুশান্তর সংগে-ই পশুপতি যখন রাস্তায় বেরিয়েছেন, রাত তখন দশটা।

অন্ধকারের গভীর স্তর অতিক্রম কোরে দুইটি প্রাণী নদীর তীরে এসে উপস্থিত। নৌকো বাঁধা ছিল ঘাটে। উত্তর নৌকোয় অপেক্ষা কোরছিল। তিনজনে বুড়ীগঙ্গার স্রোতে ভেসে চললেন নৌকোর বাঁধন খুলে দিয়ে। পশুপতি তন্ময় হয়ে গান ধরেছেন :

"আমার না-বলা বাণীর যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন বাজে।"

চার

বেহালার ট্রাম টার্মিনাস পেরিয়ে প্রায় মাইল খানেক দূরে একটী খোলার বাড়ী। গ্রামের মত স্থান। বনজঙ্গলে ঘেরা বহু জায়গা পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দু'একখানা মেটে-ঘর। খোলার বাড়ীটা সেই অঞ্চলে আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'খানা ঘর ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন বটে।

সম্মুখের ঘরখানা কিন্তু প্রশস্ত। একটী তক্তাপোষে সর্ব্বাণী শায়িতা। তার মাথায়, ডান হাতে ও ডান পায়ে বড় বড় ব্যাণ্ডেজ। মাথার ব্যাণ্ডেজ ভেদ করে তখনও রক্ত চুইয়ে পড়ছে। অরুণাদি একখানা হাতপাখা নিয়ে শিয়রে বসে বাতাস দিচ্ছেন। উত্তর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার বাঁ হাতখানা হাতে নিয়ে নাড়ীর চলাচল অনুভব কোরছেন। সবারই চোখেমুখে শঙ্কা। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। ছোট একটী টিপয়ের উপর ডাক্তারের ব্যাগ ও ইনজেক্‌শানের সরঞ্জাম। পাশের ঘর থেকে পশুপতি এসে সর্ব্বাণীর পায়ের দিকের জানলাটা খুলে দিলেন। পূবের আকাশে তখনো ভাল কোরে আলোক-রেখা ফোটেনি। কিন্তু সহসা বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢোকায় সর্ব্বাণীর মুদ্রিত চোখদু'টি খুলে গেল। অসহ্য যন্ত্রণার আঘাতে জর্জরিত দেহলতা একটু কেঁপে উঠল। অতি কষ্টে বল্ল, উঃ!...

পশুপতি ত্রস্তে কাছে এগিয়ে মুখখানার সুমুখে নিজের মুখ নিয়ে বলেন: কী বোন্? বড় কষ্ট?

ধরা-গলায় অতি ধীরে ধীরে উচ্চারিত হল: হো লো—না!

এইটুকু কথা বোলতে গিয়েই সর্ব্বাণী শ্রান্ত হয়ে পড়ল। তার বুকে হাঁপ উঠে গেল।...ডাক্তারের চোখের ইসারায় সবাই চুপ কোরে রইলেন।...

পশুপতি সর্ব্বাণীর ললাটে হাত বুলাতে লাগলেন। ঘর স্তব্ধ। পূবের আকাশ রক্তরঙিন হয়ে উঠেছে। সর্ব্বাণীর সর্ব্বাঙ্গ সহ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে এলিয়ে এল। ডাক্তার বিষণ্ণ মুখে সর্ব্বাণী হাতখানা নামিয়ে রেখে পশুপতির দিকে তাকিয়ে বল্লেন সব শেষ

পশুপতি নির্নিমেষ নয়নে সর্ব্বাণীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলে বহুক্ষণ। সূর্য্যের অরুণশিখা চিরনিদ্রাতুরার প্রশান্তিঘন আন রাগস্পর্শ দিয়েছে। · পশুপতি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তরের পা তাকিয়ে বল্লেন: সম্পূর্ণাদেবীর বংশধরার কীর্ত্তি দেখেছ? ভোরের আকাশে শুনেছ বিপ্লবিনীর বাণী? ··

উত্তরের চোখ বেয়ে ঝরঝর কোরে জল গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁ কেঁপে গেল। কথা বলা আর হলো না! ··

পশুপতি বল্লেন: অরুণাদি, ডাক্তার, উত্তর! আমাদের পুরোযায় শহীদ ঐ দিগন্তের রাঙ্গাপথে যাত্রা কোরেছেন। ঐ পথের ধুলিক জুড়ে থাকুক আমাদের একটি প্রণাম।

অরুণাদি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। তাঁর সা দেহ থর্থর কোরে কেঁপে উঠল মৌন কান্নায়।

কিছুক্ষণ পর পশুপতি বল্লেন: উত্তর! বেণু ও মাধব আস এক্ষুণি। সর্ব্বাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মাধবদের গাঁয়ের কাছে হবে। সক বন্দোবস্ত করা আছে। নৌকোয় শব তুলে দেয়া পর্য্যন্ত তুমি থাক ওদের সংগে। তারপর ওরা-ই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করবে। মাধব ভাল কোরে বোলে দিয়ো যে, যেখানে আমার দিদিকে দাহ ক হবে সেটা জঙলা জায়গা হলে-ও তার নিশানা যেন ভাল কো রাখা হয়। কারণ, এমন দিন আসবে যেদিন গোটা বাঙলা

রামকৃষ্ণ রায়

(রাজ-হত্যা মামলায় শহীদ)

াবনশক্তি শক্তি-আরাধনার কামনা নিয়ে সর্ব্বাণীদেবীর সমাধিস্থানে াবে তীর্থ করতে।

পাঁচ

উত্তর স্তব্ধের মত তখনো দাঁড়িয়ে আছে।···পশুপতি াক্তারকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় অরুণাদিকে লে গেলেন: আমরা সন্ধ্যায় আবার আসবো।···

সন্ধ্যা সমাগত। অরুণাদি আবিষ্টের মত সর্ব্বাণীর পরিত্যক্ত ক্তাপোষের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের আকাশ পানে তাকিয়ে াছেন। তাঁর সারা নয়নে উদাস দৃষ্টি।···সর্ব্বাণীকে তিনি জানতেন াধু নামে। সাক্ষাৎ পরিচয় কিছু ছিল না। হঠাৎ সেদিন উত্তর ায়ে মেদিনীপুর উপস্থিত। বল্ল তাঁকে যে তক্ষুণি তাঁর কোলকাতা াতে হবে—বিশেষ দরকার। উত্তরের সংগে তিনি কোলকাতা লেন। পশুপতির সংগে উত্তরের প্রেসে তাঁর দেখা হল। াশুপতি তাঁকে বোলতে শুরু কোরলেন: অরুণাদি, আজ আমাদের ড় দুর্দ্দিন। জ্যোতিকণাকে আপনি চেনেন, সর্ব্বাণী বিজ্ঞানের াত্রী। জ্যোতিকণা তার কাছে পড়তো কেমিষ্ট্রি। সর্ব্বাণীর উপর ার ছিল বোমার নানা ভাবে এক্সপেরিমেণ্ট করার। জ্যোতিকণা ভাবতই তার সহকারিণীর স্থান নিয়েছিল। সর্ব্বাণী বড় বড় াফেসারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে, তাঁদের মারফতে নানা লেবরেটরি থকে অনেক যন্ত্রপাতি ধার কোরে এনে নিজের ঘরখানাকে ছাট্ট লেবরেটরিতে পরিণত কোরে ফেলেছিল। সর্ব্বাণী ও জ্যাতি দিনরাত ধ্যানস্থ থাকতো ঐ বস্তু সম্পর্কে নানাবিধ এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে। আমি মাঝেমাঝে গিয়ে ওদের কাজের

খবরাখবর কোরতাম। কাল সন্ধ্যায় experiment করতে গিয়ে দারুণ explosion হয়। জ্যোতিকণা একটু দূরে থাকায় বেঁচে গেছে, কিন্তু সর্ব্বাণী সারা অঙ্গে মারাত্মক আঘাত পেয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। মহা কেলেঙ্কারি ব্যাপার। সর্ব্বাণীদের বাড়িটা শহর থেকে দূরে গঙ্গার তীরে থাকায় অতিকষ্টে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সর্ব্বাণীকে বেহালায় একটা বাড়িতে এনে রেখেছি তার সেবাশুশ্রূষার ভার আপনাকে নিতে হবে। উত্তরের সংগে আপনি সেখানে যান। আমাদের দলেরই এক বন্ধু-ডাক্তার তার কাছে রয়েছেন। আমিও আপনাদের একটু পরেই আসছি।···

আজ তিন দিন হলো অরুণা দেবী সর্ব্বাণীকে প্রাণপণে আগলিয়ে আসছিলেন। যমে-মানুষে লড়াই আর চললো না মৃত্যু এসে তাঁর দীপ্তিময়ী কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন!···অরুণাদির চোখ দুটি এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সজল হয়ে এল।···

এমন সময় পশুপতি এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সুশান্ত এবং শীলা চৌধুরিও দ্বারদেশে উপস্থিত। তক্তাপোষের সুমুখে বিছানো একখানা মাদুরের উপর সকলে উপবেশন করলে অরুণাদিও এসে পাশে বোসলেন।

স্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে পশুপতি বল্লেন: সর্ব্বাণী আজ শহিদের মৃত্যু-বরণে মৃত্যুহীন। সর্ব্বাণী আমাদের পুরোযায়ী, আমাদের প্রণম্য। আজ তাঁর অমর আত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা আমাদের আরো সুদৃঢ় হোক—আমরা তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত কোরবো; তেত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তি কামনায় মৃত্যু-সংগ্রামের রক্তবিধৌত ইতিহাস রচনার ভার আমরা গ্রহণ কোরবো।

গভীর মৌনতায় বন্ধুরা প্রত্যেকে পশুপতির কথাগুলোকে স্পর্শ কোরে রইল।

পশুপতি বলে চল্লেন: আমাদের 'Zero-hour' সমাগত। ডাইরেক্ট য়্যাক্‌শান শুরু কোরবার দিন ধার্য্য না হলেও তার সময় এসে গেছে। প্রথম য়্যাক্‌শান সর্ব্বাণীকে দিয়ে করানর সাধ ছিল—হলো না! কিন্তু যে কাজ সর্ব্বাণী করে গেলেন তা সবার অজ্ঞাতে, সবার অলক্ষ্যে সাধিত মহাসাধকের মহোত্তম কাজ। দধিচীর আত্মত্যাগের মতোই সুন্দর ও সার্থক।

অরুণাদি বল্লেন: আজ সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত দেখছিলাম। মনে হলো, ওর সারা বর্ণে এই মহাপ্রয়াণের রূপভাস্বরতা ?

পশুপতি: প্রভাতের অরুণোদয়ে লেখা ছিল ওঁর ত্যাগবরণের ছটা, যা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়।

ঘর নিস্তব্ধ। সবাই নির্ব্বাক রইলেন কিছুক্ষণ। পশুপতি সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে আবার সুরু কোরলেন: হাঁ, অস্ত্র সংগ্রহের দিকে বিশিষ্টতর নজর দিতে হবে। অরুণাদি এবং উত্তর আমাকে জানিয়েছেন যে শেল্‌টার যথেষ্ট যোগাড় হয়েছে। বিনয়, দীনেশ, শীলার রিপোর্ট যে নানা জেলায় দল আমাদের চমৎকার গড়ে উঠেছে।...এখন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন মত আয়ত্তে এলেই কাজ শুরু হবে।

শীলা: সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হলো অর্থ। অর্থ সংগ্রহের কি কোরেছেন আপনি ?

—যুদ্ধ হলো ইংরেজের সংগে। তাদের গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের অর্থ লুটে খাচ্ছে। সেই লুটের অর্থে ভাগ বসাতে হবে।

—মানে ?

—মানে হলো, নোট জাল কোরবো; গভর্ণমেণ্টের ঘরে ডাকাতি কোরবো।

—ডাকাতি?

—হাঁ, ডাকাতি। তবে তার ভাষ্য আছে। দেশবাসীর ঘরে ডাকাতি নয়। ও-পন্থা অশুভকর। দেশবাসীর সহানুভূতি তাতে নষ্ট হয়ে যায়। ডাকাতের দল তাদের কল্যাণ কোরবে—এ-বোধ দেশবাসীর কাছে আশা করা চলে না।···কিন্তু আমরা কোরবো তাদেরই ঘরে ডাকাতি, যারা দেশবাসীর ঘরে নিত্য ডাকাতি কোরে কোরে পুষ্ট হচ্ছে। পোষ্ট আপিস, ট্রেজারি এবং গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সরবরাহ-কেন্দ্র থেকেই ছিনিয়ে আনতে হবে অর্থ।

শীলা: বুঝলাম।

পশুপতি: তা ছাড়া যে কোন ইংরেজ ধনিক-প্রতিষ্ঠানের অর্থ-ও আমরা আত্মসাৎ কোরবো—ধরো রেল্-কোম্পানি, চা-বাগান, ট্রাম-কোম্পানি অথবা অন্য কিছু।

শীলা: নিশ্চয়। ভারতবর্ষকে শুষছে যে ইংরেজ, তার ধনভাণ্ডার ভারতবাসীরই ন্যায্য প্রাপ্য—অত্যন্ত ঠিক কথা।···

অতঃপর আরো কিছুক্ষণ দু'চারটে গোপন আলোচনায় কাটিয়ে সবাই উঠে পড়লেন।·· তাঁরা রাস্তায় নেবে মোড় ঘুড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই অরুণাদি সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জানলা ধরে একা দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি দিগন্ত পানে নিবদ্ধ। চোখ দুটি যেন খুঁজে বেড়ায় সর্ব্বাণীর পদচিহ্ন আকাশ-পৃথিবীর মিতালীর পথে—সেই পথরেখা যে পরাধীন দেশের প্রত্যেক নরনারীরই কাম্য। অরুণাদির অশান্ত নয়ন বেয়ে ঝরঝর কোরে জল গড়িয়ে পড়ে। শ্বেত শৈলমালা থেকে ঝরে পড়ছে যেন দুইটি ঝর্ণাধারা আকুল আবেগে।···

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

মহাত্মার লবণ-আন্দোলন প্রচণ্ড ভাবে শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের যুদ্ধ-ঘোষণান্তে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট প্রত্যুত্তর দিয়ে চলেছে নিষ্ঠুর ভাবে। সভাসমিতি বেআইনী হয়ে গেছে। পার্কে পার্কে লাঠিপেটা হচ্ছে সংখ্যাহীন নরনারী একশ' চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার অপরাধে। আইন-অমান্য ইংরেজ সহ্য কোরবে না। হোক্‌না নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকের দল—লাঠি ও বন্দুকের সাহায্যে তাদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে; মাথার খুলি উড়িয়ে, গুলির ঘায়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়ে জাতির বিদ্রোহ শায়েস্তা করার নমুনা পথেঘাটে সন্ত্রস্ত দেশবাসী অসহায়ের মত দেখে যাচ্ছে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক জেলে ঢুকছে। সেখানে তাদের উপর বেত চালানর বিরাম নেই! অহিংসমন্ত্রের ঋষি সমগ্র ভারতীয়ের বুকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দুর্দ্দান্ত কামনা জাগিয়েছেন—কিন্তু দুর্দ্দান্ততর লাঠির আঘাতে ইংরেজ সেই কামনার বেগ স্তম্ভিত কোরে দিতে বদ্ধপরিকর।…

সহসা চাটগাঁর বিপ্লবীদল ইংরেজের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কোরে ভারতবাসীকে চমৎকৃত কোরে দিলেন। তাঁদের দুঃসাহসিকতা দেশবাসীতো দূরের কথা, ব্রিটিশসিংহের-ও কল্পনা-বহির্ভূত। বাঙলার তারুণ্যসমাজ আশার আলোক চোখে দেখল। লাঠিপেটা-ভারতবাসী পরম ভরসায় তরুণ বংশধরের পানে ফিরে তাকালো।…

চট্টগ্রামের এই অদ্ভুত অভিজানের পর বাঙালার বিপ্লবীদের আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। 'জিরো-আওয়ার' (zero-hour)

অতিক্রান্ত। বিপ্লবীরা স্থির কোরলেন—আইন অমান্য-আন্দোলনের পাশেপাশে ইংরেজকে মারণাঘাত দিয়ে যাবেন তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে। যৌবনের স্বভাব-ধর্ম্ম এতেই থাকবে প্রতিষ্ঠিত। তারপর একদিন যখন কংগ্রেস-আন্দোলন যাবে ব্যর্থ হয়ে, তখন বিপ্লবীরা গণ-সাধারণের সহানুভূতি সহযোগে সশস্ত্র গণসংগ্রামে হতে পারবেন সফল।···সুভাষচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে বিপ্লবীদের কার্য্যক্রম সমর্থন কোরলেন। তাঁর 'বেঙ্গল্ ভলাণ্টিয়ার্স' ভবিষ্যতের বিপ্লবী-বাহিনী-সংরচনার রক্তলিখিত-পটভূমি তৈয়ের কোরে যাক্—এ তাঁর স্বপ্নের কামনা।···

জাতীয়তাবাদী-কাগজগুলো প্রেস-আইনের দাপটে মুখ বন্ধ করেছে। বিপ্লবীদের কথা লিখবার মতো সাহস তাদের নেই। চট্টগ্রামের সংবাদ ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে যতটুকু বের হয় তার সামান্য অংশ-ও দেশী কাগজগুলো বের কোরতে ভরসা পায় না। কিন্তু জাতির তারুণ্যশক্তির রক্ত-ক্ষরিত অবদান-সংবাদ তখন মাসিক 'বেণু' এবং সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'র ছত্রেছত্রে পরিস্ফুট। চোখ বিস্ফারিত কোরে ছেলেমেয়েরা কাগজ ছু'খানার পাতায় পাতায় দেখে চট্টগ্রামের বীরবৃন্দের কর্ম্মকথা—তারা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে বাঙলার সশস্ত্র-বিপ্লব কি ভাবে এসেছে, কি ভাবে আসবে তার আক্ষরিক-বর্ণনা। ঐ অক্ষরমালা তখনকার কিশোরকিশোরী, তরুণতরুণীদের মর্ম্মে মন্ত্রের সামর্থ্যে জাগাল মৃত্যুকে-বরণ-কোরে চিরঞ্জীবী হবার বাসনা।

কর্ণেল সিম্‌সন্ পরিচালিত কারা-বিভাগ আলীপুর জেলে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, সত্য বক্সী, নৃপেন বাঁড়ুজ্যে ও সত্য গুপ্ত

প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠান-কয়েদীদের দ্বারা বর্ব্বরের মত মার দিয়েছে।. মেদিনীপুর জেলে ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডি সাহেব স্বয়ং বেত্র হস্তে প্রবেশ কোরে বন্দী-স্বেচ্ছাসেবকদেরকে পশুর মতো নৃশংসতায় শাসন কোরেছেন। আবার হালে প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সতীন সেন প্রমুখ বিপ্লবী নেতা ও শিশু-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক আইন-অমান্য-আন্দোলনের বন্দীকে লাঠির আঘাতে দুরস্ত কোরে-কোরে বিক্রম দেখাচ্ছেন। মোটের উপর পথেঘাটে-আদালতে-জেলে রক্তের হোলি-উৎসব। এক তরফা এই রক্তদানে এক পক্ষ হিংস্রতায় উল্লসিত—কিন্তু অপর পক্ষের অহিংস-আন্দোলন ক্রমশ হয়ে আসছে ভয়কাতর ও প্রাণশূন্য। এমন সময় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের দুর্দ্ধর্ষ অভিযান এবং কিছুদিন পর-ই স্বনামধন্য পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপ জাতির চিত্তে নব-আশার বর্ণ ফলাল! টেগার্ট অক্ষত দেহে পালিয়ে বাঁচলে-ও তাঁর মর্য্যাদা অক্ষত রইল-না। বিপ্লবীদের পাল্টা কষাঘাতে বৃটিশ-সিংহের দেহ জর্জ্জরিত হবার পূর্ব্বাভাস চিহ্নিত হয়ে গেল।···

শীলা চৌধুরি এবং আরো কতিপয় বিশ্বস্ত কর্ম্মীকে পুলিশ আটক কোরে ফেলেছে। সুতরাং পশুপতির আর অপেক্ষা করার সময় নেই। জিলা-প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পশুপতি এবং উত্তর তাঁদের কার্য্যক্রম স্থির কোরে ফেল্লেন। বিনয় ঢাকা চলে গেছে। সুশান্ত আজই যাবে বিক্রমপুর হয়ে ঢাকা শহরের দিকে। বিনিময় মেদিনীপুর তার কর্ম্মক্রম নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈয়ের। কুমিল্লা-মৈমনসিংহ-বরিশাল-উত্তরবঙ্গের লোকও দু'একদিনের মধ্যে যার যার জেলায় ফিরে যাবে যথাযথ নির্দ্দেশ নিয়ে।

পশুপতিরা স্থির কোরলেন—'বেঙ্গল্ ভলান্টিয়াস্' রূপে তাঁদের বন্ধুরা সারা বাঙলায় ডাইরেক্ট্ য়্যাক্শান্ কোরবেন এবং গোপন ইস্তাহার ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেশবাসীকে সেই কাজগুলোর উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেবেন। বাঙলার বাইরে য়্যাক্শানের প্ল্যান্ তাঁরা আপাতত স্থগিত রাখলেন।

ঢাকা শহর। রমনার কালীবাড়ির সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ। রাত তখন আটটা। থরেথরে বিছানো ঘনান্ধকার। মাঠে জনপ্রাণী নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। শুধু মাঝখানে কালী-মন্দির। মন্দিরের দীর্ঘ চূড়া আকাশ দীর্ণ কোরে উর্দ্ধে উঠে গেছে—মানব-কীর্ত্তির একক সাক্ষীর গৌরবে তার দিবানিশি এই দাঁড়িয়ে-থাকা। মন্দিরে আলো জ্বলছে—দু'চারজন ভক্ত মন্দিরের পথে যাতায়াত কোরছে। দূরে একটি ক্যাল্ভার্ট-এর উপর বোসে আছে উত্তর, বিনয়, দীনেশ ও সুশান্ত। সংগোপনে তাদের পরামর্শ চলছে।

সুশান্ত বলছে: কাল অপরাহ্ণে গভর্ণর যাচ্ছেন নবাব-বাড়িতে। সংগে যাচ্ছেন লোম্যান্। গভর্ণরকে মারা-ই তো ভাল।

উত্তর: উঁহু। বিপ্লবীদের শুধু নয়, যে-ভাবে যে-পথেই দেশের কাজ যে-কেউ কোরবে তারই সরাসরি শত্রু হলো পুলিশ। পুলিশের সংগেই তার 'ডাইরেক্ট্ ক্ল্যাশ্'। লোকে দেখে আসছে যে পুলিশ তাদের পিট্ছে অথচ তাতে পুলিশের ক্ষয়ক্ষতি কোন দিক দিয়েই হচ্ছে না। গভর্ণর কোথায় কি ভাবে কেমন কোরে রাজত্ব করেন তা জনসাধারণ বোঝে-ও না, জানে-ও না। বাঙলার পুলিশ ১৯০৫ সাল থেকে

জুলুম কোরে আসছে। তাদের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তা হলেন লোম্যান্। লোম্যান্ এবং টেগার্টকে শেষ না-কোরলে দেশবাসী আমাদের ক্ষমতার উপর ভরসা কোরবে কেন? টেগার্ট ঘায়েল হয়েছেন, এবং এ-দেশ ছেড়ে সুবোধ ছেলেটির মত চলে যাচ্ছেন বোলে সংবাদ রাখি। লোম্যান্‌কে তোমরা পৃথিবীর ওপারে পাঠিয়ে দাও। কর্ম্মীদের বুকে বল আসবে—জনসাধারণ-ও বুঝবে-যে যারা লাঠিপেটা কোরে আসছে চিরকাল, তাদের লাঠিগুলোয় এবার ঘুণ ধোরেছে।

বিনয়ঃ পশুপতিদার কি মত? তিনি বোলে দেন নি কিছু?

উত্তরঃ তিনি সম্পূর্ণ ভার দিয়েছেন এই ক্ষেত্রে আমাদেরই উপর। তবে কতকগুলো নীতি ঠিক করা হয়েছে তা' তোমরা জান। এবং সে-নীতি, পশুপতিদা বলেন যে, বড়দার (বিপুলদা) কাছেই তিনি মন্ত্রের মত একদিন পেয়েছিলেন।

সুশান্তঃ আমরা আবার শুনবো সেই মূল-নীতি কী?

উত্তরঃ ধরো, দেশের লোকের ঘরে ডাকাতি কোরবে না··· কোরবে তাদের ঘরে, যারা বিদেশী-দস্যুর বেশে দেশের লোককে শুষছে; কালো-আদমি মারবে-না সহজে—তা সে যত অন্যায়-ই করুক—মারবে শাদা ইংরেজ। এই রকম কতগুলো প্রিন্সিপল্ মেনে চলতে বলেছেন পশুপতিদা এ-যাত্রা আমাদের প্রত্যেক কাজে।

সুশান্তঃ কালো-আদমি কেন মারবো-না, উত্তরদা?

উত্তরঃ দেশের লোক মারলে ইংরেজের কোন ক্ষতি হয় না—তারা তেত্রিশ কোটি দাসের মধ্য থেকে লোক নিয়ে অনায়াসে শূন্য স্থান ভরে ফেলে। আমরা মারবো ইংরেজ। অবধ্য এই জাত, এ-ধারণাকে মিথ্যে কোরে না-দিলে জাতির পৌরুষ প্রতিষ্ঠিত

হবে না। একেকটি ইংরেজের মৃত্যুতে সমগ্র ইংরেজ-জাত এক একবার আঁতকে উঠবে—সুখে ঘর-করা আর চলবে না।

দীনেশ: কোন্ শ্রেণীর ইংরেজ, উত্তরদা?

উত্তর: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষ্টিল্‌ফ্রেম্ হলো আই. সি. এস্ কোম্পানি, তৎসঙ্গে জুড়ে দাও আই. পি. এস্ এবং আই. এম্. এস্—এদেরকে কুকুরের মত গুলি কোরে মারতে হবে। তা' ছাড়া মারতে হবে বড়বড় ইংরেজ-ব্যবসায়ীদেরকে, যারা পুঁজিবাদ-পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদিক-নীতির কর্ণধার।

দীনেশ: গভর্ণরগুলি বুঝি বাদ যাবে।

উত্তর: প্রথম অবস্থায় বাদ যাবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গভর্ণরগুলোকে তাড়া কোরে নিঃশেষ কোরবো। যাদের কাঁধে সওয়ার হয়ে গভর্ণররা ঘুরে বেড়ায়, তাদের ফুটো কোরে গভর্ণরগুলোর মাথা উড়িয়ে দিতে হবে। বুঝলে, ভাই?

দীনেশ: আচ্ছা, আমাদের বিপ্লবী-ইতিহাসে সাহেবদেরকে যে দু'একবার 'এ্যাটেম্পট্' করা হয়েছে তা সফল হয় নি কেন?

উত্তর: এখানেও দাদা ও পশুপতিদার অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতির কথাই আসছে। ছ্যাখো, যারা মারতে যাবে তারা মরতে-ও যাবে। ফিরে আসবার কল্পনা নিয়ে তারা যদি এসব কাজে যায় তবে সাফল্য লাভে ঘটে বিড়ম্বনা। দুই কারণে আমরা ব্যর্থ হয়েছি ইতিপূর্ব্বে। প্রথমত তৎকালে খোঁজখবর নেবার মত নিখুঁত দল ছিল-না বিপ্লবীদের, দ্বিতীয়ত মারতে যাবার সময় কাজ হাসিল কোরে ফিরে আসবার প্ল্যান-ও কর্ম্মীদেরকে শুনিয়ে দেওয়া হতো।

দীনেশ: এবার আমরা যেন সেণ্ট্ পার্সেণ্ট কৃতকার্য্য হই।

উত্তর: নিশ্চয় হব।...আমাদের দল সকল দিক দিয়ে এখন পার্ফেক্ট। আমাদের বন্ধুরা কেবল পুলিশের কাছ থেকে সিক্রেট্ নয়, তাদের পরস্পরের কাছ থেকে-ও প্রয়োজন মত সিক্রেট। আমাদের 'স্পাইইং সিষ্টেম্' এবং অন্যান্য রিসোর্সফুল্‌নেস্ খুব উঁচুদরের। শেল্‌টারের অভাব নেই, মৃত্যুভয়হীন ছেলেমেয়ের-ও কম্‌তি নেই। কাজেই আমরা চমৎকার ভাবে তৈরি। অধিকন্তু এ-ও স্থির হয়েছে-যে রিভল্‌ভারের শেষ গুলিটি পর্য্যন্ত শত্রুর বুকে বিঁধে দিতে হবে—আত্মরক্ষার জন্য একটি গুলি-ও উদ্বৃত্ত রাখার দরকার নেই।...

দীনেশ: তা হলে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে যেতে হবে যে? ..ওসব ফাঁসিটাঁসি যাওয়া আমার পোষাবে না।...কাজ হয়ে গেলে I must finish myself outright. Who are those devils to try and hang me?

উত্তর: সংগে থাকবে বিষ—পটাশিয়াম্ সায়োনাইড্।

দীনেশ খুশী হয়ে উঠল। সুশান্তর চোখ দুটোয়-ও খুশীর ছোঁয়া। কিন্তু বিনয়ের কোন ভাবান্তর বুঝা গেল না।

সুশান্ত প্রশ্ন করল: ভাল কথা, শীলাদিকে কিছু জানান হয়েছে কি এ-বিষয়ে?

উত্তর: না। চেষ্টা হয়েছিল শীলাদি, মাধবদা, কান্তদা নিত্য সেনদেরকে ঢাকা জেলে Contact করার—কিন্তু যেসব Source-এ চেষ্টা তা' পশুপতিদা মঞ্জুর করেননি।

সুশান্ত: আজকের দিনে বাঙলার সকল বিপ্লবীকেই বাইরে পেলে কত ভাল হতো—কিন্তু তা তো দূরের কথা, বিশ্বাসী বন্ধুদের অনেকে-ও ধরা পড়ে গেলেন।

উত্তর বল্ল : ঠিক।…যাক্‌, কাল আমাদের প্রথম শোণিতস্রাবী ইতিহাস রচিত হবে।…লোম্যান্‌কেই তোমরা এ্যাটেম্পট্‌ কর।… দীনেশের এখন করণীয় কিছু নেই। সে আজ রাত্তিরেই মিক্স্‌ড্‌-এ আমার সংগে কোলকাতা চলে যাবে। বিনয় is destined to be our first hero—সুশান্ত এবং বিনয় ছাড়া কাজের পূর্ব্বে আর কেউ যেন কিছুই না জানে।…

দীনেশ মর্ম্মাহত হয়ে বোসে রইল। বিনয়ের চোখে পরিশান্ত-দীপ্তি—কোন চাঞ্চল্য নেই। উত্তর গভীর কোরে বিনয়কে আলিঙ্গন কোরল। তারপর তারা সবাই উঠে পড়ল। চিরচঞ্চল দীনেশ উত্তরের পাশেপাশে চলতে গিয়ে ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বল্ল : আ—মি—

কথাটা শেষ না-কোরতে দিয়েই উত্তর তাকে সস্নেহে বল্ল : Greater chance is awaiting you !…

দীনেশ নিশ্চুপে উত্তরের সংগে পথ চলল।…বিনয় ও সুশান্ত তখন মাঠের অন্ধকারে ভিন্ন পথে চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তিন

ঢাকা শহরে আরমানিটোলা অঞ্চলে বিনয় বোসদের মেডিক্যাল্‌ মেস্‌। মেসের নীচে আয়ুর্ব্বেদিক ফার্মেসি, পশ্চাতে পিকচার্স্‌ হাউস।…১৯৩০ সালের অগাষ্ট মাসের ২৯শে সেদিন।

বেলা কোরেই বিনয় ঘুম থেকে উঠেছে। এমন সময় সে খবর পেল যে, প্রাতে ন'টায় লোম্যান্‌ সাহেব মেডিকেল্‌ স্কুল হাসপাতালে আসছেন। একজন উঁচুদরের ইংরেজ পুলিশ-কর্ম্মচারি হাসপাতালের ইন্‌-ডোর্‌ পেশেণ্ট ছিলেন। তাঁকে দেখবার

দন্যেই 'পুলিশ-চিফ্-'এর আগমন।···বিনয় সহজ ভাবে মুখহাত য়ে স্নানটা সেরে টিফিন খেয়ে নিল। তারপর সার্ট গায়ে দিয়ে গ্যাণ্ডেল জোড়ায় পা ঢুকিয়ে একান্ত চাঞ্চল্যহীনতায় গোপনে পকেটে ঢুকিয়ে নিল নিকেল্-করা পাঁচঘরার ছোট্ট একটি রিভলভার। দিব্যি শান্ত ছেলেটির মত সে মেস থেকে বেরুবে এমন সময় রুম্-মেট বল্ল: কোথায় যাচ্ছ, ভাই?

মিষ্টি হেসে বিনয় বলে: তোমার বুঝি রঙিন বেলুন চাই?···

হাসপাতালের কাছাকাছি এসেই সে বুঝল-যে কর্ত্তারা এসে গেছেন। পুলিশের চর ঘুরছে স্থানে-অস্থানে।···বিনয় পাশের গেট দিয়ে হাসপাতালে ঢুকে গেল। মেডিকেল্ স্কুলের চতুর্থশ্রেণীর সে ছাত্র—সুতরাং তার গতায়াতে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলো না। বিনয় দেখলো, হাসপাতালের বারান্দায় হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট অর্থাৎ শহরের সিভিল্ সার্জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন লোম্যান্ ও হড্‌সন। তাঁদেরই একটু দূরে দাঁড়িয়ে গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর সত্যেন সেন।···কাছে গিয়েই চকিতে লোম্যানের বুকে ও পেটে ড্রাম্ ড্রাম্ কোরে দুটি গুলি ছুড়ল বিনয়। হড্‌সন মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই বিনয়ের রিভলভার আবার গর্জ্জে উঠল। পরপর তিনটি গুলির আঘাতে হড্‌সনকে ধরাশায়ী কোরেই বিনয় বুঝল তার অস্ত্র এবার গুলিহীন। পুনরায় গুলি ভরে নেবার অবকাশ-ও নেই। একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখল, লোম্যানের নিঃসাড়-দেহ ধুলায় গড়িয়ে আছে; দৈত্যকায় হড্‌সন মাটিতে পড়ে আহত-কুকুরের মত গোঙ্গাচ্ছে—গুলিগুলো তার তলপেটে তখনো ঘুরপাক খাচ্ছে যেন! সিভিল-সার্জন্ বাক্যহীন। ভয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে থর্থর কোরে। সেন মহাশয় ঘুঘু লোক। বিনয়ের রিভলভারে গুলি নেই বুঝে

তাঁর রক্তে খয়েরখাঁগিরির চুলকানি চড়চড় কোরে উঠল পুনরায় গুলি ভরবার সময় না-দিয়ে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সত্যেন সেন বিনয়কে জাপটে ধরলেন। বিনয় খেলোয়াড় শুধু নয়, কুস্তির প্যাঁচ-ও তার অজানা নেই। চট্ কোরে কায়দা মত সে বোসে পড়তেই সত্যেন সেনের আলিঙ্গন্ খসে গেল। তারপর ক্ষিপ্র বেগে দাঁড়িয়ে পড়েই তাঁর মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল বিনয় সেন মশায়ের খয়েরখাঁগিরির দম বেরিয়ে গেল—বেচারা ছিটকে পড়লেন বেশ দূরে মাংসবহুল দেহখানা নিয়ে। বিনয় এক দৌড়ে ছুটে এল হাসপাতাল ও মেডিকেল্ স্কুলের মধ্যেকার রাস্তার দিকে। দারোয়ান ও গোটা কয়েক কুলি প্রতিরোধ করতে চাইল। সামান্য একটু ধাক্কা ও হুম্‌কি খেয়েই তারা সরে দাঁড়াল। বিনয় ততক্ষণে ঢুকে গেছে রাস্তা পেরিয়ে স্কুলের মাঠে। সেখানে দারোয়ানগুলো দৌড়ে আসতেই বিনয় হাতখানার ভঙ্গি এমন ভাবে কোরল যে, ওরা পিস্তল বিভ্রমে 'রামা কহো' বোলে ভেগে গেল।

বিনয় দৌড়ে ডিসেক্‌শান্-রুমের পেছনকার দেয়াল টপকে বড় রাস্তায় এসে প'ড়ল। কাছেই ছিল মেডিকেল্ মেস। সেই মেসের পাইখানার ছাদে উঠে, আর একটা দেয়াল টপকে পড়ল সে এক বাসায়। সেই বাসার খোলা দরজা দিয়ে এলো সে গ্রীক্ চার্চ-এর সুমুখের গলিটায়। সে-গলি আরমানিটোলা ময়দানের সংলগ্ন। আরমানিটোলা এসেই একটু দম নিয়ে খুব শান্ত ভাবেই উঠল সে একখানা ঘোড়ার গাড়িতে। দশ মিনিটে গাড়ি পৌঁছে গেল শহরের এক প্রান্তে নির্দ্দিষ্ট এক আশ্রয়স্থলের একটু দূরে যথাস্থানে এসে বিনয়ের মনে হল সত্যেন সেনের সংগে ধস্তাধস্তির ফলে হাতের রিভলভার ও পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া সে হাসপাতালেই

ফেলে এসেছে। রিভলভারটার জন্যে বিনয়ের একটু আপশোষ হলো—কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহেবদ্বয়ের ধুলয়-গড়াগড়ি, সিভিল্‌সার্জনের থর্থর কম্প এবং সেন মহাশয়ের ঘুসিলব্ধ-নৃত্যের কথা স্মরণ কোরে ঠোঁটের কোণায় তার সাফল্যের হাসি ফুটে উঠল।···

দু-চার মিনিটের ব্যাপার। অথচ এই ব্যাপারের প্রতিফল বহুদূরস্পর্শী। পুলিশ—ব্রিটিশের পুলিশ—জনগণের ভাগ্যবিধাতা ঈশ! এই পুলিশের সর্ব্বময়-কর্ত্তা এবং জিলার পুলিশ-সর্ব্বাধীপ ধুলায় পড়েছে গড়িয়ে—অভ্রংলিহ কাঞ্চনজঙ্ঘার দুইটি শ্বেতশৃঙ্গ যেন বিচূর্ণিত!···স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুর শহরেই বিদ্যমান। পুলিশে ও ফৌজে শহরের সকল রন্ধ্র সাড়ম্বরে শাসিত। এর মধ্যে সামান্য এক বাঙালী তরুণের রক্তে কোন্ দুঃসাহসী ডঙ্কা বাজাল যার ফলে সে অকল্পনীয় এই কাজের পেল সামার্থ্য? এবং সবার চোখে ধুলো দিয়ে দিনের আলোয় ঘন-লোকালয়ের মধ্য থেকে হলো সে উধাও?···

বিনয়দেরই সতীর্থ একটি যুবক দূর থেকে বিনয়কে গুলি ছুঁড়তে দেখেছিল। তার কাছ থেকেই বিনয়ের নাম পুলিশের কাছে প্রকাশিত হল। পুশিশ জানলো-যে মেডিকেল্ স্কুলের ছাত্র দ্বারাই কৃত এ কর্ম্ম। অতএব এই কর্ম্মের জন্য এবং বিনয়কে না-পাবার জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী নিশ্চয়ই মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ! তাই মেডিকেল্ ছাত্রদের উপর নেবে এল অত্যাচারের তাণ্ডব।···

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কতগুলো য়্যাংলোইণ্ডিয়ান যুবক সহ সার্জ্জেণ্টের দল খ্যাপা-কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মেডিকেল মেস্‌গুলোর উপর। তন্ন তন্ন তালাসি শুরু কোরল পুলিশের লোকেরা। সার্জ্জেণ্টগুলো ও য়্যাংলো-যুবকেরা ছাত্রদের পশুর

নৃশংসতায় বেটন্-পেটা কোরতে লাগল। জিনিসপত্র—বই-জামা-কাপড়-পেয়ালা-ডিশ্ সব কিছু—ভেঙ্গেচুরে একাকার কোরে দিল। টাকাপয়সা, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি প্রভুদের পকেটে বেমালুম ঢুকে গেল।···শহরের সর্ব্বত্রই পুলিশের চর ঘুরে বেড়াতে লাগল। শহর থেকে বেরুবার পথগুলোয় পথচারীদের উপর নজর রাখবার জন্য এবং প্রয়োজনে বেপরোয়া ভাবে তাদের তালাসি নেবার জন্যে পুলিশ মোতায়েন রাখা হলো। মোটের উপর সেদিন থেকে শহর জুড়ে বিরাজিত হলো পুলিশী-রাজের নগ্ন অভিযান। কিন্তু বিনয় কই? তার যে কোন পাত্তা-ই মিলছে না! বড়-কর্ত্তারা পুলিশের ছোট-কর্ত্তাদের উপর সমানে সেন্সর্ দেয়া সত্ত্বেও হন্তদন্ত-হয়ে-পড়া পুলিশ বিনয়দের কোন হদিস-ই পাচ্ছে না। ব্যর্থতা তাদেরকে মরীয়া কোরে তুলল। তার জের ভোগ কোরতে লাগল ঢাকা শহরের অধিবাসী নারীপুরুষ।···

মেডিকেল্ স্কুলে টেনিসের ট্রফি-বিজয়ীদের নিয়ে যে গ্রুপ-ফটো ছিল তা থেকেই বিনয়ের ছবি পুলিশ সংগ্রহ কোরল। এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেক রেল্ওয়ে ষ্টেশানে, থানায় থানায় ও জনবহুল নানা লোকসমাগম-কেন্দ্রে বিনয়ের প্রকাণ্ড ছবি সমেত পোষ্টার লাগিয়ে দেওয়া হল। যে এই পলাতক সিংহ-শাবককে ধোরে দিতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে গুণে গুণে পাঁচ হাজার টাকা নগদ।···

৩০শে তারিখ দুপুরের দিকে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি এল ঝড় জলের প্লাবনে রাস্তাঘাট শূন্য। এমন সময় দুটি প্রাণী ছাতা মাথায় থাকা সত্ত্বে-ও অসম্ভব ভিজে ভিজে পথ চলছে। সুশান্ত সাধারণ বেশ। তার পশ্চাতে বিনয় বোস—পরনে ছেঁড়া লুঙি

গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় নোংরা একটা গামছা জড়ানো। মুসলমান কৃষকের পরিচ্ছদে বিনয়কে চেনা যাচ্ছিল-না 'বিনয়' বোলে—কিন্তু তার আভিজাত্যপূর্ণ-চেহারার ছাপ ওতে সম্পূর্ণ লুকয়নি। সন্ধ্যা তখন নাবে নি—তবু সর্ব্বপৃথিবী অঝোর বর্ষণে ও পুঞ্জীভূত মেঘছায়ায় আঁধারাচ্ছন্ন।

দোলাইগঞ্জ ষ্টেশানের সন্নিকটে একটা পোড়ো-বাড়িতে বিনয়কে বসিয়ে সুশান্ত দু'খানা টিকিট কেটে আনল। গাড়ি আসবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তারা প্লাট্ফর্মে গিয়ে হাজির। নারায়ণগঞ্জমুখী গাড়ি পৌঁছল এসে ষ্টেশানে। পুলিশ তচ্‌নচ্‌ কোরে সার্চ কোরল গাড়িটা, কিন্তু ঝড়জলের দাপটে প্ল্যাট্ফর্মের উপর তারা নজর দিল-না। পেছনের গাড়িগুলোর তালাসি হয়ে যেতেই বিনয় ও সুশান্ত একটা কামরায় উঠে গেল। সে-কামরায় অনেকগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত নারায়ণগঞ্জের ছাত্র গুলজার কোরছিল। সুশান্ত তাদের মধ্যে গিয়ে বোসল। বিনয় পাশের বেঞ্চে এক কোণে নিরীহ গ্রাম্য-মুসলমানের ভঙ্গিতে মাথা গুঁজে পড়ে রইল। ঐ ছেলের দলের মধ্যে সুশান্তদের লোক ছিল। চাষাড়া ষ্টেশানে আসবার পূর্ব্বেই ডিষ্টান্ট্-সিগ্‌ন্যালের কাছে সেই লোকেদের একজন এলার্ম্-চেন্ ধোরে টান দিতেই গাড়ি থেমে গেল। সুশান্ত, বিনয় এবং কয়েকটি ছেলে গাড়ি থেকে নেবে মাঠের পথে রওনা হল। অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে গেছে—ঝড়জলের দুর্দ্দান্ত গতিবেগে দু'গজ দূরের লোক-ও কোন কিছু নজর কোরতে পারল না। তা ছাড়া কোন কামরার-ই জানালা-কবাট খোলা ছিল না।

নারায়ণগঞ্জ শহরে হাঁটা-পথে এসে যথানির্দ্দেশিত আস্তানায় বিনয় রাত কাটাল। থানায় টেলিফোন্-এর কাছে যে-পুলিশের

কর্ম্মচারীটি কর্ম্মরত ছিল তার সংগে সুশান্তদের যোগাযোগ থাকায় পুলিশের ঢাকা হেড্-আপিসের কাছ-থেকে-আসা নির্দ্দেশগুলো জানা যেতে লাগলো। হুকুম আসছে: ভদ্রলোক যুবক পেলেই তালাসি নাও; হুকুম আসছে: নদীতে চলাচলের প্রত্যেক নৌকো আটক কোরে সার্চ্ করো।...

সুশান্তদের কয়েকটি বন্ধু অস্ত্রসজ্জিত হয়ে-ই সুশান্ত ও বিনয়কে আগাগোড়া অনুসরণ কোরে আসছিল দোলাইগঞ্জ ষ্টেশান থেকে। এবার তাদের স্থান গ্রহণ কোরল নারায়ণগঞ্জের বন্ধুরা। আগেপিছে বেশ দূরে দূরে আলাদা আলাদা ভাবে তিনচার জন সশস্ত্র যুবক চলতে থাকে। উদ্দেশ্য—বিনয়কে কিছুতেই ধরা পড়তে দেয়া হবে না। বিপদে অগ্রপশ্চাতের লোকেরা অতর্কিতে আক্রমণ-কারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—এবং সেই সুযোগে বিনয়-সুশান্ত পালিয়ে যাবে। ঢাকার চতুঃসীমায় বিনয় বসু ধরা পড়বে—এ-কথা ঢাকার বিপ্লবী ভাবতে পারে না। তাদের দায়িত্ব, অন্য জিলার বিপ্লবী-বন্ধুদের হাতে বিনয়কে অক্ষত-শরীরে পৌঁছে দেয়া।...

সূর্য্য তখনো ওঠে-নি। বৃষ্টি থেমে গেলে-ও ঘর থেকে বেরুবার ইচ্ছা হয় না। ৩১শে তারিখের সেই প্রত্যূষে বন্ধুরা নারায়ণগঞ্জ থেকে দূরে একখানা নৌকা যোগাড় করেছে। সুশান্ত-ও এবার গেঁয়ো মুসলমানের বেশ পরে নিয়েছে। বন্ধু বিনয়কে নিয়ে নৌকায় উঠতেই নৌকো দিলো ছেড়ে। অল্পক্ষণেই তারা এলো নারায়ণ-গঞ্জের অপর তীরস্থ 'বন্দর' নামক স্থানে। বন্দর থেকে মাইল তিনেক হেঁটে গেল তারা দু'জন কোথাও হাঁটুজল, কোথাও বুক-জল ভেঙ্গে বৈদ্যেরবাজার। খাঁটি গেঁয়ো-মুসলমানের ভঙ্গিতেই তারা

পথ চলছিল—মাথায় জড়ানো তেলচিটে গামছা, এক হাতে ভাঙ্গা ছাতা, গায়ে ছেঁড়া জামা, পরনে ছেঁড়া লুঙি, অপর হাতে ছেঁড়া চটি।

বৈগুেরবাজার এসে সুশান্ত আবার 'বাবু' সেজে বিনয়কে ভৃত্যের পরিচয় দিয়ে এক নৌকো ভাড়া কোরল। নৌকো চলেছে পাল খাটিয়ে তীরের মত। বিপুল মেঘনার বুকে বুকে তাদের যাত্রা। ঢাকায় বোসে দুর্দ্দান্ত ডি-আই-বি বিনয়কে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে তখনো। বিনয়দের নৌকো ত্রিপুরা জিলায় ঢুকে গেছে। 'বিষনন্দী' নামক স্থানে নৌকো আসার পর মেঘনায় ঝড় উঠে গেল। কালো কালো অজস্র ঢেউ কেশর-ফোলা লক্ষকোটি কালো সিংহের মত গর্জ্জে উঠেছে—দাপাদাপির শেষ নেই। মাঝি আর নৌকো চালাতে নারাজ। বল্ল : বাবু, এবার ষ্টিমারে তুলে দি আপনাদের। ঐতো ষ্টেশান দেখা যাচ্ছে।

সুশান্ত : কেন রে? কি হবে ঝড়ে? চল্‌না পাড়ি দি।

মাঝি : না বাবু। কোন মিঞা-ই এ-নদীতে নৌকো খুলবে না—তা যত বড় মাঝি-ই হোক।

সুশান্ত নিরুপায় হয়ে বল্ল : আচ্ছা ষ্টিমারেই তুলে দে।

ছোট্ট একটা ফ্ল্যাগ্‌ ষ্টেশান—অত নগণ্য একটা ষ্টেশান দিয়ে স্বনামধন্য বিনয় বসু আর পালাতে পারে না! কাজেই সেখানে পুলিশের প্রাদুর্ভাব সুশান্তরা অন্তত বোধ কোরল-না। তারা বেশ সুবিধামত ভাবেই ষ্টিমারে উঠল। সে-ষ্টিমার যাচ্ছে ভৈরব। ভৈরব পৌঁছেই সুশান্ত বুঝল যে, পুলিশের দৃষ্টি সেখানে সচল। ইতিমধ্যে সুশান্ত আবার মুসলমান-কৃষকের বেশ পরে নিয়েছে।

ভৈরব ষ্টেশানে কোলকাতার টিকিট পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে দু'খানা মৈমনসিংহের টিকিট-ই কেটে দুই বন্ধু পায়ে হেঁটে আট মাইল এসে নগণ্য একটা ষ্টেশানে গাড়ি ধোরলো। গাড়ি কিশোরগঞ্জ আসতেই মহা বিপদ। পুলিশের বিরাট বাহিনী সবগুলি ট্রেণ সাড়ম্বরে তালাসি কোরছে। বিনয়দের গাড়ি প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতেই কামরায় কামরায় পুলিশের দল ঢুকে পড়তে লাগল। সুশান্ত প্রমাদ গণল। বিনয়কে বসিয়ে রেখে সে তড়াক কোরে প্লাটফর্মে নেবেই একজন টিকিট কালেক্টরের কাছে গিয়ে মিনতির সুরে বল্ল: বাবু, ফুলিশ! আফ্‌নের ফাও দুইডা দরি—বাচান, বাবু বাচান।

টিকিট-কালেক্টর কিশোরগঞ্জেরই লোক। সরল বিশ্বাসী মুসলমানটির আবেদনে একটু আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্ল: পুলিশ—তাতে তোর কি?

সু: হুজুর, আমাগো টিকস নাই। করতে পারি নাই। ফুলিশতো বাইন্দা নিব। বাবুকত্তা, আফ্‌নারে টেহাডা দেই দুইডা টিকস্ কইরা দেন।

টি-কা: কি কাণ্ড? পুলিশ বাঁধবে কেন তোদের? গাধা কোথাকার! যা—গাড়িতে যা। ও পুলিশ তোদের জন্য নয়।

টিকিট কালেক্টরের পা দুটো জড়িয়ে ধোরে, চোখের জল সত্যি বার কোরে সুশান্ত বল্ল: না বাপজান, ফুলিশ গুতাইবো। আফনে ধম্মের বাপ, টিকস কইরা দেন।

টিকিট কালেক্টরের দয়া হলো। ভাবলো, গ্রামের নিরীহ কৃষকতো—সত্যি ভয় পেয়েছে পুলিশ দেখে। বল্ল সে: কোথায় যাবি?
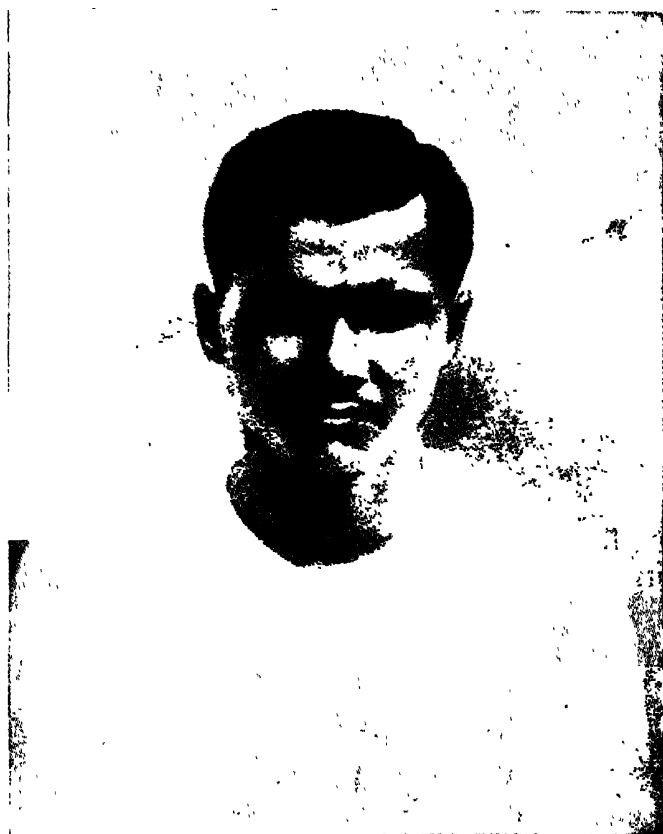
ব্রজগোপাল চক্রবর্ত্তী

রাজ-হত্যা মামলায় শহীদ

—বাবু, কলে কাজ করতে যামু। যেইহানে খুব বড় কল আছে, হেইখানকার টিকস দেউখাইন।

—কোথাকার কল? কি কল রে?

—এই যে বাবু, বড় বড় কল? যেইহান থনে হুড়ুৎ কইরা ছুতি-গামছা বাইর অয়্।

টিকিট কালেক্টরের হাসি পেল। বল্ল: বুদ্ধির ঢেঁকি—কাপড়ের মিলে কাজ করবি বুঝি?

একগাল হেসে সুশান্ত বল্ল: আইগা কত্তা। ঠিকই কইছেন। আফনারা ইংরাজিনবিস—আমরা মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ—অত জানি নাকি?

—তা কোথায় যাবি?

—খুব বড় কল যেইহানে।

টাকা আছে কত?

—অনেক আইগা।

—কত?

—সাতাইশ টেহা, কত্তা।—বোলেই ট্যাঁক থেকে সাতাশটি টাকা বের কোরে দিল সুশান্ত। টিকিট কালেক্টরের হাতে দিতে দিতে বল্ল সে: গইনা নেন, বাবু।

টিকিট কালেক্টর 'অনেক টাকা'র দৌড় সাতাশ টাকায় দেখে আবার হাসল। এবং সত্যি দয়াপরবশ হয়ে টিকিট-রুম্ থেকে দুখানা কোলকাতার টিকিট কেটে আনল।···টাকা ফেরত দিতে গেলে সুশান্ত বল্ল: বাবু, বাচাইলেন। খোদা আফ্নার ভাল করবো। ঐ টেহা কয়ডা আফ্নে নেন।

—তোরা পথে খাবি কি?

তাড়াতাড়ি পোঁটলা দেখিয়ে একগাল হেসে সুশান্ত বলে: বাবু—পেওয়াইজ, মুড়ি, কাচা মরিচ আছে ইডার মধ্যে।

টিকিট কালেক্টর নিজের জন্য সামান্য রেখে সুশান্তকে কিছু টাকা ফেরত দিয়ে বল্ল: যা, প্ল্যাটফর্মের ঘরে গিয়ে বোসে থাক। গাড়ি এলে আমি উঠিয়ে দেব তোদের সে-গাড়িতে।

সুশান্ত তাড়াতাড়ি বিনয়কে টিকিট কালেক্টরের কাছে ডেকে এনে বল্ল: কত্তা, আফ্‌নে আমাগো হেই গরে ডুকাইয়া দেন—ফুলিশ নাইলে মারবো।

টিকিট কালেক্টর ওদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে ঢোকানয় পুলিশের কোন সন্দেহ হলো না। তারা গাড়িগুলো তখন পূর্ণোদ্যমে সার্চ কোরছে। ওয়েটিং রুমে ঢুকেই বিনয় গামছা-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।···সুশান্ত বিড়ি ফুঁকছে, আর মিটমিট কোরে তাকিয়ে দেখছে পুলিশের কাণ্ড। এবার পুলিশ ঢুকলো বিনয়রা যে কামরায় ছিল, ট্রেণের সেই কামরায়। সুশান্ত মনেপ্রাণে জাতির ভগবানকে প্রণাম জানাল।···

কোলকাতার গাড়ি এসে যেতেই টিকিট কালেক্টর সুশান্তদেরকে নিয়ে ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়ে দিল এবং গার্ড্‌কে বোলে দিল যে—এই লোক দুটো তার গ্রামবাসী নেহাৎ নিরীহ গোছের ভালমানুষ, এদের যেন জগন্নাথগঞ্জ পৌঁছে দেয়া হয় নির্ব্বিঘ্নে।

সুশান্ততো কিছুতেই কামরায় ঢুকবে না? বলে: কত্তা, এইডা বাবুগো গাড়ি···এইডায় উঠলে মাইর খামু।

গার্ড সহাস্যে বল্ল: আরে ব্যাটা ওঠ্‌—কেউ মারবে না।

—আইগা সরম লাগে···ডর করে···কার্‌তাম না।

গার্ড কপট-ক্রোধে বল্ল : তবে সাহেবদের গাড়িতে তুলে দেব—ঐ সেকেণ্ড ক্লাসে।

সুশান্ত কাতর ভাবে : না, না—বাবুসায়েব। মাইরা ফালাইব সায়েবেরা।

—তবে ওঠ্ এই গাড়িতে। ভয় কি? আমি-ইতো তোদের নিয়ে যাচ্ছি।

সুশান্তর ইচ্ছা ছিল-না ইণ্টার ক্লাসে যাবার, কারণ সেখানকার কম ভিড়ে ধরা পড়বার আশঙ্কা অধিক। কিন্তু এ-যাত্রা বাধ্য হয়েই তারা দু'জন ইণ্টারে উঠে বোসল। বিনয়কে বেঞ্চের উপর না-বসিয়ে মেজেতে বসান হলো। বিনয় মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। স্বাস্থ্যপূর্ণ সুশ্রী তার রূপ—গায়ের রঙ্ ফর্সা—তাকে গেঁয়ো মুসলমান রূপে চালিয়ে নেয়া মুস্কিল। মাথা ধরার অজুহাতে গামছাকাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে-থাকবার ব্যবস্থা তাই তার জন্যে প্রশস্ত।…সুশান্ত দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ি মৈমনসিংহ ষ্টেশানে আসতেই গুটিকয় পুলিশ অফিসার এসে কামড়ায় ঢুকলো। তারা জগন্নাথগঞ্জের কাছাকাছি যাবে। সুশান্তর টিকিট করা ছিল। মৈমনসিংহ ষ্টেশানে নামবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পুলিশ অফিসারগুলো দেখে তার অস্বস্তিবোধ হোলো। ষ্টেশান-ঘরের দেয়ালে যে-বিনয়বসুর ছবি-সমেত পুরস্কার-বিজ্ঞাপিত বড় বড় পোষ্টার দেখা যাচ্ছে, সে-বিনয়বসু তারই পায়ের কাছে আছে শুয়ে।…একটি অফিসার সুশান্তকে বল্ল : ওটা শুয়ে কেন রে?

—হুজুর কত্তা, মাথার বিষে পইড়া আছে।

—তুই দাঁড়িয়ে কেন?

—আইগা, বাবুগো জাগায় বমু কেমনে?

—ও, আচ্ছা থাক দাঁড়িয়ে।

পুলিশ-অফিসারবৃন্দ আরাম কোরে বোসে কথাবার্ত্তা শুরু কোরল। প্রসঙ্গ—বিনয় বসু, লোম্যান্, হড্সন, এনার্কিষ্ট্, গান্ধি, সাহেবসুবা, চাকরি ইত্যাদি নানা বিষয়। কিন্তু সকল কথা-ই ঘুরেফিরে ২৯শে আগষ্ট-এর সেই রক্তক্ষরিত-সংঘটনাকে কেন্দ্র কোরে গুঞ্জরিত হতে থাকে।···

জগন্নাথগঞ্জ এসে সুশান্ত ও বিনয় সহজেই ষ্টিমারে উঠতে পারল। পুলিশের লোক থাকা সত্ত্বে-ও তাদেরকে সন্দেহ কোরল-না কেউ। ষ্টিমারে উঠেই বাট্লারের কাছে গিয়ে সুশান্ত বল্লঃ ভাই ছাব, আমরা মুসলমান, আম্রারে কিছু খাওয়নের বন্দোবস্ত কইরা দেউখাইন—যা লাগে দিমু।

বাটলার যখন জানলো-যে এরা তার জিলার লোক, তখন সে তাদের বল্ল খালসীদের কাছে গিয়ে বোসতে।

সু: ভাইছাব, আমরা মুখ্খু মানুষ—চিনা যাইতে পারতাম না—আফ্নে আম্রারে দিয়া আওহাইন।

বাটলার খালাসীদের কাছে ওদের দুজনকে দিয়ে এল এবং বোলে এল যে, ওরা তার স্বগ্রামবাসী এবং খাবে তারই সংগে।

সুশান্ত ট্র্যাক থেকে বিড়ির বাণ্ডেল খুলে খালাসীদের মধ্যে বিতরণ করল এবং বোকার মত নানা প্রশ্নাদি কোরে বেশ জমিয়ে তুলল।

বিনয় মাথা-ধরার অজুহাতে গামছা মুড়ি দিয়ে খালাসীদের মধ্যে ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর সুশান্ত জাহাজ দেখবার কথা বোলে আড্ডা ছেড়ে উঠে এল। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে ঘুরে সে দেখতে লাগল পুলিশের ব্যস্ততা।

ষ্টিমার দুর্দান্ত গতিতে ছুটে চলেছে সিরাজগঞ্জের দিকে। সুশান্ত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল জলের বুকে চাকার দাপাদাপি। গতির মূলে এই দাপাদাপি···ভারতবাসীর মনের চাকায় দাপাদাপি নেই। তাই গতিহিন জাতির জীবন!···

অনেকক্ষণ পর বিনয়ের কাছে ফিরে এসে সুশান্ত দেখল-যে বন্ধু নিশ্চিন্তসুখে নিদ্রা যাচ্ছে। তার ঘুম না-ভাঙিয়ে সুশান্ত গেল বাট্‌লারের কাছে। বল্ল: ভাইছাব, খাওয়নের আর দেরি কত? একটু তাড়াতাড়ি অইলে বালা অয়্।

বাটলার বল্ল: তুস্‌রা মিঞাকে ডেকে আন, এক্ষুণি দেব খেতে।

বিনয় ও সুশান্তকে বাট্‌লার তার ঘরে খেতে দিল। পরম পরিতৃপ্তিতে দুই বন্ধু আজ তিন দিন পর এই প্রথম খেল ভাত।

ষ্টিমার সিরাজগঞ্জ ঘাটে লাগতেই নোংরা-কাঁথায়-জড়ানো বিছানা দুইটি কাঁধে কোরে দুই বন্ধু ভিড়ের সংগে সংগে ট্রেণে উঠে পড়ল। পুলিশের যত তম্বী ভদ্র-যুবকদের উপর চলছিল—সাধারণ গ্রাম্য-মুসলমানের বেশে ছেঁড়া-কাঁথার বিছানা মাথায় যে দুঃসাহসী বিনয় পালিয়ে যাচ্ছে তা তাদের ধারণায়-ও ছিল না।···বাকি পথে ঈশ্বরদি ষ্টেশানে পুলিশের কিছু উপদ্রব হলে-ও বিনয়-সুশান্ত এক টানে চলে এল দমদম, সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে। শেয়ালদহ না-নেমে দমদম থেকেই কোলকাতা যাওয়া স্থির হয়েছিল—কারণ, শেয়ালদহ ষ্টেশান তখন ভীষণ গরম হয়ে আছে পুলিশের ব্যস্ততায়। তা ছাড়া দিনের আলোয় বিনয়ের মত একটি সুপুরুষ যতোই নোংরা-পোষাক পরে চাষীর ছদ্ম রূপ গ্রহণ করুক—কোলকাতার 'আই-বি'-র কাছে তার ধরা পড়বার আশঙ্কা কম নয়।···

চার

ইতিমধ্যে উত্তর, দীনেশ, রহমন, বিনিময়, সুশান্ত, অরুণাদি প্রমুখ কতিপয় কর্ম্মীকে আত্মগোপন কোরতে হয়েছে।...

ঢাকা জেলে পূর্ব্ব থেকেই বাঙলার কিছু কর্ম্মী রাজবন্দীরূপে আটক ছিলেন। ২৯শে তারিখের পর-ই দলে দলে যুবককে শুধুমাত্র যৌবনের অপরাধে জেলে ঢোকানর পালা শুরু হয়েছে। লোম্যানের জ্ঞানসঞ্চার হয় নি। য়্যারোপ্লেনে কোলকাতা আনা হয়েছে তাঁকে। বিকেলে কোলকাতার স্পেশাল কাগজে বেরিয়ে গেছে তাঁর মৃত্যুসংবাদ। কৃষ্ণকায়-বিপ্লবীর গুলিতে শ্বেত ইংরেজ-রাজপুরুষের মৃত্যু বাঙলার মাটিতে এই প্রথম। হড্‌সন-এর অপারেশান হয়েছে। তাঁর জীবন নিয়ে-ও যমে-মানুষে টানাটানি। পরিস্থিতি তাই গুরুতর।...

বন্দীরা বেজায় খুশী। ব্রিটিশ সিংহের অঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে—এ কি কম সাফল্যের কথা? সাবাস বিনয়! সাবাস তার বীরত্ব! আদর্শ তরুণ বটে—প্রণাম করে মনে মনে রাজবন্দীর দল।...

জেলের সুপারিন্টেডেন্ট লেনার্ড সাহেব লোম্যানের বন্ধু। বন্ধুর এই অপমৃত্যুতে সাহেবের জিঘাংসাবৃত্তি বেড়ে গেছে। দু'বেলা বন্দীদের তিনি এসে শাসিয়ে যান। কিন্তু সে-শাসনের ফাঁকে যে-দুর্ব্বলতা তাঁর প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাতে বন্দীদের আমোদ হয়।

বন্দীদের ব্যারাকের পেছনেই সাধারণ কয়েদীদের কাজের ঘর।...বন্দী শঙ্কর সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে ঐ কাজের ঘরের দিকে।...জটলা কোরছে তখন কয়েদীরা। বিষয়বস্তু—বড় পুলিশসাহেব হত্যা।

মাস তিনেক পূর্ব্বে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়ে গেছে। সেই দাঙ্গা জড়িয়ে হড্‌সনের কুখ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। সে-দাঙ্গায় ঢাকার রায়সাহেব-বাজারের এক গুণ্ডার খুব প্রতিপত্তি লাভ হয়েছিল। গুণ্ডার নাম হলো মহিউদ্দিন্। নরহত্যা, লুট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বিচারার্থে কোর্টে আনীত হলে সবার চোখে ধুলো দিয়ে সে পালিয়ে যায়। ঢাকা শহরের নীচু শ্রেণীর মুসলমানদের ধারণায় ও-লোকটা মস্ত 'হিরো'।···কয়েদীদের মধ্যে কথা হচ্ছে। একজন বোলছে সবাইকে: 'হালায় বাগের বাচ্চা।··· আম্‌গো যেমুন মহিউদ্দিন—ইন্দুগো তেমুন বিনয়বছু।···হালায় দুইটারে মারলো বি, আবার আওয়ায় মিলাইয়া গেল বি।'···

কয়েদীরা সকলেই একবাক্যে তাকে সায় দিল। আড্ডা জমে উঠেছে। দূরে ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে এসে হাঁক দিল: কেয়া ক্যরতা রে? কাম্ ছোড়্‌কে ইয়ারবাজি শুরু ক্যর্ দিয়া?

পূর্ব্বোক্ত কয়েদী দাঁত বের কোরে বল্ল: আইয়ে সিপাহীবাবা, আইয়ে। সাব্‌লোককো মার্ ডালা—কাম্ ক্যোয়া ক্যর্ না?

ওয়ার্ডার একবার রাজবন্দীদের ব্যারাকের দিকে তাকাল। তারপর কয়েদীদের উদ্দেশে সে বল্ল: আরে, বাবুলোকতো যাদু জান্‌তে হেঁ। উন্‌লোক্‌কী বাতোঁ ছোড়্ দো।

ওয়ার্ডার এবং কয়েদীদের গল্প-ও প্রায় জমে উঠেছিল—এমন সময় গগনভেদী চিৎকার শোনা গেল: 'সরকার! সেলাম।'··· ক্ষিপ্রবেগে কয়েদীর দল যার যার কাজে লেগে গেল। ওয়ার্ডার পাগড়ি-উর্দিতে হাত বুলিয়ে চাবির গোছা নিয়ে দৌড়ে ওয়ার্ডের দরজা খুলতে গেল।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল এ'দের কথাবার্ত্তা। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মুখে মুখে আজ এ-আলোচনা-ই-যে হচ্ছে তা' শঙ্কর অনায়াসে কল্পনা কোরতে পারল। গভীর হয়ে ভাবলো সে—এই যুবক হয়তো ধরা পড়বে, হয়তো ফাঁসির মঞ্চে ঝুলবে, নয়তো-বা গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ কোরবে। কিন্তু যে-বিদ্যুৎচমক তমিস্রাঘন জাতীয়-গগনে সে আজ চিহ্নিত করে দিল, তার আলোয় চিরন্তন-আলোকের চরণপাত নয় কি ?…

অসময়ে সুপার আবার 'রাউণ্ড্'-এ এসেছেন ? লোকটা ঘরে বোসে থাকতে পারেন-না। বন্ধুর মৃত্যুতে চঞ্চল। বন্দীদের উপর বারে বারে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে যাবার নেশায় তাঁকে পেয়ে বসেছে।

শঙ্কর চলে গেল তার ব্যারাকে। সাহেব ততক্ষণে কয়েদীদের কাজের ঘরের পাশ দিয়ে রাজবন্দীদের ব্যারাকের দরজায় এসে দলবল সহ ঢুক্‌ছেন।…

পাঁচ

৭নং ওয়ালিউল্লা লেন (ওয়েলেস্‌লি)। ক্ষুদ্র এক দোতলা। দোতলার তিন দিকে প্রাচীর-ঘেরা বিস্তর জায়গা। সেখানে কতগুলো বড় বড় শেড্—রিক্সা ও ট্যাক্সির গ্যারেজ রূপে তাদের ব্যবহার হয়। রিক্সা-কুলিরা সর্ব্বদা সরগরম কোরে রাখে সেই বাড়ি। আশেপাশে চতুর্দ্দিকে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের আড্ডা ও বস্তি। সদর গেট্ দিয়ে ঢুকে, গ্যারেজগুলো পেরিয়ে, এক কোণে গাছগাছড়া ও লতায় ঢাকা ছোট্ট দোতলাটায় থাকেন মালিক। নীচের তলা

বাসের অযোগ্য—তবে সর্দ্দার-কুলির পক্ষে স্যাঁতসেঁতে ও-আঁধার গৃহই রম্য প্রাসাদ।

তখন বেলা দশটা। তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বার। বিনয় ও সুশান্ত এসে দোতলায় উপস্থিত। উত্তর ও রহমন অনেকক্ষণ ধোরে সেখানে অপেক্ষা কোরছিল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই উত্তর তাকে জড়িয়ে ধোরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। বল্লঃ ভাই, ইতিহাস সৃষ্টি করেছ।...আজ বাঙলার মেয়েপুরুষ দুঃসময়ের বন্ধু রূপে তোমার নাম কোরছে, বিনয়।...

বিনয় নিবিড় কোরে কোলাকুলি কোরল উত্তর, রহমন এবং গৃহকর্ত্তার সংগে। রহমন টকটকে লাল বর্ণের সিল্কের লুঙি, সিল্কের পাঞ্জাবি ও মস্‌লিনের উপর কাজ-করা সুন্দর একটি টুপি দিয়ে বল্লঃ এগুলো পরে নিন, বিনয়দা। এ-পাড়ার 'প্রিন্স' আপনি। আপনাকে পুলিশের বাবা-ও খুঁজে বার করতে পারবে না।

বিনয় সহাস্যে বেশ পরিবর্ত্তন কোরবার জন্য বাথ্-রুমে চলে গেল। স্নান না-করলে তার আর চলছে না।...

* *

*

ওয়ালিউল্লা লেনে দু-চারদিন থাকার পর বিনয়কে পাঠান হলো ই-আই-আর্ লাইনে কোনো এক শেল্টারে। তাকে নিয়ে যাচ্ছেন একজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী। উভয়েই অস্ত্রসজ্জিত—কারণ পথেঘাটে পুলিশদ্বারা আক্রান্ত হলে যুদ্ধ কোরে মরে যাবার বিধান রয়েছে দলের। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। বিনয়কে বর্ম্মী-তরুণের পোষাকে মানিয়েছে চমৎকার। বন্ধুরা-ই চিনতে পারে-না সহসা। সঙ্গীটি বোসেছেন দূরের বেঞ্চে। সতর্ক দৃষ্টি তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিনয় নির্ব্বিকার। এমন সময় পথের একটা ষ্টেশান থেকে একটি লোক উঠল বিনয়দের কামরায়। তার চেহারা ও হাবভাব একটু সন্দেহজনক। সঙ্গীটি বহুক্ষণ ধোরে লোকটাকে লক্ষ্য করার পর বিনয়কে ইসারা কোরলেন। বিনয় একবার সহজ চোখে দেখে নিল আগন্তুককে। সঙ্গী চঞ্চল হয়ে কোমরের পিস্তলে হাত দিয়েছেন—প্রায় টেনে বার করেন আর কি! কিন্তু বিনয় তবু নির্ব্বিকার। সে-মুহূর্ত্তেই গাড়ি এসে ছোট্ট একটা ষ্টেশানে দাঁড়াল লোকটা নেবে গেল। সঙ্গী তৎক্ষণাৎ বুঝলেন-যে ওটা ও-লাইনের কুলি। মহা কেলেঙ্কারি ঘটে যেত—কিন্তু বিনয়ের বিকারহীন সাহস ও সহজ-সংযম তার চরিত্রে যে-প্রশান্তি ও ধৈর্য্য দান করেছিল তার প্রভাবেই সঙ্গীর পিস্তল গর্জ্জে-ওঠার অবকাশ পেল না।···

কিছুদিন পর বিনয় চলে এল বেলেঘাটা অঞ্চলে ১৮নং শেল্টারে।···সুভাষচন্দ্র তৎকালে অস্থির হয়ে উঠেছেন বিনয়কে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে।···

তখন রাত ৯টা। এলগিন্ রোডের বাড়িতে সুভাষচন্দ্র বোসে আছেন কোণের একটা ঘরে। ঘরে অপর কেউ নেই। হল্‌ঘরে বহু লোক তাঁর অপেক্ষায় ভিড় জমিয়েছে। এমন সময় বেয়ারা এসে সুভাষবাবুকে স্লিপ্ দিলো। একটু পরে একটি পাঞ্জাবী ভদ্র-মুসলমানকে নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো। সুভাষবাবু বেয়ারাকে বিদায় দিলেন। তারপর চুপিচুপি আগন্তুককে বল্লেন: ভারি সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে, উত্তরবাবু।·· হাঁ, বিনয় কেমন আছে?

—ভাল আছে।

—ওকে কন্টিনেণ্টে পাঠিয়ে দিন। টাকাপয়সা আমি যোগাড় কোরে দেব, কন্টিনেণ্টে থাকবার ব্যবস্থা-ও আমি কোরে দেব।

উত্তর ঃ ও ভারতবর্ষ ছেড়ে কোথাও যেতে চায়না। বলে—মরতে হয় দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই মরবো।

—অমন অনন্যসাধারণ ছেলে! ওরা বেঁচে থাকলে কতো অসাধ্য সাধন-ই-না সম্ভব হতো।…(তারপর একটু থেমে আবার বলছেন) ঃ যাক্, ওর মতের বিরুদ্ধে কিছু না-করাই ভাল।…

উত্তরের সংগে সুভাষবাবুর আরো কিছুক্ষণ সংগোপনে আলাপ হলো। আলাপান্তে উত্তর চলে এল তাদের আড্ডায়।…

সুশান্ত জিজ্ঞেস কোরছে ঃ সুভাষবাবু কি বোললেন, উত্তরদা?

—তিনি যা বোলবেন তাতো জান-ই। তবে বিনয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না-করাই স্থির হলো।

—হাঁ পশুপতিদার-ও তাই মত।…

পরদিন দুপুরে উত্তরদের আড্ডায় খবর এল যে, কোন যুক্তি বা প্রমাণ না-থাকলে-ও মনে হচ্ছে—বেলেঘাটার শেল্টারটা যেন পুলিশের নজরে পড়ে গেছে।…

—এটা নেহাৎ-ই 'প্রিমনিশানে'র ব্যাপার, 'ড্যাটা' কিছু নেই—সুশান্ত বলে।

উত্তর ঃ এক্ষুণি বিনয়কে সরাবার বন্দোবস্ত কর। এ সব ক্ষেত্রে 'প্রিমনিশানে'র মূল্য আমি খুব দি। Don't be Slow—যাও।…

তৎক্ষণাৎ সুশান্ত চলে গেল মেটিয়াবুরুজ। ২৭ নং শেল্টারের কর্তা-গৃহিণীর পরামর্শ মত তাঁদেরই গুটি কয় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সংগে নিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মোলালি থেকে একখানা ট্যাক্সি কোরে

বেলেঘাটায় সুশান্ত উপস্থিত। অনতিবিলম্বে ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত বিনয়কে নিয়ে সুশান্তর দল ছুটে চলে এল শ্যামবাজার। সেখান থেকে ট্যাক্‌সি বোদলে নতুন ট্যাক্‌সি যোগে এল তারা ভবানীপুর। ভবানীপুর থেকে আবার ট্যাক্‌সি বোদলে এল তারা মেটিয়াবুরুজ। তৎপর সাত-আট মিনিট পায়ে হেঁটে ২৭ নং শেল্টারে তারা ঢুকে পড়ল। বিনয়কে সেখানে রেখে সুশান্ত ফিরে এল তাদের আড্ডায়।...পরদিন ভোরে শোনা গেল যে সত্যি শেষ-রাতে বেলেঘাটার বাড়িটা পুলিশ ভীষণ ভাবে তালাসি করেছে। অবশ্য আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নি।...

ছয়

লোম্যান্ হত্যার কিছু পূর্ব্বেই উত্তর গা-ঢাকা দেয়। এবং গা-ঢাকা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রেসটি চলে যায় ঝামাপুকুরের একটা বাড়িতে। তার কয়েক দিন পর আবার স্থানান্তরিত হয়ে নতুনতর নামে প্রেসটি উঠে আসে গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেনে। লোকে জানল যে কয়েকটি নবাগত নতুন নাম দিয়ে নতুন একটি প্রেস খুলেছে রুজিরোজগারের ব্যবস্থা কল্পে।

কিন্তু ভাল কোরে যারা তলিয়ে দেখতে জানে তাদের তে সন্দেহ থাকতেই পারে যে বর্ত্তমান মালিকেরা উত্তরদের থেকে হয়তো আলাদা নয়। তা ছাড়া 'বেণু'র প্রকাশ এখান থেকেই তো হচ্ছে—যদিও বোদলে গেছে প্রেসের নাম, প্রিণ্টারের পরিচয় এবং কাগজের কভারে বিজ্ঞাপিত পূর্ব্ব সম্পাদকের আক্ষরিক অস্তিত্ব!

নতুন মালিকদের মধ্যে সুধীপদ প্রেসের কাজ জানে ভাল পার্টির আদেশে এই গোপন মানুষটি প্রেসের কর্ত্তা হয়ে দক্ষতায়

সকল কাজ চালাতে লাগলো। পুলিশের প্রথমটায় সন্দেহ না হলেও 'বেণু'র প্রকাশ ওখান থেকে অব্যাহত থাকায় তারা ও-বাড়িটা তথা প্রেসটাকে তাদের কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে দিল।...

উত্তরদের অর্থাৎ সুধীপদদের প্রেসের উল্টো দিকে এক হিন্দুস্থানীর পানের দোকান। দোকানে নানা রকমের লোক সমাগম হচ্ছে কিছুদিন ধোরে। তা ছাড়া রাস্তার মোড়ে সন্দেহজনক দু'একটি মানুষকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের নজর ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে প্রেসের উপর—সুধীপদ বোঝে। কিন্তু প্রেস-বাড়ির পেছন দিকের খালি জায়গাটা পার হয়ে যে সরু গলিপথেও দূরের বড়-রাস্তায় পৌঁছান যায়—তার খবর পুলিশ এখনো পায়-নি। কাজেই পার্টির গোপন কর্ম্মকাণ্ডের অনেক কিছুই ও-প্রেসে ঘটে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর যারা ওভারটাইম্ খাটবে এমন গুটি তিনেক কম্পোজিটার এসে পানের দোকান থেকে পান খেয়ে, বিড়ি টানতে টানতে পানওয়ালার সংগে গল্প জুড়ে দিল। গল্পের সারাংশ হলো প্রেস-মালিকের নিন্দাবাদ। দিনের কর্ম্মচারীর দল বেরিয়ে যেতেই এরা তিন জন এসে প্রেসে ঢুকলো। সুধীপদ বল্ল: খুব সাবধানে এসেছ তো?

নন্দ: খু-ব। পানওয়ালার কাছে মালিকের শ্রাদ্ধ কোরে তবে ভিতরে ঢুকেছি।

—ব্যাটা কি জিজ্ঞেস কোরল?

—জিজ্ঞেস কোরল যে রাত ক'টা অবধি কাজ হবে, ক'জন খাটবে, কি কাজ হবে, অন্য লোক কারা আসে ইত্যাদি।.. উত্তরে

বল্লাম—মালিক একটি আস্ত জানোয়াড়। খাটিয়ে খাটিয়ে লোক মেরে ফেলছে—পয়সা দেবার নাম নেই। কেউ এখানে থাকতে চায় না। কত লোক কাজের ধান্দায় আসে, আবার দুদিনেই চলে যায়। আমরা ক'জনেই কাজ চালাই। আজ কতক্ষণ খাটাবে কে জানে—ছাপার কাজ এন্তার জমে আছে।

সুধীপদ হেসে বল্ল: পুলিশের হাবভাব ভাল নয়। ও-পানওয়ালাটা নইলে কট্‌কট্ কোরে অত কথা কইত না। যাক্, শুরু কোরে দাও ভাই। আজই কম্পোজ কোরে, প্রুফ্ দেখে, মেসিনে এঁটে একেবারে ছাপিয়ে ফেলতে হবে পাঁচ হাজার প্যাম্‌ফ্লেট আর দু'হাজার পোষ্টার। তারপর রাতারাতি পার কোরে দিতে হবে সব মাল।

কুমারেশ: মেশিন চালাবে কে?

সুধীপদ: লোক আছে, ভাবনা কোরো না।

কুমারেশ, নন্দ ও হর্ষ সোৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি তিন খণ্ড কোরে কম্পোজ টেনে যেতে লাগল। কম্পোজিং সমাপ্ত কোরে বার তিনেক প্রুফ দেখার পর মেসিনে আঁটা হল ইস্তাহার। একটু পরেই দৈত্যের সামর্থ্যে মেসিন চলতে শুরু কোরল। এতগুলো ইস্তাহার ডবল্ কম্পোজে ছাপা হতে রাত বেজে গেল এগারটা।

মেসিন যখন সুধীপদ ও তার বন্ধুর হাতে চল্‌ছে, তখন কুমারেশ-নন্দ-হর্ষ পোষ্টারের 'কম্পোজ' ধোরে ফেলেছে। বারটার সময় পোষ্টারের ম্যাটার্ চেপে গেছে মেসিনের বুকে। ঘর্ঘর-ঘরাং চলল আবার মেসিন্—পোষ্টারগুলো ছেপে বার হতে রাত হয়ে গেল আড়াইটা।...

সমস্ত পোষ্টার ও লিফ্‌লেট বস্তা-বন্দী কোরে নিয়ে পেছনের গলিপথে কুমারেশ-নন্দ-হর্ষ যখন উধাও হয়ে গেছে, রাত তখন সওয়া তিনটা।…

ইস্তাহার ও পোষ্টারের পাণ্ডুলিপি ও কাটা-প্রুফ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলে এবং কম্পোজ-করা টাইপ্‌গুলো ভেঙ্গে তাদের আবার খোপেখোপে রেখে সমস্ত ছাপাখানাটিকে সন্দেহ-বিমুক্ত করার পর সুধীপদরা শুতে যাবে এমন সময় সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে।

দ্বার খুলতেই সুধীপদ দেখল যে, লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেছে রাস্তাঘাট। থানার দারোগা এবং এস্‌-বি অফিসার সুধীপদকে প্রেস তালাসি কোরবার পরোয়ানা দেখাল। সারা প্রেস ওলট-পালট কোরে-ও আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেল না! অফিসারদ্বয় নৈরাশ্যব্যঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞেস কোরলো: কাল সারা রাত কি ছেপেছেন, মশায়?

সুধীপদ স্তূপীকৃত বইয়ের ফর্মা দেখিয়ে দেয়।…অগত্যা দারোগাবৃন্দ ছাপান ফর্মা-ই খান কয়েক সংগ্রহ করে বিদায় নেয়।…

পুলিশের দল পথে বেরিয়ে বড় রাস্তায় কিছুদূরে যেতেই দেখে দেয়ালে দেয়ালে ততক্ষণে আঁটা হয়ে গেছে অজস্র ইস্তাহার। ইস্তাহারের শুরুতে লাল হরফে লিখিত: **রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা**।…

সমগ্র লেখাটি পড়তে গিয়ে দারোগার দেহ-ও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 'এস্‌-বি'-র দারোগার দিকে তাকিয়ে থানার দারোগা বলে: Splendid?…

আরো কিছুটা এগুতেই তাদের নজরে পড়ল দেয়ালে আঁটা বড় বড় পোষ্টার : Shoot him down who comes to rule, Spare him not woh robs us all. Kill Britishers like dogs in the Street.

এবার-ও থানার দারোগা মন্তব্য কোরল : এনার্কিষ্টদের পিস্তল যেন লালমুখোদের দিকেই নিশানা কোরেছে।···আমরা বেঁচে যাব হয়তো।···কি বোলছেন, দাদা ?···

কাষ্ঠ-হাস্যে 'এস্-বি'-র দারোগা কয় : পিস্তল রইল ওদের হাতে —কা'র দিকে কখন বাগিয়ে ধোরবে কি কোরে বোলব ?···

সমগ্র কোলকাতা শহর ও শহরতলির ছাত্রবহুল স্থানে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় রাতারাতি কা'রা যেন লাগিয়ে রেখে গেছে বৈপ্লবিক ইস্তাহার এবং পোষ্টার! তরুণের দল সূর্য্যোদয়ের সাথেসাথে ও-লিফ্‌লেটের ভাষা গিলে ফেলতে লাগল। ঐ অরুণদীপ্ত-গগন থেকে অগ্নিছোঁয়া রক্তশিখা যেন ঝর্ণাধারায় প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে বাঙলার তরুণ-তরুণীর ধমনিতে। তাদের রক্তে সত্যি আজ লেগে গেছে 'সর্ব্বনাশের নেশা'।··

সাত

দিব্যি ফুটফুটে চেহারার স্যুট্-পরিহিত একটি যুবক য়্যাসেম্‌ব্লি হাউসের সুমুখের রাস্তাটায় পায়চারি কোরছে। মুখে তার জ্বলন্ত সিগারেট। তখনো সন্ধ্যা ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। এমন সময় নাবিকের পোষাক পরা একটি গোরা-তরুণ সে-রাস্তায় এসে গেল। স্যুট্‌পরিহিত যুবকটি কাছে এগিয়ে নাবিককে বল্ল : Good afternoon! Just in time? How do you do?

নাবিক ভাঙ্গা ইংরাজিতে বল্ল : All right !—You ?

—Thanks. All right.

তারপর দু'জনে গটমট্ কোরে চলে এল চৌরুঙ্গির এক বিলিতী মদের দোকানে। যুবকের পয়সায় নাবিক আকণ্ঠ পূর্ণ কোরে মদ খেতেখেতে বল্ল তাকে : Are you going dry ?

যুবক হেসে বল্ল : No—I shall have Sarbat.

নাবিক ঢুলুঢুলু নয়ন তুলে একটু হেসে বল্ল : Sarbat ? Damn it. It's dry all the same.

যুবকের জন্য সরবং তখন এসে গেছে। নাবিক আরো এক গেলাস মদ উড়িয়ে দিয়ে চুর হয়ে বোসে রইল। যুবক তাড়াতাড়ি সরবৎ গিলে ফেলে নাবিককে নিয়ে বেরিয়ে এল। গড়ের মাঠে একটা বেঞ্চে দু'জনে বোসে পড়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আসল কথাবার্ত্তায় এসে গেল। স্থির হলো অবশেষে যে, সাহেব আগামী টি প্-এ এক ডজন রিভল্ভার নিয়ে আসবে যুবকের জন্যে।

নাবিককে বিদায় দিয়ে যুবক নানা পথ ঘুরে ওয়েলেস্লি স্কোয়ারে এসে ঢুকলো। স্কোয়ারের পূব কোণের বেঞ্চে একটি মুসলমান তরুণ বোসে আছে। যুবক আস্তে এসে তার-ই পাশে বোসল। মুসলমান তরুণটির পরনে হলুদবর্ণের লুঙি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির নীচে জালিকাটা গোলাপী-রঙ্গের গেঞ্জিটা স্পষ্ট দেখা যায় ; পায়ে তার সবুজ সেলিম্-স্থ, মাথায় জরিদার গোল টুপি। বোসে বোসে বিড়ি ফঁ্কছে। যুবকটি তার পাশে যেতেই চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে বল্ল : কতদূর এগুলি, সঞ্জয় ?

—এই তো দিন তিনেক ব্যাটাকে পেট ভরে মদ খাইয়ে একটি পিস্তল বাগিয়েছি আর কিছু নতুন মাল নিয়ে আসতেও রাজি করিয়েছি।...ওদের জাহাজ কাল খিদিরপুর ছেড়ে যাবে। রেঙ্গুন-সিঙ্গাপুর-যাভা-সুমাত্রা-হংকং-হাউই ঘুরে আবার ফিরে আসবে কোলকাতা। তিন মাস লাগবে নাকি ফিরে আসতে। এক ডজনের অর্ডার দিয়েছি। এর বেশি ও-ব্যাটা আনতে পারবে-না। ঠিকানা দিয়েছি—কোলকাতা এলেই খোঁজ কোরবে। এখন এলেই হয়।

—আসতে পারে হয়তো। জর্ম্মান্ সেইলারগুলো সহজে বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। আগাম কিছু দিয়েছ?

—দিতে চেয়েছিলাম। নিলে না।

—ঐটুকুই জর্ম্মান-সততা। অন্য জাত হলে টাকা-ও নিত, বিট্রে-ও কোরতো।...যাক্, এবার তুমি চলে যাও সঞ্জয়। গেটের কাছে চিনেবাদাম বিক্রি কোরছে যে-লোকটা তাকে আমার সন্দেহ হয়। ঐ গেট্ দিয়েই তুমি বেরিয়ে যেয়ো—তবে তোমার মুখ যেন ভাল কোরে লোকটা না-দেখতে পায়।

—আপনি কতক্ষণ আছেন এখানে, সুশান্তদা?

—ঠিক নেই। তোমার সংগে কাল প্রাতে দেখা হওয়া চাই। আমি-ই খবর দেব। এখন যাও।

সঞ্জয় সুশান্তর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল। দু'পা এগিয়েই সে একটি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ তরুণীর পেছন নিল। তরুণীর পাশাপাশি হয়ে একটু ধাক্কা লাগাল সে তার দেহে এবং মুহূর্ত্তে দারুণ অপরাধীর ভান কোরে হাত কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে বল্ল: So sorry! Excuse me, madam!

ম্যাডাম্ রাগভরে একটু তাকাল। সঞ্জয় ততক্ষণে পকেট থেকে গোল্ড-ফ্লেকের একটা আস্ত কৌটো বের কোরে তরুণীর হাতের কাছে এগিয়ে ধরেছে! বোলছে: Will you accept? ...Do accept, please!

তরুণী খুশী হয়েই কৌটোটি হাতে নিল এবং লুব্ধের হাস্যে বল্ল: The whole lot?

সঞ্জয়: Most gladly.

তরুণী ডিবেটি আত্মসাৎ কোরে ভঙ্গি সহকারে বল্ল: A present from the unknown friend?...Thanks, Mr.!

সঞ্জয় ততক্ষণে নিজের মুখে একটি সিগারেট নিয়ে তরুণীর ওষ্ঠে আর একটি সিগারেট লাগিয়ে দেশলাই যোগে রোশনাই জ্বেলেছে। সঞ্জয়ের চোখ দুটোয় কৌতুকের হাসি।...তারা এ-অবস্থায় গেট্ পার হয়ে ফুটপাথে এসে গেল। কয়েক পা এগিয়ে 'Good-night' বোলে তরুণীকে অভিবাদন জানিয়ে এক চল্‌তি-ট্রামে সঞ্জয় উঠে পড়ল।...চিনেবাদামওয়ালা ভাবল—দু'টি ফিরিঙ্গ যুবক-যুবতী যুগলে তার কাছ দিয়ে চলে গেল। লোকটাকে ইত্যবসরে ভাল কোরেই কিন্তু সঞ্জয় দেখে নিয়েছে। সঞ্জয়েরও যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছে-যে লোকটার মতলব ভাল নয়।...

সুশান্ত সমস্ত দৃশ্যটি পর্য্যবেক্ষণ কোরছিল। তার নির্দ্দেশই ছিল যে, লোকটাকে সন্দেহজনক মনে হলে সঞ্জয় উঠবে ট্রামে—আর নিরীহ ভাবলে চাপবে রিক্সায়।...সঞ্জয়কে ট্রামে উঠতে দেখে সুশান্ত তাই বেঞ্চ্ ত্যাগ কোরে দক্ষিণের গেটে গিয়ে দাঁড়াল। ঐ পথেই রুস্তম্ সর্দারের আসবার কথা।

রুস্তম্ আসতে বড্ড দেরি কোরছিল। সুশান্ত আর অপেক্ষা কোরতে পারে না। অলিগলি ঘুরে শেষটায় সে রুস্তমের আড্ডায় গিয়ে তাকে ধরল।

সুকের সূরকার লেন্ দিয়ে কলিন্ ষ্ট্রিট পেরিয়ে উমা দাস লেনের এক ডেন্ হলো রুস্তম্ সর্দারের আড্ডা। যতো স্মাগ্লারদের আনাগোনা এই তীর্থে! কোলকাতা শহরের যত ক্লেদ এই সব অঞ্চলেই পায়ে হেঁটে বেড়ায়। পুলিশের ব্যক্তিগত মোটা আয় এসব পল্লী থেকে নিয়তই হচ্ছে। নোংরায়-ভরা কদর্য্য এক বদ্ধ-গলির মধ্যে অতি প্রাচীন একটা একতলা বাড়ির স্যাঁতসেঁতে মেজের উপর মাদুর বিছিয়ে রুস্তম বোসে আছে। আশেপাশে কয়েকটি গুণ্ডা-শ্রেণীর ভক্ত। রুস্তমের ডেন্-এ ঢুকবার মুখে যে-বাইলেন্ সেটা কুখ্যাত এক পল্লী—মুখে রং মেখে, অদ্ভুত সাজসজ্জা কোরে দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে নিম্নশ্রেণীর পতিতার দল। সরু রাস্তাটায় তাই গুণ্ডাবদমায়েসদের জটলা—নগ্ন-কামুকতার ক্লেদক্লিন্ন ছবি।

এসব ঠেলেঠুলে, মড়া ইঁদুর ও অনেক নোংরা মাড়িয়ে সাংখ্যের পুরুষের মত সুশান্ত এসে পৌঁছল রুস্তমের ঘরে। রুস্তম তখন বোতল খানেক দেশী মদ টেনে চাঙ্গা হয়ে বোসে আছে।

সুশান্তকে দেখেই সে বল্ল: আইয়ে বড়ে মিঞা! তশ্রিফ্ ফরমাইয়ে।...তারপর একটু ইঙ্গিতেই পার্শ্বচরেরা উঠে গেল।

সুশান্ত বল্ল: বেশ লোক! ভুলেই গেছ বুঝি পার্কে দেখা করার কথা?

রুস্তম: ভুলি নাই, বাবুজি। মাল হাতে না-এলে গিয়ে কি হবে?

সুশান্ত : পাওয়া যাবে তো, সর্দার ? অতগুলো টাকা দিলাম—মেরে বোসবে-না-তো তোমার লোকগুলো ?

রুস্তম : পরশু তিন ডজন মাল আপনার পায়ের কাছে না-ফেল্লে আমি হারামী আছি।—একটু থেমে আবার বল্ল : হাঁ, ওয়েলেস্‌লির স্কোয়ারে নয়—আমার আড্ডা থেকে মাল দেব—সুবিধে হবে।

সুশান্ত : তা রাজি আছি। কিন্তু গাড়িতে তোলা পর্য্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে সংগে।

—আলবৎ থাকবো।···শুনুন বাবু—হাঁ, আমি যাদেরকে পয়সা খাইয়েছি তারা বেইমানী কোরলে আমার ব্যাব্‌সা চলবে কেন ? ···কিন্তু আপনি যে রিপন্ ষ্ট্রিটের দুখিয়ার ওস্তাদকে টাকা দিলেন, সেটা কার বুদ্ধিতে ? ওরা আপনার টাকা মেরে দেবে।

—তুমি জানলে কি কোরে আমি ওদের টাকা দিয়েছি ?

—আমি সব জানি। দুখিয়া যে-মেয়েমানুষটার কাছে যায় সেটা আমারই দলের লোক। ও বলেছে সব।

—ও মেয়েটা আমার নাম জানে নাকি ?

—নাম জানে না। তবে জানে-যে দুখিয়াকে বিশুবাবুর লোক টাকা দিয়েছে মাল কিনতে, সেই টাকার বেশীর ভাগই গচ্ছিত রয়েছে বিশুবাবুর কাছে, বাকি টাকায় (যা হাতে পড়েছে) দুখিয়া ও সে দু'দিন ধোরে মদ খেয়েছে আর হল্লা কোরেছে।

তারপর সুশান্তকে একটু ঘেঁষে বোসে বলে চল্ল সে : বিশুবাবু তো আমার কাছেও ঘোরাঘুরি করে। সে বলেছে আপনার নাম।···দুখিয়া এসেছিল দু'টো ভাঙ্গা মাল নিতে বিশুবাবুর লোক হয়ে। আমি তাকে হাঁকিয়ে দিতেই বিশুবাবু নিজে আসে।

সুশান্ত : তারপর ?

রুস্তম : তারপর বিশুবাবু এসে-ও ভাঙ্গা মাল চাইল। মাল নিয়ে কি কোরবে শুধালাম। খুব চেপে ধোরতে সে বল্ল—এক স্বদেশীবাবু তাকে নাকি পাঁচশ টাকা দিয়েছে; দুটো ভাঙ্গা মাল দশবিশ টাকায় কিনে তাকে দিয়ে দিলেই পাঁচশ টাকা মেরে দেয়া যায়, এবং সেই টাকা আমাতে ও বিশুবাবুতে আধাআধি ভাগ কোরে নিলেই হয়। বিশুবাবু আরো বল্ল-যে দুখিয়াকে যা দেবার তা সে নিজেই দিয়েছে।

সুশান্ত : তুমি কি বল্লে, সর্দার ?

রুস্তম : বল্লাম—রুস্তম খারাপ কাজ করে, ইত্‌রামি করে না।...তুমি বিশুবাবু, খিদিরপুরের ছ্যাঁচড়া সর্দারদের কাছে যাও।

সুশান্ত : কেন, খিদিরপুরের সবাই বুঝি খারাপ ?...আমাকে ওরা কিন্তু অনেক মাল দিয়েছে।

রুস্তম : রুস্তম সর্দারের সংগে তাদের তুলনা হয় না—বাবুজি তা বেশ জানেন।

সুশান্ত : তা মানি।...আচ্ছা রুস্তম, বিশুবাবু তোমাকে আমার নাম বল্ল কেন ?

রুস্তম : বেইমানী যার আদৎ, তার কাছ থেকে রুস্তম সর্দার নাম বের কোরে নেবে এতে মুস্কিল আছে নাকি ?

সুশান্ত : কি নাম বল্ল আমার ?

রুস্তম : কেন ? লাটুবাবু ?—বাঙালী-নাম আমি ভুলিনে।...

বিশুবাবু এককালে বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। তৎকালে স্মাগ্‌লারদের সংগে তাঁর যোগ ছিল। বহু দুঃসাহসী-কাজের সংগে তাঁর সংযোগ তাঁকে একদিন বিপ্লবীদের কাছে সবিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছিল।.. তারপর বহুকাল কেটে গেছে। এবার বিপ্লবীদের কাজ

শুরু হতেই বিশুবাবু অস্ত্র-সংগ্রহের ভার নিয়েছেন বোলে প্রচারিত হলো। তিনি নানা দলের নামী বিপ্লবীদের কাছ থেকে মাল দেবেন বোলে যথেষ্ট টাকা নিয়েছেন—কিন্তু ঠকিয়েছেন প্রত্যেককেই। লোকটি বর্ত্তমানে পাকা স্মাগ্‌লার হয়ে অধঃপতনের শেষ ধাপে নেবে গেছেন।…বহু পূর্ব্বে উত্তর একদিন সুশান্তকে এই বিশু চাটুজ্যের সংগে-ও 'লাটুবাবু' নামে পরিচিত করিয়ে দেয়। এবং, ছুখিয়াকে সামনে রেখে এই বিশুবাবু-ই সুশান্ত অর্থাৎ লাটুবাবুর কাছ থেকে মাসখানেক পূর্ব্বে দেড় হাজার টাকা নেন, দেড় ডজন রিভল্‌ভার দেবেন বোলে।…ঘটনাচক্রে বিশুবাবুর প্রতি উত্তর এবং সুশান্ত আস্থা হারাচ্ছিল বটে—কিন্তু টাকাটা অমন ভাবে মারা যাবে বোলে-ও ধারণা তারা কোরতে পারে-নি। কারণ, বিশুবাবুতো একদা কোনো এক দলের নেতৃস্থানীয় শুধু-যে ছিলেন তা নয়, সকল দলের কর্ম্মীদের কাছেই তখন তাঁর সম্মান-যে ছিল অটুট হয়ে!…বিশুবাবুর লোক ছুখিয়া হয়তো গোলমাল কোরতে পারে —তা' 'No risk no gain' নীতি তো মানতেই হবে। নইলে গুণ্ডাবদমায়েসদের সংগে কারবার চলবে কী কোরে?—কিন্তু বিশুবাবু? এককালে যাঁর ত্যাগ ও সাহসিকতার সীমা ছিল না—তাঁর কেন এই অধঃপতন? অবিচলিত-গর্ব্বে দাঁড়িয়েছিল যে বিরাট সৌধ, তা ধসে পড়ল কেন?…

রুস্তমের সংগে আরো কিছুক্ষণ গোপন-পরামর্শ কোরে ছদ্মবেশী সুশান্ত ডেন্ থেকে বেরিয়ে গেল।…

আট

নির্দ্দিষ্ট তারিখে সন্ধ্যার অন্ধকারে পথচারী মুসলমানের বেশে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে সুশান্ত রুস্তমের আড্ডায় এসে উপস্থিত। রুস্তমের ঘরে অন্য কোন লোক নেই। সুশান্তকে বোসতে বোলে রুস্তম পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরই সেই ঘরে সুশান্তকে সে ইসারায় ডেকে নিল। তিনটে টিনের সুট্‌কেস বোঝাই মাল। ঝক্‌ঝক কোরছে তিন ডজন আন্‌কোরা নতুন রিভলভার ও শ' পাঁচেক গুলি। লুব্ধের মত মালগুলো নেড়েচেড়ে সুশান্ত বুঝলো —জিনিস সবই উঁচুদরের। হর্ষোজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখখানা। রুস্তম গুণেগুণে তিনটি হাজার টাকা নিল—সবই এক শ' টাকার নোট। বাকি আড়াই হাজার টাকা পাবে সে মালগুলি যথাস্থানে পৌঁছলে। পাঁচশ টাকা ইতিপূর্ব্বে-ই সুশান্ত আগাম দিয়েছে নানা খরচা বাবদ।···

সুট্‌কেস তিনটি হাতে কোরে বিড়ি টান্‌তে-টান্‌তে রুস্তম ও সুশান্ত ডেন্‌ থেকে বেরুলো। সুশান্তর বুক-ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে—'সব ভাল যার শেষ ভাল'।

বন্ধ-গলিটা পার হয়ে বাই-লেনে আসতেই মুখে রঙ্‌মাখা একটা মেয়েকে ইসারা কোরলো রুস্তম। সে-মেয়েটা সুশান্তদের পাশে-পাশে চলল। সুশান্ত ভড়কে গিয়ে রুস্তমকে চাপা-কণ্ঠে প্রশ্ন করল: ওটা আবার কেন?

রুস্তম নির্ব্বিকার ভাবে বল্ল: কাজে লাগবে।···ওটা কিছু চাইলে দশ টাকার নোট একখানা ফেলে দেবেন।

উমা দাস লেন্‌ পার হয়ে প্রশস্ততর একটা রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়োয়ান রুস্তমেরই লোক। সুশান্ত গাড়িতে

উঠে বোসতেই দূর থেকে একটা পাহারাওয়ালা-পুলিশ হাঁক দিতেদিতে কাছে এসে বোল্ল: কৌন্ হ্যায়্ রে? বাকস্‌মে ক্যেয়া চীজ্?

রুস্তম আগু বেড়ে সেলাম ঠুকে জবাব দিল: আদাবরস্, পাঁড়েজি? উয় হামারা আদমি। আপনা সামানকা সাথ্ কুছ্ সাদা চীজ্' লে যাতা হ্যায়।

'শাদা চীজ' মানে কোকেন্। পাঁড়েজির তা অজানা নেই। একটু ভারিক্কী-চালে গাড়ির কাছে এসে সে বল্ল: বহুৎ আচ্ছা। আভি চলিয়ে থানা পে। সাদা চীজ্ লাল হো যায়েগী, উধর্ অপ্‌সর্‌কা লাথ্ খানেসে!—বোলেই নিজের রসিকতায় নিজেই খুশী হয়ে বিকট হেসে উঠল।

এমন সময় মুখে রঙ্‌মাখা সেই মেয়েটা ঢং কোরে সুশান্তকে বল্ল: ইয়ার্, বক্‌সিস্-তো দে দো—তামাম রাত কৌন্ রহেগী তুম্‌হারে সাথ?

সুশান্ত তাড়াতাড়ি মেয়েটার হাতে দশ টাকার একখানা নোট ফেলে দিল।

রুস্তমের ইঙ্গিতে এক গাল হেসে মেয়েটা সরে পড়লো।

পাঁড়েজি আবার হুঙ্কার দিতে যাবে এমন সময় সুশান্তকে লক্ষ্য করে রুস্তম বল্ল: ইয়ে বেওকুফ! সরকার্‌কী ইজ্জৎ নেহি রাখ্‌তে হো? উন্‌কা হাথ্‌মে ডালো নজরানা।

সুশান্ত ঘেমে উঠেছিল। কিন্তু রুস্তমের ইঙ্গিতে সে এবার পথ পেল। তাড়াতাড়ি একখানা পাঁচ টাকার নোট পাঁড়েজির হাতে সে দিতে গেল।...পাঁড়েজি উপেক্ষার সুরে মোড়লী-কণ্ঠে বল্ল: তেরী নানীকা ডুম্! তু মুজ্‌কো ক্যেয়া সমঝ্‌লিয়া?

সুশান্তর কান লাল হয়ে উঠল।…রুস্তম্ আবার ধমকে বল্ল: জান্‌ওয়াড়্! সরকারকী ইজ্জৎ তু নেহি মান্‌লেগা?

সুশান্ত এবার ফস্ কোরে দশ টাকার তিন খানা নোট পাঁড়েজির হাতে সমর্পণ কোরল। আপদ দূর হলেই সে বাঁচে।…

পাঁড়েজি নোট তিন খানা লোভাতুরের একাগ্রতায় নেড়েচেড়ে আহ্লাদিত হল। এতটা সে আশা করে নি। গদগদ-কণ্ঠে বল্ল: সেলাম, খাঁসাহেব!—তারপর গাড়োয়ানকে লক্ষ্য কোরে চেঁচিয়ে কয়: ইয়ে স্বস্তুরাকা বেটা, চালাও-না গাড়ি তুড়ন্ত্!…

'শ্বশুরের বেটা' অনুরূপ গালি ঘোড়াকে দিতেদিতে তৎপৃষ্ঠে সপাং সপাং চাবুক কষে দিল।…গাড়ি ছুটে চলল তীব্র বেগে।…

পাঁড়েজি মহানন্দে নোট-দু' খানা বুকের পকেটে গুঁজে 'সিয়া রামা ভজ্‌না চাহি' গাইতে গাইতে সুমুখের পানওয়ালীর দোকানের কাছে গিয়ে খৈনি খেতে আরম্ভ কোরল। বিগত-যৌবনা পানওয়ালীর-ও সং সাজবার সখ মেটেনি। মুখে রঙ মেখে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পানের দোকান আগলাচ্ছিল সে।…সুশান্ত চলন্ত-গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল—পাঁড়েজি ততক্ষণে পরম সুখে সেই পানওয়ালীর সংগে রসালাপ জুড়ে দিয়েছে। এবং, রুস্তম সর্দার ইতিমধ্যে অন্তর্হিত।…

পার্ক ষ্ট্রিট দিয়ে রডন্ ষ্ট্রিটের মোড়ে আসবার পূর্ব্বেই সুশান্তর আদেশে গাড়ি থেমে গেল। লুঙি ও ফেজ পরিহিত রহমান্ এবং বিনিময় কোথেকে যেন মুহূর্ত্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। তিন বন্ধুতে সুটকেস তিনটি হাতে কোরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্‌সি থামিয়ে তাতে উঠে বোসল। গাড়োয়ান রুস্তমেরই লোক। সে সুশান্তকে নামিয়ে দিয়েই তার আড্ডার

দিকে ফিরে চলল।...ট্যাক্‌সি লোয়ার সার্কুলার রোড্‌ দিয়ে ধর্ম্মতলা হয়ে ডালহৌসি ঈষ্ট্‌-এ এসে থামলো। তিন জনে গাড়ি থেকে নেবে ট্যাক্‌সিটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। দূরেই গাছের নীচে অন্ধকারে একখানা প্রাইভেট্‌ কার্‌ অবস্থান কোরছিল। সে-গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধোরে বোসে-আছে কালো-স্যুট্‌-পরিহিত সঞ্জয়। তিন বন্ধু সঞ্জয়ের গাড়িতে উঠতেই সঞ্জয় তার রথ দিল উল্কা-বেগে ছুটিয়ে। এতক্ষণে সুশান্তর সর্ব্ব শঙ্কা দূর হয়ে গেল। গঙ্গার তীরে তীরে দুর্দ্দান্ত-গতিতে ছুটে-চলা গাড়ীর মধ্যে নিশীথ-বায়ু মাথা খুঁড়ে মরছিল। চারটি বিপ্লবীর সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ হয়ে এল সেই বায়ু-স্নানে।...সুশান্তরা তাদের পোষাক বোদলে ইতিমধ্যে দিব্যি বাঙালীবাবু সেজে বোসেছে। গাড়ি এসে পৌঁছল বেহালায়, সেই খোলার বাড়িটা থেকে খানিক দূরে। ·

অরুণাদি দ্বার খুলে বোসেছিলেন। সুটকেস তিনটি হাতে বন্ধুত্রয় এসে হাজির।...সঞ্জয় মোটার নিয়ে ফিরে চলে গেছে। সেই রাতেই রুস্তমকে তার বাকি টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে।...

অরুণাদির সংগে ঘরে ঢুকেই সুশান্তরা দেখল যে, পশুপতি ও উত্তর পরম আনন্দে চানাচুর খাচ্ছেন। জ্বলন্ত ষ্টোভে চায়ের জল টগবগ কোরছে।

বন্ধুত্রয়ের মুখ দেখেই পশুপতির জানতে বাকি রইল-না যে তারা কৃতকার্য্য হয়েছে। হাসিমুখে তিনি বল্লেনঃ Congratulations !... We must have tea now.

চায়ের আসর গম্‌গম কোরে উঠল। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুশান্ত বল্ল: In honour of Rustam the Great !

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ ইতিমধ্যে শোনা হয়ে গিয়েছে। পশুপতি তাই বল্লেন: Rustam is a genius. He knows thief's honesty.

সুশান্ত: রুস্তম সত্যি বড়।

উত্তর: বড় কাজের বড় সহায়ক অন্তত।

পশুপতি: ঠিক বলেছ, ভাই।

অরুণাদি নিশ্চুপে সব কিছু শুনছিলেন। করুণ কোরে বল্লেন: ঐ মুখে-রঙ্মাখা মেয়েটার জন্যে কষ্ট হয়।...ওর সাহায্য-ই কি কম?

পশুপতি ম্লান হেসে বল্লেন: ও-জাত হলো সবার চেয়ে দুঃখী। আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা সফল হয়ে ওদেরকে-ও দেবে মুক্তি।—বোলেই ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

সবাই চুপ কোরে রইল। একটু পরে মুখ ফিরিয়ে উত্তরকে বল্লেন পশুপতি: ছাখো ভাই, জিনিসগুলো কালকের মধ্যেই ডিষ্ট্রিবিউট্ কোরে দিয়ো নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থানে।

অরুণাদি উত্তরকে বল্লেন: হ্যাঁরে উত্তর, কোলকাতার ছেলে-মেয়েদের আজকাল 'শুটিং' শেখাস কোথায়?

উত্তর: রেল্ লাইনের কাছাকাছি জন-বিরল প্রান্তরের মত জায়গা কোলকাতার আশপাশে-তো আছেই—ধরুন যেমন ঢাকুরিয়ার লেক্? ট্রেন-চলাচলের সময় সে-সব অঞ্চলেই গুলি-ছোঁড়া প্রশস্ত। ছেলেমেয়েরা ওসব স্থানেই যায় এ শিখতে।

অরুণাদি: মন্দ বুদ্ধি নয়।—একটু ভেবে নিয়ে সুটকেসের মালপত্রের পানে তাকিয়ে আবার বল্লেন তিনি: বিনিময়কে 'জিনিস'

দিয়ে দিস কিন্তু—মেদিনীপুরের ছেলেরা হাঁ কোরে বোসে আছে এর জন্যে।...

রহমন্ : দিদির ডিস্ট্রিক্ট্-পেট্রিয়টিজম্ দেখ!

কপট-গাম্ভীর্য্যে অরুণাদি : ডিস্ট্রিক্ট্-দ্রোহিতা।

সকলে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে অরুণাদির পানে তাকাল। রহমন অধিকতর উৎসাহে প্রশ্ন করল : তার মানে কি, দিদি?

—দক্ষযজ্ঞ-বিনাশী-তাণ্ডব জ্বালবি তোরা আমার জিলায়। তোদের সে-কাজে সহায়ক হোয়ে জিলার সুখদ্রোহিতা কোরছি-না, বাঁদর?

সবাই চাপা-কণ্ঠে হেসে উঠল।

নয়

পশুপতি হরিশরণ গোস্বামীর আস্তানায়ই বাস কোরছিলেন। কংগ্রেসের কাজ তাঁর ভালই চলছিল। বিপ্লবী নেতারা অনেকেই কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ করেছেন। পশুপতি-ও বাদ যান নি। বি. পি. সি. সি এবং এ. আই. সি. সি-র সদস্য-পদ তাঁকে দেয়া হয়েছে।

উত্তর প্রমুখ কর্ম্মীবৃন্দ পলাতক হলে-ও পশুপতি পলাতক হন নি। কারণ, স্থির হয়েছিল-যে পশুপতি এবার খোলাখুলি ভাবে কংগ্রেসে কাজ কোরবেন এবং সংগোপনে বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব তিনি সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখবেন। পশুপতির মধ্য দিয়ে পার্টির পরিচয় সর্ব্বসমক্ষে পরিস্ফুট হতে দেওয়া দরকার। গোপনে তাঁকে নিঃশেষ হতে দেয়া মানে এই তিরিশ বৎসরের বিপ্লবী-ইতিহাসকে হারিয়ে ফেলা। পশুপতির মধ্যেই নির্ব্বাসিত বিপুলদা এবং বিদেহী সম্পূর্ণাদেবী-

অজিত-আশু-নিরঞ্জন-সর্ব্বাণী বেঁচে আছেন। পশুপতির মধ্যেই বিপ্লবীদের আনুপূর্ব্বিক-সত্তা স্পন্দিত রয়েছে। সুতরাং কংগ্রেস-রূপী বিরাট গণসংঘের সংগে বিপ্লবীদের গোপন সংঘের যোগসেতু রক্ষার দায়িত্ব রইল পশুপতির মত বিপ্লবী নেতার উপরেই!...

পশুপতি তাই ডাক্তারি ও কংগ্রেসের কাজ কোরে যাচ্ছিলেন। ওদিকে দলের খুঁটিনাটি প্রত্যেক ব্যাপারে-ও নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর অটুট নৈপুণ্যে।...এদিকে পুলিশ এই সব কংগ্রেসী-বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ আর ভাল চোখে দেখতে পারছিল না। তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠল এবং ক্রমে তারা স্থির কোরল যে, এরা-ই বিপ্লবানুষ্ঠানগুলোর প্রাণকেন্দ্র ও প্রকৃত নেতা। সিদ্ধান্তের সঙ্গে-সঙ্গেই য়্যাক্‌শান। হঠাৎ সারা বাঙলায় ঘটা কোরে সমানে কয়েক দিন সার্চ্ হলো। বি. পি. সি. সি-র সম্পাদক আজন্ম বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, বি. পি. সি. সি-র সভ্য চিরবিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্ত্তী-পূর্ণ দাস-জীবন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আটক হলেন। কস্‌বার বাড়ি-ও পুলিশ ঘেরাও কোরলো। পশুপতি ধরা পড়লেন। ডেটিনিউ কোরে তাঁকে সরাসরি প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এই অনন্যসাধারণ কর্ম্মী ও বিচক্ষণ বিপ্লবী-নেতা ষোল বৎসর পর এইতো কিছুদিন পলাতকের পথচলা সাঙ্গ কোরে মুক্তির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—আজ তাঁকে আবার বন্দীর বন্ধনে রুদ্ধ করা হলো! বিরামহীন কর্ম্মযাত্রায় এলো ক্ষান্তি। নিঃসাড় স্থিতির মধ্যে পেলেন তিনি অর্থহীন বিশ্রাম। এই বিশ্রাম হয়তো চলবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অনির্দ্দিষ্ট কালের পরিসরে।...

পশুপতির ধরা পড়াটা আকস্মিক-ও নয়, ধারণা বহির্ভূত-ও নয়।...তবু উত্তরের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। ..অরুণাদির আস্তানায় সে বোসে আছে। এমন সময় সুশান্ত এসে তাকে বল্ল যে, অরুণাদিকে-ও ধোরবার জন্য সেণ্টারের পুলিশ নাকি ঘোরাফেরা কোরছে।

উত্তর : তা' করুক। অরুণাদির পাত্তা পাবে কি কোরে?

সুশান্ত : কেন? পশুপতিদাকে তো ধরেছে? তাঁকে অনুসরণ কোরে পুলিশের চর এ-বাড়িটার খোঁজ কোনোদিন নিয়ে রেখেছে কিনা কে জানে?

উত্তর : পশুপতিদাকে অনুসরণ কোরবে পুলিশ? হাসালে।

সুশান্ত একটু লজ্জিত হয়ে : এবার তেমন কোরে তো তিনি আত্মগোপন করেন নি—তাই বলছিলাম।

—বাড়িতে আত্মগোপন কোরে থাকেন নি, কিন্তু এসব জায়গায় আত্মগোপন কোরেই তো আসতেন?

সুশান্ত মরীয়া হয়ে-ই বলে ফেলে : তবু ওপেন্‌লি থাকার দরুন কোন মুহূর্তেই কি পুলিশ তাঁকে অনুসরণ কোরতে পারে না?

গম্ভীর হয়ে উত্তর বল্ল : না।

তারপর সামান্য হেসে উত্তর কয় : সুশান্ত, তোমরা পশুপতিদাকে কিছুই জান না। জানবার সৌভাগ্য-ও হয়-নি। He is all perfect in his own sphere! তুমি-আমি অথবা যাদের আমরা চিনি তারা সবাই তাঁর কাছে শিশু। পশুপতিদাকে যে-পুলিশ সফল অনুসরণ কোরবে, সে-পুলিশের আজো জন্ম হয় নি। তিনি নিজে ইচ্ছা কোরে ধরা না দিলে, এমন কেউ নেই যে তাঁকে ধোরবে।

সুশান্ত লজ্জায় নিশ্চুপ হয়ে রইল।

উত্তর বলে চল্ল : আর একজন লোক ছিলেন যাঁকে ধোরবার ক্ষমতা-ও কোন পুলিশেরই হয় নি। তিনি আজ স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত। তিনি এই পশুপতিদার জীবনাদর্শের প্রতীক বিপুলদা। বিপুলদাকে বুঝবার অবকাশ তোমাদের হলো কই ?

সুশান্ত : উত্তরদা, আমায় ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা করা না-করার প্রশ্ন ওঠে না। জানতে-না যাঁর সঠিক পরিচয়, তাঁকে আজ যদি চিনতে পেরে থাক তবেই সুখী হবো।

একটু চুপ কোরে থেকে উত্তর আবার বলে : পশুপতিদাকে ধরে নেবার পর আমি এখন ভাবছি—আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে কিনা। পশুপতিদাকে হারানো কাজের দিক দিয়ে বিষম ক্ষতিকর হয়েছে বলে মনে হয়। অমন কুইক্ ডিসিশান্, অমন প্রিসিশান্, অমন সেন্স্-অব্-হিউমার্ অথচ অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতা চোখে পড়ে কি ?

সুশান্ত : কিন্তু ত্রুটি থাকলে পশুপতিদা এ সিদ্ধান্ত সমর্থন কোরতেন কি ?

—না।

দু'জনে চুপ কোরে রইল।...পরে উত্তর বল্ল : দেখ শান্ত, আমাদের আর দেরি কোরলে চলবে-না। লোম্যান্-নিধনের পর তিন-তিনটে মাস পেরিয়ে গেছে—এবার দ্বিতীয় য়্যাক্শানের সময় সমাগত। তুমি আজই দীনেশ, রহমান ও বিনিময়কে সাত নং শেল্টারে নিয়ে আসবে সন্ধ্যার পর। আমরা তখন আমাদের ভবিষ্যতের প্ল্যান স্থির কোরবো। আর দুপুরে আমি বিনয়ের সংগে আলাপ কোরে রাখবো—কেমন ?

সুশান্ত : আচ্ছা।...সন্ধ্যায় একটি নতুন ছেলেকে-ও আনবো—তার সংগে আপনার পরিচয় হওয়া দরকার।...He is really brilliant—আলাপেই বুঝবেন।...

অরুণাদি ও উত্তরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুশান্ত পথে বেরিয়ে পড়ল। বেলা তখন বারটা।...

দশ

সাত নম্বর শেল্টার বরাহনগরের এক নির্জন প্রান্তে অবস্থিত। সন্ধ্যার পর উত্তর, সুশান্ত, দীনেশ, রহমন, বিনিময় এবং নবাগত এক কিশোর সেখানে একত্রিত হয়েছে।

সুশান্ত উত্তরকে বল্ল : উত্তরদা, সর্ব্বপ্রথম আমার কাজটি সেরে নিতে চাই।—বোলেই নবাগত কিশোরকে দেখিয়ে বল্ল : এর-ই নাম হলো সুধীর গুপ্ত, ডাক নাম বাদল। বিক্রমপুর বানরি-স্কুলের ছাত্র। পোষ্ট আপিসের টাকা লুট, টেলিগ্রাফের তার কাটা এবং আরো কতগুলো কেস্-এ পুলিশের ওয়ারেণ্ট ও-অঞ্চলের ছেলেদের পেছন পেছন ঘুরছে বোলে ওরা 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' চলে গেছে।...বাদল ওখানকার বেঙ্গলভলাণ্টিয়ার্স্-এর অফিসার-ইন্-চার্জ। ও হলো লেফটেনাণ্ট্।

উত্তর সস্নেহে বাদলকে কাছে টেনে নিয়ে বল্ল : ঐ সুধীর নামটি থাক সুধীজনদের জন্যে; বিপ্লবের দূত তুমি—তুমি এসো 'বাদলে'র বেশে। কেমন?

বাদলের খুব ভাল লাগল কথাগুলি। এমন কথা সে যেন শোনে নি কোনদিন। নতুন লাগছে সব। নতুন লাগছে

কোলকাতা সহর—নতুন এর আণ্ডার-গ্রাউণ্ড্-বিপ্লবীজগৎ—নতুন সমস্ত দাদারা।

হাস্যোজ্জ্বল-নয়নে বাদল উত্তর দেয়ঃ বাদল নামেই সবাই আমাকে ডাকে।

বেশ।—বোলেই উত্তর এবার অপর সকলের পানে তাকিয়ে বোলে চল্ল: ছাখো, আমাদের আলোচনা শুরু হবার পূর্ব্বে একটি কথা জানান দরকার যে, আজকে আমাদের যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেখানে বিনয়কে আমি অনায়াসে রিপ্রেজেণ্ট্ কোরতে পারবো। কারণ, আমি বিনয়ের সংগে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ভাল কোরে কথা কয়ে এসেছি।...যাক্, এবার প্রসঙ্গ শুরু হোক।

সুশান্ত: রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ লোক পাঠিয়েছিলাম। সমস্ত আপিসগুলো, সেই সব আপিসে ঢুকবার ও বেরুবার রাস্তা ইত্যাদির যাবতীয় সন্ধান নিয়ে এসে তারা একটা নক্সা তৈয়ের কোরে দিয়েছে।

নক্সাটা সর্ব্বসমক্ষে স্থাপিত কোরে সুশান্ত আবার বলে চল্ল: বাঙলার গভর্ণমেণ্টের দুর্গ ঐ রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ আক্রমণ কোরে, কর্ণেল সিম্প্সন্‌কে উড়িয়ে দিয়ে, বিভাগীয় সেক্রেটারিগুলোর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবার এ-প্ল্যান সবাই পছন্দ কোরেছে।

উত্তর: বিনয়ের মত-ও অনুরূপ। বিনয় বলে—গোটা রাজনৈতিক-বাঙলা আজ জেলে অবরুদ্ধ। শৃঙ্খলপরা সেই বাঙলাকে লাঠিপেটা ও বেটন্‌পেটা কোরবার যে-ষড়যন্ত্র চলছে জেলেজেলে, তার মূলে গভর্ণমেণ্টের প্রতীক হয়ে রয়েছে কারাগারের ইন্সপেক্টর-জেনারেল্ সিম্প্সন্। অধিকন্তু সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে

আলীপুর জেলে যে-বর্ব্বর মার দেয়া হয়েছে তার মূলে-ও ঐ সিম্প্‌সন্। 'আই-এম্-এস্'-কুলদীপ সিম্প্‌সনকে তাই শাস্তি গ্রহণ কোরতে হবে সর্ব্বপ্রথম। তৎপর প্রত্যেকগুলি বিভাগীয় সেক্রেটারি তথা আই-সি-এস্ গোষ্ঠীর দপ্তরগুলোয় পরপর ঢুকে কর্ত্তাদের পেট ফুটো কোরে দিয়ে 'সেক্রেটারিয়েট রেইড্'-এর প্ল্যানকে কোরতে হবে সম্পূর্ণ।

দীনেশ : এ-প্ল্যান আমার আরো ভাল লাগে এই জন্যে যে, এবার মেরে পালিয়ে আসা নয়—এবার সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেবার সুযোগও থাকলো নিঃসংশয়ে।

উত্তর : আমাদের এ-কাজটির উদ্দেশ্য ত্রিবিধ। প্রথম—দেশের নেতা ও সংখ্যাহীন কর্ম্মীদের শেকল-পরিয়ে ভীরুর মতো যারা নিয়ত লাঠিপেটা কোরছে, এবং সমগ্র দেশ জুড়ে সর্ব্বাধিক শোষণ ও নিষ্পেষণের ব্যবস্থা যাদের দ্বারাই হচ্ছে, ব্রিটিশ-ব্যুরোক্রেশীর প্রতীকরূপী সেই সব কর্ত্তাদের উড়িয়ে দেয়া; দ্বিতীয়—যারা মারতে যায় তারা মরতে-ও যায়, পেছন থেকেই শুধু মারে না, সম্মুখ-যুদ্ধে মেরেকেটে বীরের মত তারা আপন জীবন-ও নিঃশেষে দিয়ে দেয়—এই আদর্শ তুলে ধরা; তৃতীয়—গভর্ণমেন্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্গে দিনেদুপুরে ঢুকে তার মর্ম্মে আঘাত কোরে জানিয়ে দেওয়া যে, তার ধ্বংসে পড়ার ক্ষণ আগত।

রহমন : পুলিশের বড় কর্ত্তাতো খতম হয়েছে—এবার অন্যান্য বিভাগীয় কর্ত্তাগুলোর চোখে শর্ষে ফুল দেখাতে পারলেই দেশের লোক বিশ্বাস কোরবে-যে তারা কেবল শাসিত হতেই জন্মায় নি।

উত্তর : ঠিক ধরেছ, ভাই।

সুশান্ত : সংগে পটাশিয়াম্-সায়োনাইড্ নেবার কথা পশুপতিদা বোলেছিলেন এক দিন—আপনার মনে আছে, উত্তরদা?

উত্তর : হাঁ, পশুপতিদার মতে—ফিরে-আসবার কিছুমাত্র সম্বল না-রেখে শেষ হয়ে যাবার ব্যবস্থা যে-বীর যতো নিখুঁত ভাবে কোরবে, তার কাজ হবে ততো বেশি সফল।...তা ছাড়া ঐ মামলামোকদ্দমা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, জেল ইত্যাদির আশ্রয়ে আমাদের লাভ নেই—লাভ গভর্ণমেণ্টের।

দীনেশ : অদ্ভুত সত্য কথা।...ইংরেজ আমার বিচার কোরবে —intolerable!...কাজ কোরবো—কাজ খতম হলে নিজেকে খতম কোরে দিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দেব। ব্যস্।

উত্তর : বেশ। তা হলে 'রাইটাস্ রেইড্-এ' যারা যাবে তাদের সংগে থাকবে সায়োনাইড্। বিনয়ের-ও এই মত। দীনেশ-সুশান্ত-রহমন্ বিনিময়েরও একই মত দেখছি। বাদল কি বলে?

বাদল : আমরা সৈনিক—হুকুম তামিল করবো, দাদা।

উত্তর : হুকুম যখন আসবে তখন সৈনিকের ধর্ম্ম পালন কোরবে। কিন্তু হুকুম তৈরি হবার কালে জেনেবুঝে মত দেবে বই কি।

দীনেশ : কে কে যাবে এ-কাজে?

উত্তর : তিন জন যাবে। তন্মধ্যে বিনয় 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়াস্'-এর সিনিয়র্ অফিসার হিসাবে যাবেন ইন্-চার্জ হয়ে।

রহমন : আর দু'জন কে?

উত্তর : পরে শুনবে তাদের নাম।...সময়-তারিখও জানবে পরে।

দীনেশ (শুকনো মুখে): আমায় বাদ দিলেন নাকি?... আমি যাবো-ই এবার।

উত্তর: সহাস্যে দীনেশের পিঠ চাপড়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্ল: সবাইতো যাত্রী—দু'দিন আগে আর পিছে।—তারপর সুশান্তকে বল্ল: কাল প্রাতে দেখা কোরো, শান্ত।...এখন সবাই ভেগে পড়।...

ষড়যন্ত্র-সভা ভঙ্গ হল।

এগার

বেহালার খোলার বাড়িতে পরদিন সকালে সুশান্ত গিয়ে উপস্থিত হলো। উত্তর বোসেবোসে চা খাচ্ছিল। সুশান্ত পৌঁছতেই অরুণাদি তাকে এক গেলাস সরবত এনে দিলেন। সুশান্তর চা চলতো-না—কাজেই তার আসবার সময়-জানা থাকলে অরুণাদি সরবৎ কোরে রাখতেন।

উত্তর: শোনো শান্ত, আগামী কাল ৮ই ডিসেম্বর। বিপ্লবের ইতিহাসে ১৯৩০ সাল স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বৎসরের বিদায়-ক্ষণে তাকে আরো স্মরণীয় কোরে তোলো। বৎসর-অন্তের ঐ ৮ই ডিসেম্বরই হোক আমাদের আগামী য়্যাক্‌শানের তারিখ। কি বল?

সুশান্ত: খুব ভাল। সবাই তৈয়ের। Let us strike tomorrow.

উত্তর: দীনেশ, বাদল, বিনয়—এই তিনটিতেই যাবে তা হলে?...Wonderful combination—নয় কি?

সুশান্ত: Simply wonderful!

উত্তর ঃ ওদের স্যুট্‌গুলো পেয়েছ কি ?

সুশান্ত ঃ হাঁ, কাল রাত্তিরে আনিয়েছি। কম্‌প্লিট্‌ স্যুট্‌—খুব দামী।

উত্তর ঃ দাম না-দিলে দামী কাজ-ও হয় না।···যাক্‌, শোনো, কাল ঠিক পৌনে এগারটায় দীনেশ ও বাদলকে নিয়ে তুমি এসো খিদিরপুর, পাইপ্‌ রোডের মাথায়। আমি তার পাঁচ মিনিট পর ওখানে পৌঁছে দেব বিনয়কে। তারপর ওরা তিনজনে একত্র হয়ে চলে যাবে য়্যাক্‌শান কোরতে।··

সুশান্ত ঃ আচ্ছা, এখন চলি তা হলে।

উত্তর সুশান্তকে বিদায় দিয়ে 'রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌' সংক্রান্ত নক্সাটি নিয়ে বোসল।···অরুণাদি দূরে বোসে দুটো রিভলভার পরিষ্কার কোরছিলেন। একটি কথা-ও এতাবৎ বলেন-নি তিনি।···

বার

মেটিয়াবুরুজের শেল্টারে বিনয়ের এক মাস কাল কেটে গেল। এই এক মাসে বাড়ির কর্ত্তা, গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের সংগে বিনয়ের যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার তুলনা নেই।···আজ মেটিয়াবুরুজের বাসায় বিষাদের ছায়া। সারা রাত দাদা ও বৌদির (বাড়ির কর্ত্তা ও গৃহিণী) ঘুম হয় নি। তাঁদের মন অশান্ত। রাত্রি প্রভাত হলেই যে-দিনটির উদয় হবে, সেই দিনেই তাঁদের গৃহাগত কিশোর-দেবতা নেবে চির-বিদায়! এ-সংবাদ দু'জনেই জেনেছেন। এই কিশোরের এ-যাওয়া তো দু'দিনের তরে যাওয়া নয়, এযে সর্ব্বকালের তরে এই পৃথিবীর ধূলিকে ত্যাগ কোরে চলে-যাওয়া।···

ভোর হতেই বৌদি রান্নার যোগাড়ে লেগে গেলেন। তাঁর সর্ব্ব সত্ত্বা দিয়ে আজ তেমন রান্না রাঁধবার কামনা জেগেছে, যে-রান্না সেই কিশোরের ভোগে লাগবে যে-কিশোর চির যুগের, চির জন্মের।...

বেলা সাতটা বাজতে বৌদি গিয়ে বিনয়কে ডাকলেন। অচৈতন্য হয়ে বিনয় তখনো ঘুমুচ্ছে। মশারি তুলে, আস্তে-আস্তে মাথায় হাত বুলতে-বুলতে বৌদি বল্লেন : বিনয়ভাই, ওঠো লক্ষ্মীটি—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে আব্দারের সুরে বিনয় বল্ল : ইস্, কাঁচা ঘুমে তুলে দিলেন, বৌদি!...কই, চা দিন?—বোলেই হাতখানা বাড়িয়ে দিল।...

—কাঁচা ঘুম? সাতটা বাজে-যে, ভাই? চা হাতেহাতে নয়—পাতে বোসে খাবে।

—মোটে দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, কাঁচা ঘুম নয়তো কি?

—আচ্ছা ওঠো এবার। হাতমুখ ধোও। খাবার তৈয়ের।...

আজ ৮ই ডিসেম্বার। আজ বিনয়ের মৃত্যুবরণ-দিবস। কিন্তু বিনয়ের কোন চঞ্চলতা নেই। সাতটার সময় গভীর নিদ্রা থেকে উঠে, চোখেমুখে একটু জল দিয়ে, এক প্লেট লুচি-তরকারী-মিষ্টি এবং দুই কাপ চা খেয়ে, ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে সে হৈচৈ শুরু করে দিল।...তারপর দাঁড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, দিব্যি শান্ত ছেলেটির মত এসে দাদা-বৌদির পাশে বোসে যখন সে গল্প শুরু কোরে দিল—তখন কে বুঝবে-যে এই ছেলে দু'ঘণ্টা পর মৃত্যুর কালো-গহ্বরের দ্বার খুলে পথ চলবে মৃত্যুহীনের জ্যোতিলিখাটুকু ভালো পরবার জন্যে।...

ন'টা বাজতেই উত্তর এসে উপস্থিত। বিনয়কে নিয়ে যাবে সে পাইপ্ রোডের মোড়ে।

বিনয় তার উত্তরদাকে দেখে খুশী হল। উত্তর বিনয়কে সহাস্তে মৌন-সম্ভাষণ জানিয়ে বৌদিকে প্রশ্ন কোরল: রান্না হয়ে গেছে, বৌদি?

বৌদি বল্লেন: হ্যাঁ, ভাই।

...দু'খানা আসন পেতে উত্তর ও বিনয়কে খাওয়াতে বসালেন বৌদি। বৌদির খাওয়ান-পর্ব্ব শুরু হলো অপূর্ব্ব মমতা ও নিষ্ঠায়।

অজস্র পদ রান্না করেছেন বৌদি। সমগ্র তপস্যা ঢেলে এই রান্নার আয়োজন চলছে কাল থেকে। চলে যাবার পূর্ব্বে জাতির যৌবন-দেবতাকে পরিতৃপ্ত কোরে তুলবার বাসনা বৌদির মধ্যেকার সেই মানুষটির, যে-মানুষের মধ্যে বিরাজিত রয়েছেন জাতির জননী। খুঁটেখুঁটে তাই সমগ্র স্নেহসিক্ত তাঁর প্রত্যেকটি রান্না দিয়ে খাওয়াতে হবে বিনয়কে।...

বিনয় ধীরে ধীরে পরম তৃপ্তিতে সব কিছু চেটেপুটে খায়। তারপর বলে: আর নয়। বেশি খেয়ে কি দৌড়ঝাঁপ করা চলে?...

—এইটুকু খাও, ভাই। বোলেই গোটাকয়েক মিষ্টান্ন ও খানিকটা রাব্ড়ি ঢেলে দেন বৌদি বিনয়ের পাতে।

বিনয় 'এই সেরেছে' বোলে তা আস্তে আস্তে খেতে আরম্ভ কোরে বল্ল: উত্তরদা, বৌদির হাত থেকে বাঁচান—নইলে আমি ঢোল হয়ে যাবো।...

দাদা অর্থাৎ বাড়ির কর্ত্তা ও উত্তরের অনুরোধে বৌদি নিরস্ত হন। বিনয় অব্যাহিত পায়।...

আহারান্তে একটু বিশ্রাম কোরে স্যুট্-পরিহিত বিনয় যখন এসে বৌদির কাছে দাঁড়াল, তখন তিনি চোখে জল রাখতে পারলেন না।···বিনয়ের ওষ্ঠে মধুর হাসি-রেখা, মুখে বিমল দ্যুতি, নয়নে সুদূরের ধেয়ান।···

বিনয় বলে : বৌদি, হাসিমুখে সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাবার নিয়ম মানতে হয়—কারণ, আপনি আমার সম্পূর্ণাদির স্বজাতীয়া, আমার সর্ব্বাণী বোনের বৌদিদি।···

দাদা বল্লেন : চোখ মোছ। জল ফেলবে ভবিষ্যতে। এখন আশীর্ব্বাদ করো তরুণের জয়যাত্রাকে।···

বৌদি চোখ দু'টি মুছে বিনয়কে আশীর্ব্বাদ কোরলেন। বিনয় বৌদিকে প্রণাম কোরে দাদা ও উত্তরকে প্রণাম কোরল।···

বিনয়ের সর্ব্বাঙ্গে দামী স্যুট্। বুকে জাতীয়-পতাকার ব্যাজ্। পকেটে লুক্কায়িত গুলিভরা রিভল্‌ভার ও সায়োনাইডের ফাইল্।···

তরুণ-বীরের বেশে বিশ্বজয়ের যাত্রায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে দাঁড়িয়ে আছে বিনয়। বৌদি, দাদা ও উত্তর মুগ্ধ-নয়নে তাকে দেখছেন। চোখ ফেরান দায়।···

তের

নিউ পার্ক ষ্ট্রিটে (বর্ত্তমানে 'জলযোগ' যে-বাড়িতে অবস্থিত) সুশান্তর আড্ডা। বাড়িটা দোতলা। পুলিশের নজরে এখনো পড়ে নি। সুশান্তর ঘরে খান কয়েক চেয়ার ও একটা টেবিল। তক্তাপোষে কম্বলের বিছানা।

তখন ভোর ন'টা। জানলা দিয়ে এক ঝলক রৌদ্রালোক এসে পড়েছে মেজেতে। দীনেশ ও বাদল আন্‌কোরা নতুন

সাহেববাড়ির স্যুট্ পরে বসে আছে। খাওয়া দাওয়া সেরে তারা এসেছে এখানে সাড়ে আটটায়। তারপর পরেছে রণসাজ স্বাস্থ্যপূর্ণ উজ্জ্বল তারুণ্য তাদের সর্ব্ব অবয়বে। ছোট্ট জাতীয়-পতাকা বুকে আঁটা। পকেটে গুলিভরা পিস্তল, সায়োনাইডের ফাইল্। মৃত্যু তাদের পায়ের তলায় ভৃত্যের মত পড়ে আছে নবজন্মের তীর্থযাত্রায় তারা প্রবুদ্ধ।

ওষ্ঠে মধুর হাস্য, কিশোর বাদল শুনছে দীনেশের আবৃত্তি। দীনেশ রবীন্দ্রভক্ত ও সুসাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা তার কণ্ঠস্থ। যাবার পূর্ব্বে সে আবৃত্তি কোরে যাচ্ছে সকল চৈতন্যকে ধ্যানমুগ্ধ কোরে—"এবার ফিরাও মোরে"। বাদল শুনছে সে-আবৃত্তি তন্ময় হয়ে।...

তক্তাপোষে বোসেছিল সুশান্ত। তার চোখ দুটিতে উদাস দৃষ্টি।...বন্ধুরা চলছে সেই মহান্ মৃত্যুকে বরণ কোরতে, যে-মৃত্যু বীরের কাম্য, স্বাধীনতার সৈনিকের আরাধনার ধন।...

যথা সময়ে ট্যাক্‌সি কোরে তিন বন্ধু পার্ক স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বেরুলো।...পাইপ্‌ রোডের মোড়ে এসে পৌঁছল তারা ঠিক পৌনে এগারটায়।...দীনেশ ও বাদল মোড়েই পায়চারি কোরছে অদূরে অপর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুশান্ত।...ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আর একটি ট্যাক্‌সিতে উত্তর ও বিনয় এসে নাবল। বিনয় অপেক্ষ্যমাণ দীনেশ-বাদলের সংগে গিয়ে মিলিত হল। উত্তর দূরে দাঁড়িয়ে দেখল যে, তারা মিনিট খানেকের মধ্যেই চলন্ত একটা ট্যাক্‌সি থামিয়ে তাতে উঠে বসল। উল্কাবেগে বীরত্রয়ীকে নিয়ে ট্যাক্‌সি উত্তর ও সুশান্তর দৃষ্টিপরিসর থেকে উধাও হলো। উত্তর ও সুশান্ত বন্ধুদেরকে বিদায় দিয়ে চলে গেল জু'তে।...

মতি মল্লিক

(দেওভোগ গুলিচালনা মামলায় শহীদ)

তাদের যে-লোক লালদীঘিতে অপেক্ষা কোরছিল রাইটার্স্-এর খবর সংগ্রহার্থে, তাকে বলা ছিল যে, কাজ সাঙ্গ হলে সংবাদ জানাতে হবে ঐ জু'তে এসে উত্তরদা ও সুশান্তকে।...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

৮ই ডিসেম্বার। ১৯৩০ সাল।...

'বেঙ্গল ভলান্টিয়াসে'র মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত, লেফ্‌টেনান্ট্ সুধীর ওরফে বাদল গুপ্ত ট্যাক্‌সি থেকে নেবেই গট্‌মট্ কোরে রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর দ্বিতলে উঠে গেল।...দ্বিতলে উঠে তারা ঢুকে গেল কারাগারের ইন্স্‌পেক্টর-জেনারেল্ কর্ণেল সিম্প্‌সনের আপিস-ঘরে। ঘরে সিম্পসন ছাড়া তাঁর পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট্ উপস্থিত ছিলেন। টেবিলে বোসে সিম্প্‌সন্ কাজ কোরছেন এবং পি.এ ফাইল এগিয়ে দিচ্ছেন। তিন বন্ধু ঘরে ঢুকেই মিলিটারি কায়দায় যথাযোগ্য স্থান নিলো। বিনয় মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না কোরে হুকুম দিল : Fire !...

পরপর ছ'টা গুলি ছুটে এসে কর্ণেলকে বিদ্ধস্ত কোরে ধুলায় গড়িয়ে দিল। বিনয় তাকে নাড়া দিয়ে দেখে নিল যে তার জীবন তখনো আছে কিনা। কিন্তু কর্ণেল তার বহু পূর্ব্বেই ধরণীর মায়া ত্যাগ কোরে চলে গেছেন। পার্সোন্যাল্ এসিস্ট্যান্ট চোখে সর্ষেফুল দেখছিলেন। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে-দৃশ্য তিনি দেখলেন তার স্বপ্ন-ও তিনি কোন কালে কল্পনা

করেন নি। কাঁপতে-থাকা তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ভয়ের ভূকম্প নাছোড়-বান্দা হয়ে কতক্ষণ ছিল তা তিনি-ও হয়তো জানেন-না।...

তারপর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর দ্বিতলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের প্রায় সকল আপিসেই বীরত্রয় হানা দেয়। অকল্পনীয় এই দুঃসাহসিক-কাণ্ডে সরকারের শাসন-কেন্দ্র টল্‌মল কোরতে থাকে। শ্বেত-কর্ম্মচারীদের কী সে দুরবস্থা! ভীতিত্রস্ততায় পাগলের মত ছুটাছুটি কোরে প্রাণরক্ষার্থে তাদের কী সে ব্যস্ততা! তিনটি যুবকের আগুন-ছোঁয়া-স্বপ্ন মূর্ত্তি ধারণ কোরে তখন প্রলয়-নৃত্যে নেচে উঠেছে। জুডিশিয়াল্ সেক্রেটারি নেল্‌সন, সেক্রেটারি ট্যুয়নাম্ প্রমুখ আই-সি-এস্ বীরগণ আহত হলেন। আমেরিকান পাদ্রী জন্‌সন সাহেব মুক্তকচ্ছ-পলাতকের ক্ষিপ্রতায় লোহার পাইপ বেয়ে হুড়হুড় কোরে এক তলায় নেবে দৌড়ে বাঁচলেন! এত বড় বিপদ দিনেদুপুরে ডালহৌসি স্কোয়ারের গভর্ণমেণ্ট-দুর্গে সাহেবদের উপর অনাহত-দুর্দ্ধর্ষতায় বর্ষিত হবে—ইংরেজ এ-কথা ভাববে কি কোরে? কিন্তু বিপদ যখন সত্যি এলো তখন এই বীরপুঙ্গবদের এলোপাথাড়ি দৌড় ভারতীয় কেরানীকুলকে যথার্থই পরিতৃপ্ত করেছিল। রাইটার্স-এ তারা চিরকাল সাহেবের বুটের তলায় স্থান পেয়ে এসেছে—আজ তাদেরই জাতির বংশধর তিনটি তরুণের বুটের আঘাতে সমগ্র সাহেবগোষ্ঠী ভূলুণ্ঠিত!...

ইতিমধ্যে বিপুল পুলিশবাহিনী ডালহৌসি স্কোয়ার ছেয়ে ফেলেছে। রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল ক্রেগ, পুলিশ কমিশনার টেগার্ট, ডেপুটি কমিশনার গর্ডন্-এর নেতৃত্বে রাইফেল্‌ধারী পুলিশের দল ঢুকে গেছে। বিনয়-দীনেশ-বাদল

তখন পাসপোর্ট-আপিস আক্রমণ করেছে। পুলিশ-বাহিনী মুহূর্ত্তে তাদের সম্মুখে এসে মিলিটারী-রীতিতে স্থান নিয়ে ফেল্ল।...

বিনয়ের নেতৃত্বে 'লাইইং ডাউন্' তারা-ও পজিশনে পিস্তল বাগিয়ে দ্রাম্-দ্রাম্ গুলি ছোঁড়া শুরু কোরলো। স্বল্পমাত্র-শস্ত্র-সজ্জিত তরুণ তিনটির যুদ্ধকাল ক্ষণস্থায়ী হলেও দুর্দ্ধর্ষতায় সে-যুদ্ধ সামান্য ছিল-না। এই যুদ্ধের রূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে ষ্টেট্সম্যান পত্রিকা তৎকালে এর নাম দিয়েছিলেন "Verandah Battle"!...

দীনেশ গুপ্তর পিঠের বাঁ-দিকটা পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হলো। দুর্জয় দীনেশ তবু গুলিবর্ষণে তৎপর।..ক্রমে তাদের তিন জনেরই গুলি প্রায় ফুরিয়ে এল। তখন বন্ধুত্রয় সারবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে বারে বারে হুংকার দিলো—'বন্দেমাতরম্'!—সমগ্র রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ কেঁপে উঠলো। সেই কাঁপন রাস্তা পেরিয়ে, স্কোয়ারের পুকুর-ভরা জল ছুঁয়ে দূরান্তে মিলিয়ে গেল! অবিলম্বে বিনয় বসুর আদেশে তিনজনেই 'ইচ্ছা-মৃত্যু'র অধিকারীর গৌরবে গ্রহণ কোরলো সায়োনাইড্। লেফ্টেনান্ট বাদল তৎক্ষণাৎ অমর মৃত্যুর গভীর অতলে পড়ল ঢলে। ক্যাপটেন্ দীনেশ এবং দলপতি বিনয় বিষ খাবার সাথেসাথেই স্বহস্তে নিজেদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার দুর্দ্দান্ত অভিপ্রায়ে ব্যবহার করল নিজেদের রিভল্ভারের-ই শেষ গুলি। বিষ আর এদের পাকস্থলীতে যেতে পারল না। গুলির আঘাতে উভয়েরই বমি হয়ে গেল। এবং নিমিষে তারা মাটির বুকে ঢলে পড়লো।...

বীরবৃন্দের দেহ মেজেতে রয়েছে গড়িয়ে। রিভল্ভার্ তাদের হাতে থাকলেও গুলিশূন্য। দেহ বুঝি প্রাণশূন্য!...পুলিশের বড় কর্ত্তারা ততক্ষণে (হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে অবস্থা অনুধাবন করে)

বীরদর্পে মৃতপ্রায় দেহ ক'টিকে বন্দী কোরলো!···বাদলের প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেল, বিনয় ও দীনেশের নাড়ী তখনো নিঃসাড় নয়। সায়োনাইড্ পেটে যায় নি বোলেই গুলির আঘাতে অচৈতন্য হয়ে গেলে-ও জীবনদীপ এদের নিভে যায় নি।··· পুলিশ নাড়ী দেখতে জানে। বিনয়-দীনেশের নাড়ী তখনো অচল নয় বুঝেই তারা তৎপর হয়ে উঠল এদেরকে বাঁচানর জন্যে।···

বাদলের মৃতদেহ পুলিশের হেপাজতে চলে গেল আই-বি-আপিসে। কে এই তরুণ, কি তার নাম—এ সবকিছুরই খোঁজ নিতে হবে পুলিশকে।···বিনয় ও দীনেশের স্থান হলো পুলিশ হেপাজতে মেডিকেল্ কলেজ হাসপাতালে। রাজার হালে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রাজ-নৈতিক বুদ্ধি ও রুচি বিশিষ্টতর। এবং সে-জন্যই ইংরেজ গভর্ণমেন্ট চাইলেন এই তরুণদ্বয়কে যেকোন প্রকারে প্রাণদান কোরে এক বিচার প্রহসনে এদেরকে দোষী সাব্যস্ত কোরতে। তারপর আইনের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে এদের হত্যা ঘটিয়ে প্রমাণ কোরবেন গভর্ণমেন্ট যে, দেশের আইন দেশদ্রোহীদের দিয়েছে সাজা!···

*　　*

*

জু'তে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে অপেক্ষা কোরছিল উত্তর ও সুশান্ত।

যথাসময়ে সংবাদ এল য়্যাক্শানের। খুশী হয়ে উঠল উভয়ে। সেই খুশীর অজস্রতার ফাঁকে অলক্ষ্যে ঘনাল বেদনার একটু মেঘ! স্তব্ধের মত কিছুক্ষণ বোসে রইল উত্তর ও সুশান্ত। তারা ভাবে—যাঁরা তাঁদের একান্ততম হয়ে পাশে ছিলেন সামান্য পূর্ব্বে-ও, তাঁরা

এখন আকাশ-পৃথিবীর সীমান্ত পেরিয়ে কোথায় গেলেন চলে। কবে দেখা হবে আবার তাঁদের সংগে? কবে শহিদের মৃত্যুকে বরণ কোরে তাদের-ও যাত্রা চিহ্নিত হবে সেই লোকে যেখানে বন্ধুত্রয়ের অক্ষয় বসতি?…

উত্তর ও সুশান্তর জিজ্ঞাসা সঘন হয়ে আসে।…

বোসে থাকবার সময় কর্ম্মীর নেই।…দু'জনে উঠে পড়ে।… তারা যাবে এখন পনর নং শেল্টারে।…

দুই

বাদল গুপ্ত অমর মৃত্যুকে স্পর্শ কোরেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর দেহ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলল। মৃতদেহ সনাক্ত না হলে ইংরেজ তো জানতেই পারছে-না কে এই শত্রু! কাজেই সনাক্তকরণের চেষ্টা তীব্রতর হলো। তিন দিন পর অনেক খুঁজেপেতে বাদলের কাকাকে আনান হলো। তিনি চিনলেন ভাইপোকে। অজ্ঞাত-বিপ্লবীর নাম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেল। সবাই জানলো যে, 'অলিন্দ-যুদ্ধে'র তৃতীয় বীর হলেন শহিদ বাদল (সুধীর) গুপ্ত, বাড়ি তাঁর ঢাকা জিলার বিক্রমপুরস্থ বানরি গ্রামে। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র এই কিশোর অফিসার মহোত্তম-কর্ম্মীর ব্রতে "Unhonoured, unwept, unsung" হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন! কিন্তু তা হলো না। তাঁর অজ্ঞাতে তিনি মাল্যবিভূষিত হয়ে গেলেন দেশবাসীর মানসপটে। পুলিশ-হেপাজতে সংগোপনে তাঁর মৃতদেহ নিমতলাঘাটে অগ্নিদগ্ধ হলেও কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেল সে সংবাদ। আপামর নরনারী তাঁর উদ্দেশ্যে

জানালো সম্মান, ফেল্ল অশ্রুজল, গাইলো জয়গান। সেই জয়গান, শুধু এ-দেশে নয়, দেশ ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে সকল পরাধীন-জাতির তরুণ-কণ্ঠেই গীত হয়ে আসবে চিরকাল।...

তিন

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আলাদা কোরে রাখা হয়েছে বিনয়কে পুলিশের কড়া পাহারায়। মৃত্যুযাত্রী-রোগী বিনয় হাসপাতালের পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় শয্যায় শায়িত। যমে-মানুষে লড়াই চলছে তাকে বাঁচবার জন্যে। আপন হস্তে যে-গুলি করেছিল বিনয়, তা তার মাথার ডান দিক থেকে বিদ্ধ হয়ে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ পরান। ডান হাতখানাও ব্যাণ্ডেজ-করা। রাইটার্স-এর যুদ্ধে বিনয় যখন ধরাশায়ী, তখনই মৃতপ্রায় বিনয়ের উপর প্রতিহিংসা নেবার আগ্রহে বুটের চাপে হাতখানা তার থেঁত্‌লে দিতে দিতে পুলিশের বড়কর্ত্তা প্রশ্ন কোরছিল কোত্থেকে সে এসেছে, কোথায় ছিল সে এতকাল!...কিন্তু অমানুষিক অত্যাচার যতোই হোক না কেন, বিনয়ের হাতখানা যতোই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক না কেন—পুলিশ যা জানতে চেয়েছিল তা অর্দ্ধচেতন এই বীরের কাছ থেকে বার হলো না। যন্ত্রণাক্লিষ্ট ওষ্ঠে শুধুই একটু কৌতুকের আভাস।...সত্যিতো এ এক নির্লজ্জ কাপুরুষতার লক্ষণ—যা শোভা পায় না অমন শক্তিশালী ইংরেজ শাসকদের আচরণে। পলাতক বিনয়কে ধরে দেবার জন্যে ঢাকা ও সেণ্টার্ থেকে বাঙলার পুলিশ পাঁচ-পাঁচ হাজার কোরে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল; কিন্তু ব্যর্থ পুলিশ বিনয়ের পাত্তাও পায় নি এতোকাল। আর আজ যোদ্ধার বেশে

এসে স্বেচ্ছায় বীরের যুদ্ধে সে যখন বন্দী, তখন অপর পক্ষের কি কাপুরুষজনোচিত কলঙ্কময় ব্যবহার!…

বিনয়ের তখন জ্ঞান নেই বোললেই চলে—প্রলাপও বকছে খুব। ১০ই ডিসেম্বারের বিকেল সেদিন। জনৈক ইংরেজ পাদ্রী এসেছেন বিনয়কে মৃত্যুর পূর্ব্বে পরমের বাণী শোনাবার জন্য। বিনয়ের রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে পাদ্রী বোলছেন: Boy! What can I do for you?

বিনয়ের প্রলাপ-কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তখন: 'Left, Right, Left—March!'…তৎপর ক্ষীণ অথচ উচ্চতর গ্রামে: 'Volunteers! Charge.'

বিনয়ের গৌর-আননে রক্তোচ্ছ্বাস, আহত অঙ্গ জুড়ে অপূর্ব্ব সামর্থ্যের প্রতিচ্ছায়া।…

পাদ্রীসাহেব চুপ কোরে গেলেন। এই আদর্শোন্মাদ সৈনিকের মুক্তিকামনার চেষ্টায় তিনি আর অগ্রসর হলেন না।…

পঞ্চম দিবসের অপরাহ্ণ। বিনয়ের বাবা-মা-বোন-ভাই-ভগ্নীপতি পুলিশ পাহারায় শেষ দেখা দেখতে এসেছেন বিনয়কে।…তখন বিনয়ের জ্ঞান লুপ্তপ্রায়। প্রলাপ-বকাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার সৈনিক এবার প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে বুঝেছে যে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার সাধ্য নেই ইংরেজের। কারণ, ইতিমধ্যে অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায়ই সবার অলক্ষ্যে বিনয় ব্যাণ্ডেজের ভিতর দিয়ে বাঁ হাতের আঙুল গলিয়ে মাথার ঘা'টাকে ঘেঁটে দিয়ে সেপ্‌টিক্ কোরে তুলেছে!…

বাপ এসে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কথা বোলবার ক্ষমতা নেই তাঁর। সতৃষ্ণ নয়নে পুত্রের মুখপানে চেয়ে থেকে ভাবলেন

তিনিঃ কই, এতো শক্তিমান যে তাঁর কিশোর-তনয়—এ-সংবাদ তিনি জানতেন-না তো কোন ক্ষণে!…বিনয়—শিশু বিনয়—কবে বাপেরও অজ্ঞাতে ছাড়িয়ে গেল শিকারী-বাপকে, যিনি শার্প-শুটার, নিশানা যাঁর অব্যর্থ?

মা'র চোখ দুটি অঝোর ধারায় অন্ধ হয়ে আসছে। তিনি তাঁর রক্তের ধনকে ক্ষুধাতুরার মতো দেখেন, কেবলই দেখেন—কিন্তু পোড়া চোখের জলে দৃষ্টি-যে তাঁর আবছা হয়ে আসে! ছেলের মাথায়-মুখে, ব্যাণ্ডেজ-করা হাতখানায় হাত বুলিয়ে দুঃসহ বেদনা দূর কোরবার কী তাঁর অব্যক্ত সাধনা! কিন্তু হায়রে, বুকের মাণিক যে তাঁর বুক থেকে উধাও হয়ে ছুটে যেতে চায়! ··বেদনাতুর পরিপার্শ্বে, বেদনাতুর চিত্তে বিনয়ের অর্দ্ধচেতন দেহের পানে সবাই তাকিয়ে আছেন—আর সবারই নয়ন জুড়ে অবাধ্য অশ্রুধারা ঝরঝর কোরে ঝরে পড়ছে। এমন সময় পুলিশের লোক এসে বল্লঃ সময় হয়ে গেছে—বেরিয়ে আসুন আপনারা।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁদের বিদায় নিতে হোলো। বিদায় কালে বিনয়ের মা পুত্রের চিবুকটি ধোরে করুণ কণ্ঠে বল্লেনঃ বাপ আমার! একবারটি তাকাও আমার ধন?··

বিনয় আপন অজ্ঞাতেই চোখ দু'টি পরিব্যাপ্ত কোরে ধীরে ধীরে তাকাল।…ওষ্ঠে তার প্রশমিত শিখা।…তারপর আরো ধীরে, বাঁ হাতখানা তুলবার সামান্য চেষ্টা কোরে, দিলো সে ছোট্ট একখানি স্যালুট!…সৈনিকের এ-প্রণাম তার জননীর উদ্দেশ্যেই কেবল সীমিত হয়ে রইল না—এ-প্রণাম স্পষ্টাক্ষরে স্বাক্ষরিত হয়ে গেল তেত্রিশ কোটি নরনারীর যে-দেশ, সেই দেশ-জননীর পদপ্রান্ত ছুঁয়ে-ও।…

আবার চোখ দু'টি বুজে এল। দেহ শিথিল হয়ে গেল। মৃত্যুর অভ্রান্ত-আহ্বানের পানে বিনয়ের যাত্রার কাল হয়তো সমাগত।···

মা'র সর্ব্বাঙ্গ কান্নায় কেঁপে ওঠে। তবু তাঁকে বিদায় নিতে হয় শাসকের কঠিন নির্দ্দেশে।···

চার

ইংরেজি মতে ১৩ই ডিসেম্বর শেষ রাতে বিনয়ের নশ্বর দেহ মৃত্যুকে স্পর্শ কোরে হলো মৃত্যুহীন। তরুণদেবতা তাঁর কর্ম্ম সমাপ্ত কোরে ফিরে গেলেন জ্যোতির্ম্ময় যে-লোক, সেই লোকে। প্রত্যুষে সারা কোলকাতা শহরে এ মৃত্যু-বার্তা প্রচারিত হলো। সংবাদপত্রে শহিদের মৃত্যুবরণ সোনার অক্ষরে নিলো রূপ। সম্পাদকীয়-স্তম্ভ খুলে পড়ছে খণ্ড খণ্ড জনতা শহরের সর্ব্বত্র : Benoy is dead—Long live Benoy !··· ('Liberty' daily)

পুলিশের কাছ থেকে বিনয়ের শবদেহ বার কোরে আনতে বিকেল হয়ে গেল। আট জন আত্মীয়কে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল শব বহন কোরবার জন্য। সংগে ছিল বিরাট পুলিশ বাহিনী, ছদ্মবেশে 'আই-বি'-র লোক-ও ছিল প্রচুর।

কিন্তু অগণিত জনতা পুলিশের এ-শাসন মেনে নিল-না। কোত্থেকে দলেদলে লোক এসে শোভাযাত্রার এক বিপুল প্রবাহ সৃষ্টি কোরল। শব কখন চলে গেল জনতার কাঁধে ! এক বলিষ্ঠদেহী-তরুণ অমিতশক্তির প্রবাহ মুক্ত কোরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এসে জনতাকে পরিচালিত করার কামনায়। কূলপ্লাবী-ধারাকে আপন জটার বন্ধনমুক্তিতে দুর্দ্দান্ত গতি-রেখা-দানের এই কি ছবি ? সে-যুবক—নাম তাঁর হারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আজ তিনি স্বর্গগত)—ভুলে

গেলেন-যে তিনি-ও সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল্ ভলাণ্টিয়ার্সে'র একজন অফিসার, ভুলে গেলেন-যে তিনি-ও 'আই-বি'-বিতাড়িত একজন বিপ্লবী। তিনি বুঝলেন-যে এই হিংস্র-পুলিশের অবিশ্রান্ত লাঠি-চার্জে প্রতিরুদ্ধ হয়ে যাবে জনতা, যদি তাদেরকে পরিচালিত কোরবার দায়িত্ব কেউ না গ্রহণ করে। জনতার হার হতে দিলে বিপ্লব-সাধনার হার হয়ে যায়। তাই তিনি সব কিছু ভুলে গিয়ে জনতার অধিনায়কত্ব নিয়ে বিনয়ের শবাধারের সাথে সাথে মিছিল অব্যাহত রেখে চল্লেন। নিমতলা অবধি সারা পথ পুলিশে ও জনতায় সে কি হুড়াহুড়ি! বারে বারে বেটন চালিয়ে জন-বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন কোরবার প্রয়াস তবু কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল। যে-বীর নিজের হৃৎপিণ্ড স্বহস্তে উপড়ে ফেলে দেশমাতৃকার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছেন, তাঁর-ই রক্ত-ঝরানো-পথে ছুটে চলেছে উন্মাদ গণসমুদ্র—লাঠির আঘাতে ইংরেজের বেতনভোগী পুলিশ সেই সমুদ্র-কল্লোল দেবে নিশ্চল কোরে, এ-ও কি সম্ভব ?···

বিপুল জনসমুদ্রের দোলায় দোল্ খেয়েখেয়ে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয়-পতাকায়-আবৃত শহিদের শবদেহ নিমতলাঘাটে এসে যখন উপস্থিত হলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে দিক্ মুখরিত। চতুষ্পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে অবিরাম উচ্চারিত শুধু—'জয়, বিনয় বোসের জয় !'···

পুলিশের লাঠি-চার্জ্ চল্‌ছে সমানে। তবু পাগল-জনতা মার খেয়েখেয়ে-ও ফিরে আসছে যথাস্থানে।···

শ্মশানঘাটে বাবা-মা ও আত্মীয় পরিবৃত কোরে জীবন্মুক্ত বীরের ছবি নেয়া হলো। তারপর প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নিতে তুলে দেয়া হলো

বিনয়ের আত্মপরিত্যক্ত দেহ। দিগন্ত কাঁপিয়ে মুহুর্মুহুঃ শব্দিত হয়ে চল্ল : 'Long live Benoy !'…'বন্দেমাতরম্ !'…

পরদিন প্রভাতে সারা বাঙলায় বিপ্লবীদের গোপন প্যাম্‌ফ্লেট্‌ ছড়িয়ে গেছে। তার ভাষা বহ্নিদীপ্ত—তার বক্তব্য সুস্পষ্ট।…

বালকবৃদ্ধ তরুণতরুণী আকুল আগ্রহে পড়ে : Benoy's Blood Beckons For More Blood !…

পাঁচ

অলিন্দযুদ্ধে পুলিশের গুলিতে দীনেশের পিঠের বাম দিকটা আহত হয়েছিল। নিজের গুলিটি থুত্‌নি দিয়ে ঢুকে বাঁ কানের পশ্চাৎ দিকে মাথায় ছিল নিবদ্ধ হয়ে। অচৈতন্য অবস্থায় দীনেশকে-ও বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মেডিকেল্‌ কলেজ হাসপাতালে (৮ই ডিসেম্বর) আনা হলো। উভয়কেই রাখা হলো ইউরোপীয়ান্‌ সার্জিকেল্‌ ওয়ার্ড্‌-এর তেতলার ঘরে, আলাদা কোরে। আই-বি এবং ক্যালকাটা পুলিশের পাহারার অন্ত ছিল না। গুলি-খাওয়া-বাঘ নাকি অধিকতর ভয়াবহ।…

দীনেশের মাথার ও পিঠের গুলি অপারেশন কোরে বার করা হলো। অটুট স্বাস্থ্য, অফুরন্ত প্রাণোচ্ছলতা এই যুবকের। কাজেই গুলি বার কোরে আনার সঙ্গেসঙ্গে দীনেশের অবস্থা ভালর দিকে যেতে লাগল।…বিনয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক অপরাহ্নে দীনেশের দাদা অনুমতি পেলেন দীনেশকে সাক্ষাৎ কোরবার।…

হাসপাতালের ঘরে ঢুকে দাদা দেখলেন একখানা খাটে পিঠে-মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় শায়িত তাঁর স্নেহের ভাইটি। তাঁর ছোট্ট ভাই, অজস্র আদরে ও ভালোবাসায় বেড়ে-ওঠা তাঁর ছোট্ট ভাই—কী অসহ্য-যন্ত্রনায় গুলিজর্জ্জরিত অঙ্গে নির্ম্মম পুলিশের হেপাজতে রয়েছে সে পড়ে হাসপাতালের ঐ কঠিন শয্যায়! তার বাপ-মা-ভাই-বোন কাছে আসতে পারবেন না, গায়েমাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবার অথবা তৃষ্ণায় মুখের কাছে একটু জল তুলে ধোরবার পর্য্যন্ত অনুমতি নেই—হায়রে!··· ভাবেন—ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে ভাবেন এই কথাগুলি দীনেশের দাদা। চোখের জল তাঁর বাঁধ মানে না।··

দীনেশ ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছিল। গভর্ণমেণ্ট রাজার হালে তার চিকিৎসা করিয়ে যাচ্ছে। তাকে সুস্থ-সবল কোরে ফাঁসির মঞ্চে বলি দিতে হবে। তার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের চোখেতো ঘুম নেই!···

দীনেশের জ্ঞান ভাল কোরেই ফিরে এসেছে। এখন সে কথা কয়।···হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তারের দল মৃত্যুযাত্রী এই যুবকের মধ্যে অক্ষয়-প্রাণের এমন একটি উচ্ছলতাকে অজান্তে স্পর্শ করে যে, তারা সবাই দিনের মধ্যে একবার অন্তত ঘুরেফিরে এসে দীনেশের সংগে একটু কথা না-বলে পারে না।···

একদিন সন্ধ্যায় নিশ্চুপে একটি ইউরোপীয়-নার্স দীনেশের ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ দীনেশের দিকে তাকিয়ে থাকতেই রসিক দীনেশ

হেসে প্রশ্ন করে : What's the matter, nurse?···Sorry. 'Am still breathing!

নার্স গম্ভীর হয়ে বলে : May God grant you long life। তারপর কাছে এগিয়ে এসে চাপা-কণ্ঠে শুধায় : Why did you take poison and shoot yourself simultaneously?

—Just to finish myself earlier.

—Committing suicide is a crime.—no?

—It was nothing of a suicide. It was self-emolation—a voluntary death—a death of fulfilment and not of despair.

নার্স গভীর কোরে দীনেশকে আবার দেখে নিয়ে বল্ল : Do you hate me?···Do you hate each and every Britisher?

হেসে দীনেশ কয় : I hate those who directly or indirectly want to rule us.

নার্স সহসা কারো পদধ্বনি শুনে ত্বরিৎ-গতিতে চলে যেতেযেতে বল্ল : Wish you long life।···Good night, brave boy!···

দীনেশ প্রত্যুত্তরে বল্ল : Good night, madam।···

দীনেশ সুস্থ হতে থাকার কালে আই-বি-অফিসারবৃন্দ একবার দীনেশের কাছ থেকে গোপন কথা বার কোরবার চেষ্টায় উৎসাহী হল। কিন্তু বিনা আয়াসেই তারা বুঝল, রুগ্ন দীনেশ এখনো হাতের কাছে ওদের কাউকে পেলে ঘাড় মটকে রক্ত শুষে খাবে। কাজেই এত ঘটনার পর আই-বি-প্রভুদের উৎসাহ বেশিক্ষণ

রইল না। তারা ভাবছিল-যে বেশি বাড়াবাড়ি কোরতে গেলে বিনয়ের মতই যদি এ-ছেলেও নিজের মৃত্যু নিজে ঘটিয়ে তাদের কর্ত্তাদের প্ল্যান্ ভেস্তে দেয়! পরিশেষে তাদের চাকরি নিয়েই ঘটবে টানাটানি। দীনেশ গুপ্তকে তাই সম্পূর্ণ সুস্থ কোরে, ইংরেজের বিচারে দণ্ডিত কোরে, ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিয়ে না-দেয়া পর্য্যন্ত পুলিশের অপর কিছু করণীয় নেই। শাসনযন্ত্রের উপর দেশবাসীর আস্থা বজায় রাখবার এইটে হলো আমলাতান্ত্রিক-রুচিগত একমাত্র পথ।...

সপ্তাহ তিনেক পর দীনেশ বস্তুতই সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হলো। তাকে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল্ জেলের কন্‌ডেম্‌ড্ সেলে সশস্ত্র-পুলিশ পাহারায় স্থানান্তরিত কোরবার সংবাদ পাওয়া গেল।...

ছয়

আলিপুরের সেশান্-জজ গার্লিক সাহেবকে সভাপতি করে গভর্ণমেণ্ট এক স্পেশাল্ ট্রাইবুন্যাল্ সংগঠন করলেন দীনেশ গুপ্তর বিচারার্থে। লোকচক্ষুর অন্তরালে, মার্চ মাসে, গার্লিকের কোর্ট দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত কোরল। বীর দীনেশ হাসিমুখে সেই দণ্ড গ্রহণ কোরে মৃত্যু-অতীতের সাধনায় দিন কাটাচ্ছে আলিপুর জেলের নিরন্ধ্র সেলে।...প্রিভি কাউন্সিলের অনুমোদন-সাপেক্ষ এই দণ্ড। সুতরাং দীনেশ তখনো মৃত্যুকে বরণ কোরবার অবকাশ পায়নি।...

দেশ জুড়ে বিপুল আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। দেশের নরনারী দীনেশকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিমলপ্রতিভা দেবীর নেতৃত্বে কোলকাতার পার্কেপার্কে জনগণের বিরাট সভাসমিতি

অনুষ্ঠিত হয়ে প্রস্তাব পাশ হচ্ছে—"দীনেশ গুপ্তর মৃত্যু আমরা হতে দেব-না!"...রাস্তায়-রাস্তায় উন্মাদ জনতা মিছিল কোরে প্রচার কোরছে—"ভারতবাসী সহ্য কোরবে-না দীনেশের ফাঁসি। ফাঁসির দণ্ড তার রদ কোরে দেয়া হোক এই মুহূর্তে।" অক্টারলোনি মনুমেন্টের নীচে দাঁড়িয়ে অগণিত নরনারীর জমায়েৎ-এ বিপ্লবিনী বিমলপ্রতিভা দেবীর কণ্ঠ থেকে আকুল আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে: "বাঙলার তরুণ, ভারতবর্ষের তরুণ—তোমরা ক্লীবের মতো সহ্য কোরো-না সাম্রাজ্যবাদী-ইংরেজের হস্তে তোমাদের মজ্জার মজ্জা, রক্তের রক্ত ঐ বীর সাধকের মৃত্যু! তোমরা জাগো, দুর্দ্দমনীয় প্রতিবাদে তোমরা জানাও—দীনেশের মৃত্যুদণ্ড চাই না, দীনেশ দীর্ঘজীবী হোক।"...অগণিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গম্ভীর নির্ঘোষে তারা জানায়—দীনেশকে হত্যা কোরলে প্রতিশোধ তারা নেবে, রক্ত-বন্যায় হত্যাকারীর জাতকে তারা ভাসিয়ে দেবে।... বাঙলার শহরেশহরে, গ্রামেগ্রামে কোলকাতার এই প্রতিবাদ-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।...

মোটের উপর তৎকালে এমন একজন ভারতীয় ছিলো না যার প্রাণের আবেদন দীনেশকে ঘিরে ব্যাকুলতায় মুখর না-হয়ে উঠেছিল, তার কুশল-কামনায় তৃপ্তি না-পেত।

কিন্তু দাম্ভিক ইংরেজ আবেদন-নিবেদনে টলবার পাত্র নয়।... প্রিভি কাউন্সিল্ থেকে দীনেশের ফাঁসির হুকুম বহাল হয়ে এল। কবে ফাঁসির তারিখ, সেইটে গোপন রেখে সরকার-পক্ষ এই তরুণের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সাত

আলিপুর নিউ সেণ্ট্রাল্ জেল। কন্‌ডেম্‌ণ্ড-সেলে দীনেশ মহামৃত্যুর অপেক্ষায় কাল গুণছে। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতাপাঠে তার দিনমানের ধ্যান সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে মা-বাবা-ভাই-বোনের সংগে দেখা হয়েছে। চির-উৎফুল্ল, প্রাণপ্রাচুর্যে চির-উচ্ছল দীনেশের স্বাস্থ্য যেন দিন দিন অদ্ভূত সুন্দরতর হয়ে উঠছিল। কারণ, সাধক দীনেশের তপস্যায় অনুক্ষণ ধ্বনিত হচ্ছে-যে সেই বাণী :

"তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে,
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো-না দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥"

গৌরবের সেই মহোত্তম-মৃত্যু আজ দীনেশের পায়ের কাছে পড়ে আছে। দীনেশের স্বাস্থ্য নিখুঁত হয়ে উঠবে-না কেন ?...

মা ও বোনের কাছে দীনেশ মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। এই চিঠি-লেখার মধ্য দিয়ে তার সাহিত্য-সেবা শুধু চলে-না, চলে তার উপলব্ধ-বাণীকে প্রকাশ করার সার্থক চেষ্টা-ও। দীনেশের চিঠিগুলো কাগজে বের হয়, একটি গল্পও 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়—নাম তার "রৌদ্র ও ছায়া"—বাঙলার নরনারী সে-সব লেখা লুব্ধের মত গিলে ফেলে।...

সেদিন প্রভাতে দীনেশ খবর পেয়েছে যে, আগামী প্রত্যূষসমাগমে তার ফাঁসি হবে।...তখন আটটা বেজে গেছে। স্নান সেরে, চা ও রুটি খেয়ে বোসেছে সে কম্বলখানা বিছিয়ে সেল্-এর গরাদের সামনে। পরম যত্নে চিঠির কাগজ খুলে লিখতে বোসলো সে একখানা চিঠি—অপূর্ব্ব চিঠি। সমগ্র সত্তার নিবিড়তা দিয়ে পত্র-রচনায় মুগ্ধ সেই মৃত্যুযাত্রী-বীরের নয়নে শিল্পীর স্বপ্ন, স্রষ্টার মাধুর্য্য-রেখা।...চিঠি লিখে যাচ্ছে দীনেশ :

মণিদি,

ভগবানের আশিষ যারা পায়, অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে-দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কত জনের হয় জানি না, তবে যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছে নেন তার সুখ-সম্পদ সব কিছু দেন ধুলোয় লুটিয়ে; করেন তাকে পথের ভিকিরী, রিক্ত, কাঙ্গাল। সে-মালা কি সহজ ?—

"এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র-হেন ভারি,
এ তো তোমার তরবারি।"

এ-জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়ে-ও বড়। সুখ ভোগ কোরতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা নিতে পারে ক'জন?

শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন, সে-ভার বহন কোরবার শক্তি-ও তাকে অযাচিত ভাবে দান করেন তিনি-ই। নইলে সাধ্য কি তার যে, সে-গুরুভার এক মুহূর্ত্ত-ও সে সহ্য করে?

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা—সে কি কখনো তাঁর মহা-শঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি শক্তি আছে সংসারের এই মিথ্যা মোহের যে, তাকে আটকে রাখবে? তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না :

"শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট-আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"...

আজ যাই, দিদি। এ-ই হয়তো শেষ প্রণাম।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
৩. ৭. ৩১

স্নেহের দীনেশ

চিঠি-লেখা সমাপ্ত কোরে মেট্-এর মারফত জেল-আপিসে সেটা পাঠিয়ে দিল দীনেশ। এ-চিঠি পুলিশ কোরবে 'সেন্সর'। তারপর একদিন পত্র-প্রাপকের হাতে পৌছবে চিঠিখানা।

বিকেলে মা-বাবার সংগে শেষ-ইণ্টারভিউ হলো দীনেশের। অশ্রুসিক্ত-নয়নে সন্তানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনেকক্ষণ চলে গেছেন মা-বাবা। দীনেশ দাঁড়িয়ে আছে সেলের গরাদে ধোরে। কোত্থেকে পশ্চিম-আকাশের পড়ন্ত-রোদের একটু লালিমা এসে পড়েছে তার দীপ্ত মুখখানার উপর। রুদ্ধ সেল্-এ দাঁড়িয়ে থেকে এই ধরণীর দেবতা অস্তগামী-সূর্য্যের পথচলার বর্ণসমাগমকে স্পর্শ কোরে দীনেশ আনন্দিত। সন্ধ্যাপূর্ব্বের বিদায়মুগ্ধ শেষ-স্পর্শটিকে অজস্রতায় গ্রহণ কোরে দীনেশ গলা ছেড়ে গাইতে লাগল :

'আবার প্রেলয়ে যাওগো আমায় রাঙিয়ে দিয়ে যাও।"

দূরের ব্যারাক্‌গুলিতে রাজনৈতিক-বন্দীর দল সন্ধ্যা-সূর্য্যের পানে তাকিয়ে থেকে তরুণ-তাপসের অপূর্ব্ব এ-সঙ্গীত তখন স্তব্ধতায় শুনে যাচ্ছিল। অগ্নিস্পর্শী-বিপ্লবীর সর্ব্ব সত্তা পরম-আলোকে রঙিন হয়ে গিয়েছিল—সেই রঙের একটু ছোঁয়া লেগে গেছে আলিপুর জেলের রাজবন্দীদের মনেই কেবল নয়, সাধারণ কয়েদী থেকে শুরু কোরে জেল্-ওয়ার্ডার, জেল্ অফিসার প্রমুখ প্রত্যেক মানুষের মনেও।···

আট

হাজার গোপন রাখা সত্ত্বেও দীনেশের ফাঁসির খবর কি কোরে যেন রাত দশটার মধ্যেই কাগজওয়ালারা পেয়ে গেছে। জেল্-গেটে দলেদলে লোক এসে খবরাখবর কোরছে, সংবাদ সত্যি কিনা।···গভীর রাত্রে আলিপুরের ব্যারাকে-ব্যারাকে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হতে লাগল 'বন্দেমাতরম্'! সেই ধ্বনি জেল-প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরের মুক্তিতে ছড়িয়ে গেল। বাইরের জনতা সে-ধ্বনি লুফে নিয়ে অজস্র গুণ শব্দে তা' উচ্চারিত কোরতে লাগল আলিপুর অঞ্চলের দেশ-বাতাস দীর্ণ কোরে।···দীনেশের অমর আত্মার মুক্তি ঘটে গেল। সর্ব্ব বিশ্বে বিকিরিত হলো এই মহোত্তমের প্রাণদ্যুতি। বন্দেমাতরম্'-ধ্বনির আর বিরাম নেই।···

এদিকে রাত তখন একটা। কোলকাতার বাইরে, আরামবাগের এক নিভৃত কক্ষে সুভাষচন্দ্রের আদেশে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল জেল থেকে বৌদিকে লেখা দীনেশের পত্র পড়ছেন। প্রাণসূর্য্যের আলোকে ভাস্করিত সেই লিপি মৃত্যুকে দান কোরেছে পরম জীবন। সুভাষচন্দ্রের চোখ দিয়ে নেবেছে ধারাস্নান। বেদনাপ্লুত অন্তরে

মৃত্যুহীনের ভাষাকে বুঝে মহাবিপ্লবী শুনতে পেলেন যেন কোন্ সুদূরের কী এক বাণী।···

কাগজওয়ালাদের 'রোটারি' মেসিন্ তখন দৈত্যের মত চলছে। দীনেশের ফাঁসির সংবাদ কম্পোজ কোরে, মেসিনে তুলে বার কোরবার নেশায় এডিটার থেকে শুরু কোরে সামান্য কম্পোজিটার পর্য্যন্ত উন্মুখ।···রাত্রি প্রভাতের সংগে সংগে কোলকাতার রাস্তাগুলো মুখরিত কোরে হকারের দল চিৎকার কোরে জানিয়ে যাচ্ছে —"দীনেশ গুপ্তর ফাঁসি"।···সমগ্র শহরের নরনারী এবং বালক-বৃদ্ধ দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে হকারদের হাত থেকে কাগজ টেনে নিয়ে গোগ্রাসে সংবাদ গিলছে। তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, তবু তারা পড়ে: "Dauntless Dinesh Dies At Dawn !!"···('Advance' daily)

কোলকাতা-কর্পোরেশান ও হাওড়া-মিউনিসিপালিটির সভ্যগণ-ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। গভর্ণমেন্টের রোষদৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ না-কোরেই তাঁরা-ও সরকারী-ভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাবে দীনেশ গুপ্তর ত্যাগ ও সাহসের প্রশংসা জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কোরলেন:

"This Corporation records its sense of grief at the execution of Dinesh Chandra Gupta who sacrificed his life in the pursuit of his ideal."—The Corporation of Calcutta, 8th. July, 1931.

"That this meeting records its deep sense of sorrow at the lamentable execution of Sj. Dinesh Chandra Gupta, and while sharing the profound grief with the members of the bereaved family prays to the Almighty that the soul of the departed great may rest in everlasting peace."—The Howrah Municipal Office, 7th July, 1931.

শহিদ দীনেশ, বীর দীনেশ দুঃসহ পদাঘাতে ইংরেজের শাসনকে
য়ায় গড়িয়ে চিরঞ্জীব হয়ে গেলেন। তাঁর বন্ধু, তাঁর সাথী,
ার পুরোযায়ী শহিদ বিনয়-বাদলের মৃত্যুহীন-লোকে দীনেশের
ত্রার লগ্ন ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রইল ১৯৩১ সালের ৮-ই জুলাই-
র পুণ্য-প্রভাতে।...

নয়

বিনয়-বাদলের আত্মাহুতি, দীনেশ গুপ্তর ফাঁসি বাঙলাদেশের
রুণ-রক্তে যথার্থই জ্বালিয়ে দিল সর্ব্বনাশের নেশা! যে-ইংরেজ
জ্ল দেবতার মত অবধ্য, তাকে কুকুরের মত পথের ধুলিতলে
রণ-আঘাতে লুটিয়ে পড়তে দেখে দেশবাসীর প্রাণে সাহস
ঞ্চারিত হলো। ভয়কাতর দাস-জাতি আপন বাহু-বলের উপর
শ্বাস কোরবার স্বপ্ন দেখা শুরু কোরল।...

দেশের সর্ব্বত্র অত্যাচারের তাণ্ডব পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে-ও দেশ-
াসীর মন থেকে এই সব শহিদের প্রতি যে-শ্রদ্ধা, তাকে
য়েমুছে ফেলতে পারলো না ইংরেজ। গোপনে ও প্রকাশ্যে
নতম কৃষক বা পথচারীর কাছেও (হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে)
প্লবীরা পেতে লাগলেন সাহায্য। পুলিশের অত্যাচার রূপ ধারণ
রেছে নগ্নতায়। ছাত্রছাত্রীদের জীবন অতিষ্ঠ। কোনো তরুণ-ই
লিশী-কানুনের অমর্য্যাদাকর অনাচারের হাত থেকে-যে রেহাই
তে পারে না—এ বস্তু অভ্রান্ত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে!...ইংরেজ
শ্বাস করেছে যে, কতিপয় যুবকের এই দুঃসাহসিকতা কতিপয়ের
ধ্যেই নিবদ্ধ নয়—বহুর দুঃসাহসিক হবার অত্যুগ্র ইচ্ছার
কাশ এ। সুতরাং শাসন-বিভীষিকা পরিব্যাপ্ত করার নীতি

পরিলক্ষিত হতে থাকলো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। সারা দেশ পুলিশের জঘন্য নিষ্ঠুরতার চাপে পিষ্ট হয়ে চলল।...

এমন সময় দীনেশ গুপ্তর কর্ম্মভূমি মেদিনীপুর গর্জ্জে উঠল।...

মেদিনীপুরের জাঁদরেল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্যাডি লবণ-আন্দোলনের প্রত্যুত্তরে মেদিনীপুরবাসী নরনারীর পিঠের চামড়া তুলে নিয়ে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং রাজনৈতিক-বন্দীদের জেলের মধ্যে আটক রেখে বেটন্-পেটা করার গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন! কিন্তু বৃহত্তের শাসন তাঁর উপরেই নেমে এল। দিনের আলোয়, প্রদর্শনী-সভার সভাপতি রূপে তিনি যখন সরকারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে একদা (৭ই এপ্রিল, ১৯৩১) বিরাজিত, তখন অজ্ঞাত তরুণদ্বয় সেই শাসনদণ্ড হস্তে তাঁর সম্মুখ এসে উপস্থিত। বীরপুঙ্গব প্যাডিসাহেব ত্রাসকম্পিত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর সাক্ষাৎ-শমন সশরীরে সমাগত!...গর্জ্জে উঠল বিপ্লবীর রিভলভার। গুলির প্রচণ্ড আঘাতে সাহেবের প্রাণহীন দেহ মুহূর্ত্তে শায়িত হলো মাটির ধুলোয়। বিপ্লবী-তরুণ আপন কর্ম্ম সমাপনান্তে হাওয়ায় গেল মিলিয়ে। · কা'রা সেই তরুণদ্বয়? কি তাদের নাম? কোথায় তাদের বাস?—আজ পর্য্যন্ত পুলিশের কাছে তা' অজ্ঞাত!...

দানেশের বাণী সার্থক হোলো। বোলেছিলেন তিনি একদিন: সত্যেন বসুর নাম ভুলতে পারেনা মেদিনীপুরের কোন তরুণ। তাদেরকে তোমরা তন্দ্রামুক্ত করো, বিনিময়! দেখবে, অজস্র 'সত্যেন বসু' এই শহরেই আবার জন্মে গেছেন।...

* * *

ইংরেজের বুদ্ধিভ্রংশ হবার সাথেসাথে তার পুলিশের বুদ্ধি-ও ক্রমশ লুপ্ত হতে চলল। সারা বাঙলায় তাদের অনাচার যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ততোই বাঙালীর যৌবন বিনয়-বাদল-দীনেশের বাণী কণ্ঠে ধারণ কোরে দুর্দ্ধর্ষ-জীবনপথের সূচনা রচিত কোরে যাচ্ছিল। দীনেশকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে ইংরেজের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ হলে-ও ইংরেজের মসনদ অটল থাকতে পারল-না। যে-ভয়ে কাতর হয়ে বাঙালী এতকাল নিজেকে অসহায় মনে করে আসছিল, সে-ভয়কে ভয় না-করতে তার আজ যেন ভাল লাগল। অকথ্য অত্যাচারে বিপর্য্যস্ত জাতি তাই জন্ম দিয়ে চলল শহিদের পর শহিদ।...

* * *

দীনেশ-সংখ্যা "বেণু" বেরিয়েছে দীনেশের ফাঁসির পর। দীনেশের সমস্ত পত্র এবং নানা লেখা ছিল সে-সংখ্যায়। হাজার হাজার সংখ্যা মুহূর্ত্তে উড়ে যেতে লাগল কোলকাতার রাস্তায়। স্কুলে-স্কুলে, কলেজে-কলেজে, হোষ্টেলে-মেসে-বাসায়-লাইব্রেরিতে-ট্রামে-বাসে ছেলেমেয়েরা পড়ছে সেই দীনেশ-সংখ্যা "বেণু"—ছেলেমেয়েদের চোখের সম্মুখে যেন দীনেশ গুপ্ত জীবন্ত হয়ে উঠছেন প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্য দিয়ে!...

একটি কিশোর—শান্ত, সমাহিত তার বাইরের রূপ—কিন্তু বক্ষ-নিভৃতে জ্বল্‌ছে অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখা, রক্তে নাচ্‌ছে সর্ব্বনাশের নেশা। সারাক্ষণ পাঠ করে সে ফাঁসির-কক্ষে-অপেক্ষ্যমাণ দীনেশগুপ্তর লেখা ক'খানি চিঠি।

দীনেশগুপ্তকে যারা জানতো তাদের এ-ও জানা ছিল-যে ইংরেজ তাঁকে বন্দী কোরে, বিচার কোরে, দণ্ড দেবে—এ ছিল তাঁর পক্ষে সহ্যাতীত বস্তু। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই দীনেশগুপ্তকেই সাজা দেবার সুবিধা পেল ইংরেজ। দেশের পূজ্য যে বীর—তাঁকে 'ক্রিমিন্যাল্' আখ্যা দিয়ে ইংরেজের বিচারক দণ্ড দান কোরবে, এ বস্তু তৎকালীন বাঙলার যুবশক্তির পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন।

পাঠ-রত তরুণ-কিশোর তাই অনামী হয়ে দীনেশগুপ্তর শাস্তিদাতাকে শাস্তিদান কোরবার সংকল্পে মশগুল!...

সে এক দ্বিপ্রহর। দীনেশের ফাঁসির হুকুমদাতা গার্লিক সাহেবের কোর্ট। কোর্টের চতুর্দ্দিক পুলিশ পাহারায় সুরক্ষিত। আই-বি-র লোকেরা আলিপুর আদালতের আনাচেকানাচে ঘোরাফেরা করছে। কারণ, ইউরোপীয়দের জীবন-রক্ষার জন্য সরকারের ব্যবস্থার সীমা নেই। গার্লিক সাহেবের সশস্ত্র প্রহরী সামান্য দূরে দণ্ডায়মান। সাহেব এজলাসে বোসে বিচার কোরছেন। কিন্তু তিনি ভুলে-ও জানেন-না যে আরো বৃহৎ, আরো সত্য যে-বিচার—সে আজ অমোঘ-দণ্ডের বিধান নিয়ে তাঁকে শাসিত কোরতে আসছে!...

কোর্ট্ লোকাকীর্ণ। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে রিভল্‌ভার গর্জ্জে উঠল! চোখ বিস্ফারিত কোরে সবাই দেখল—গার্লিক সাহেব ঢলে পড়লেন; তাঁর দেহ নিঃসাড়, প্রাণহীন। চোখ রগড়ে আবার তারা দেখে—অনতিদূরে একটি তরুণের মৃতদেহ; গুলি দু'টা যথাযোগ্য ব্যক্তির যথাস্থানে অনায়াসে ঢুকিয়ে-ই সে-তরুণ 'সায়োনাইড্' খেয়ে বরণ কোরেছে স্বেচ্ছামৃত্যু!...সেটা ১৯৩১ সাল। তারিখ, ২৮শে জুলাই।...

দীনেশ গুপ্তকে হত্যা করার অপরাধে গার্লিক সাহেবের ভাগ্যে প্রাণদণ্ড লিখে দিল জাতির যৌবন। এই যৌবন-শক্তির মৃত্যু ঘটান কারো পক্ষে সম্ভব কি? ··

যুবকের মৃতদেহ নিয়ে পুলিশের তৎপরতার বিরাম ছিল না। কিন্তু বহুদিন এই যুবকের পরিচয় তারা জানতে পারে নি।

কিন্তু একদিন দীনেশ-হত্যাকারী গার্লিক সাহেবের শাস্তি-বিধাতা এই কিশোরের নাম প্রকাশিত হয়ে গেল। উক্ত অনামী-শহিদের নাম হলো কানাই ভট্টাচার্য্য। বাড়ি তাঁর চব্বিশ-পরগণা অঞ্চলে।··· গভীর আবেগে দেশের মানুষ কিশোর-দেবতার পরম প্রতীক এই শহিদকে নতুন কোরে আবার প্রণাম করল।

পরিশেষ

গভীর রাত্রি। আঁধার সমাকুল সকল বিশ্ব। পশুপতির চোখে ঘুম নেই। সেল্-এর গরাদে ধোরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। জেলের পেটা-ঘড়িতে বেজে যায় একটা, দুটো, তিনটে—। দূরে দুল্‌ছে এক ফালি আকাশ। জ্বলছে সেখানে শুকতারাটা দপদপ কোরে আকাশ-দীপের মত। বন্দী পশুপতি বিনিদ্র-রজনীর তীরে বোসে ভাবছেন অফুরন্ত অজস্র কথা। বিনয়-বাদল-দীনেশ-কানাই ভট্টাচার্য্যের অদ্ভুত সাফল্য এবং প্যাডি-সাহেবের বিপ্লবী-শাস্তিদাতার সার্থক উধাও-হয়ে-যাওয়াকে ঘিরে তাঁর চিন্তাজাল বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে। অতীত ও বর্ত্তমানকে কেন্দ্র কোরে তাঁর ভাবনা পাখা মেলে উড়ে চলে। মনে পড়ে উত্তর, সুশান্ত, রহমন্, বিনিময়কে। মনে পড়ে অরুণাদি ও বিপ্লবের অন্যান্য অনামী বোনদেরকে।—এদের পলাতক-জীবনের কর্ম্মমুখর সংঘ-শক্তির এক একটি প্রকাশ-শিখাই তো ঐ লোম্যান-সিম্পসন-প্যাডি-গার্লিক্ জড়িত য়্যাক্‌শান্‌গুলো।...মনে পড়ে তাঁর আশু-নিরঞ্জন-অজিত-সর্ব্বাণীর কথা। তাঁরাই তো বিনয়-দীনেশ-বাদল-কানাই এবং ভাবীকালের শহিদদের পুরোযায়ী।...মনে পড়ে সম্পূর্ণাদেবীর কথা। কী রহস্যময়ী অনন্যসাধারণ কঠিন সেই নারী। জন্মেছিলেন এই পৃথিবীতে প্রচণ্ড শক্তি ধারণ কোরে। তুলনা তাঁর আছে কি?...মনে পড়ে বিপুলদাকে—সকল কর্ম্ম-প্রবণতার উৎস, সকল চলার প্রেরণাদাতা বিপুলদাকে। বিপুল প্রাণ ও বিপুল সামর্থ্য নিয়ে এই বিরাট পুরুষের আবির্ভাব

ঘটেছিল বাঙলায়।...চোখ দুটি বুজে আসে পশুপতির। ভাবতে থাকেন তিনি বিপুলদাকে। বিপুলদা আজ বিদেশে নির্ব্বাসিত। বৃদ্ধ এই বিপ্লবী আজো চোক্ষে অরুণ-দীপ্তি ধারণ কোরে বেঁচে আছেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার গৌরবে। বহুকষ্টে তাঁর সংগে সামান্য যোগাযোগ রেখেছিলেন পশুপতি। কিন্তু তাঁর অমূল্য সান্নিধ্যতো আজকের বিপ্লবীরা পেল না! পশুপতির সমগ্র সত্তা আজ বিপুলদাকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।...

স্তব্ধ জেলখানা। স্তব্ধ দূরের আকাশ ও পৃথিবী। স্তব্ধ পশুপতির চতুঃস্পার্শ্ব। নৈশ-হাওয়া পশুপতির সারা অঙ্গে ছোঁয়া দিয়ে যায়। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হয়ে গেছে—কিন্তু আকাশ এখন মেঘশূন্য, শুধু পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যুগ-ব্যাপী তমসা।...

তন্ময় পশুপতি দূরান্তে কা'র পদধ্বনি যেন শোনেন। চোখ মেলে তাকিয়ে তিনি পরম বিস্ময় মানেন। দেখেন, বিপুলদা স্বয়ং তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন! বিপুলদার চেহারার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে নি। পঁয়তাল্লিশ বছরের মানুষটি আজ ষাট পেরিয়ে গিয়ে-ও তো ঠিক তেমনটিই রয়েছেন! কেবল মাথার চুলগুলোয় একটু পাক ধোরেছে, আর ঐ দীর্ঘদেহ যেন একটু নুইয়ে গেছে। বিপুলদার ওষ্ঠে মধুর হাসি, তাঁর ললাটে কাঁপছে যেন ঐ শুকতারাটা পরম লাস্যে। পশুপতি ছুটে যান বিপুলদার কাছে। বুকে তুলে নেন বিপুলদা তাঁর ভাইটিকে। তারপর দেহ তাঁর হাল্কা হয়ে যায়। কারার বন্ধন, গগনস্পর্শী প্রাচীরের নিষেধ পেরিয়ে তাঁরা দু'জনে ধাওয়া করেন এক জ্যোতির্ম্ময় পথে। উপস্থিত হলেন তাঁরা ঐ শুকতারার-ই দেশে। পাশাপাশি বোসে তাঁরা সেই উর্দ্ধলোক থেকে নির্নিমেষ-নয়নে তাকালেন পৃথিবীর পানে।...

পশুপতি বোলছেন : দাদা, আপনার অনুপস্থিতিতে-ও সাধ্যানুসারে আমরা আপনার আরদ্ধ কর্ম্মপথে পথ চলেছি আপনারই নির্দ্দেশ লক্ষ্য কোরে।···

বিপুলদা উত্তর দিচ্ছেন-না। পরম স্নেহে কেবল পশুপতির ললাটে-মাথায় আশীর্ব্বাদ-স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছেন।···পশুপতি রোমাঞ্চিত আবেশে বিপুলদার কোলে মাথা রেখে পৃথিবীর পানে তাকিয়ে রইলেন। প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো ভারতবর্ষ, প্রোজ্জলতর হয়ে উঠলো বাঙলাদেশ পশুপতির দৃষ্টিপাত সম্মুখে। পশুপতি অনন্যমনা হয়ে দেখে চললেন ভবিষ্যতের আলেখ্য। বিপ্লবীর অনাগত কর্ম্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়ে চল্ল সারিসারি ছবির মত।

দেখে চলছেন পশুপতি : ইউরোপীয়ান্ য়্যাসোসিয়েশানের সভাপতি ভিলিয়ার্স সাহেবের সুরক্ষিত আপিস-গৃহে ঢুকেছেন এক তরুণ। গুলি করেছেন বণিক-প্রতিনিধিকে বিমল দাসগুপ্ত। ভিলিয়াস গড়িয়ে পড়লেন আহত হয়ে। তাঁর মৃত্যু না-হলেও ইংরেজ বণিক-লক্ষ্মীর দৃপ্ত-সম্মানের ঘটলো অপমৃত্যু।··· বিপ্লবিনীর রিভলভার গর্জ্জে উঠল এবার কুমিল্লা সহরে। দুইটি কিশোরী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ষ্টিভেন্সের বাংলোতে ঢুকে তাঁকে গুলির ঘায়ে নিঃশেষ কোরে দিয়ে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে চম্‌কে দিলেন। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরির দুর্ব্বার গতিদ্যুতি ইংরেজের সহ্য হতে পারে কি?···পাহারতলীর ইউরোপীয় ক্লাবের উপর নেবে এল এবার বিপ্লবীদের শাসনদণ্ড। শ্বেত-নরনারী তখন নৃত্যে ও গানে মুখরিত কোরে তুলেছে ক্লাবগৃহ। বোমা হস্তে বিপ্লবীদের আগমন-সংবাদ তাদের জানবার ফুরসৎ কই? দারুণ বিস্ফোরণে সহসা কেঁপে উঠল সেখানকার ধরণী। রক্তাক্ত-দেহে

গড়িয়ে পড়ল নৃত্যরত নর ও নারী শ্বেত-দন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে। প্রীতিলতা ওয়েদেদার ফিরবার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার আশঙ্কা অতিক্রম করার জন্যে খেলেন 'সায়োনাইড'। স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটিয়ে হলেন তিনি 'শহিদ'। নারী-শহিদের এই সর্ব্বজয়িনীর রূপ বাঙালীর ঘরেঘরে আরো মর্ম্মান্ত কোরে জানালো "সর্ব্বনাশে"র আহ্বান।...ক্ষিপ্ত-পুলিশের আর্ত্ত শাসনে বন্দী হচ্ছেন অসংখ্য তরুণ-তরুণী বিনা বিচারে। তাঁদেরই এক তরুণ পুলিশের গুপ্ত-কক্ষে শৃঙ্খলিত। চল্‌ছে তাঁর উপর পশুর হিংস্রতায় পুলিশী-শাসন। অনাহত-তারুণ্যের জয়-লিপি তাঁর ললাটে, চোক্ষে অক্ষয়-পৌরুষের সুদূর ভাষা। আই-বি-পুলিশের দুঃসহ মার খেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় আনীত হলেন তিনি ঢাকার সেণ্ট্রাল জেলে। অনিল দাসের বন্ধন-বেদনায় এ-মৃত্যু ব্রিটিশ-জুলুমের কালো কীর্ত্তি, কিন্তু পদানত-যৌবনের অম্লান বিদ্রোহ-বিকাশ।... এলো কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভা। গভর্ণর ষ্টান্‌লি জ্যাক্‌সন পৌরহিত্য কোরছেন সে-সভায়। এমন সময় এক তরুণী উঠে এলেন ডিগ্রি-প্রার্থীদের মধ্য থেকে। হঠাৎ সে-নারীর ঘটলো যেন রূপান্তর। বিপ্লবিনীর সামর্থ্যে হাতের রিভল্‌ভার নিশানা কোরলেন তিনি গভর্ণরের দিকে। সবাই তাকিয়ে আছে ভয়ে, বিস্ময়ে, বিস্ফারিত-নেত্রে। বীণা দাসের এই সশস্ত্র প্রতিবাদ পৃথিবীকে বজ্রনির্ঘোষে জানিয়ে দিল যে, ভারতবাসী চাচ্ছেনা সাম্রাজ্যবাদের কোন প্রতীককে ভারতবর্ষের কোনবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন প্রসঙ্গে।...'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌'-এর সম্পাদক ওয়াট্‌সনকে পরপর দু'বার কোরে আঘাত হান্‌লেন বিপ্লবীরা। আপিসের দ্বারে আক্রান্ত হয়ে-ও তিনি বেঁচে গেলেন। দ্বিতীয়বার

তাঁর গাড়ির সংগে বিপ্লবীদের গাড়ি পাল্লা দিলো রাজপথে। ছুটো মোটার যে-মুহূর্ত্তে পাশাপাশি হয়েছে চলার বেগে—সেই মুহূর্ত্তে বিপ্লবীদের মোটার থেকে গুলি ছুটে এসে সাহেবের অঙ্গ বিঁধে দিল। সাহেব কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন। তারপর ভারতছাড়া হতে হলো তাঁকে। সাম্রাজ্যবাদের জয়ঢাক বাজাবার স্থান যে বাঙলাদেশ নয়—রক্ত ক্ষয় কোরে বুঝেছিলেন সে-কথা ওয়াট্‌সন সাহেব।...সারা বাঙলায় বিপ্লবীদের সংগে ইংরেজের লড়াই সীমা ছাড়িয়ে গেল। ইংরেজের অত্যাচার নগ্ন হয়ে, বর্ব্বর হয়ে, কুৎসিত নিষ্ঠুর হয়ে দেশব্যাপী ব্যাপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তবু দমাতে পারলো কই বিপ্লবীকে? গর্জ্জে উঠল আবার মেদিনীপুর। তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস সাহেবকে হত্যা কোরলেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য। প্রদ্যোতের ফাঁসি হলো, 'তেত্রিশ সালের ১২ই জানুয়ারি। শহিদের পদভারে বাঙলা আবার কম্পিত হলো।...বৎসর না পেরুতেই, 'তেত্রিশ সালে তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু ঘটালেন বিপ্লবীরা মেদিনীপুর শহরে খেলার মাঠে। দীনেশের কর্ম্মভূমি, সত্যেন বসুর জন্মভূমি মেদিনীপুর অসম্ভব কীর্ত্তি স্থাপন কোরল। বার্জ্‌ সাহেব খেলোয়াড়। খেলার মাঠে ফুটবল-প্রতিযোগিতায় অপূর্ব্ব ক্রীড়াকৌশল দেখাবার স্বপ্নপ্রসারে ভাবেন-নি তিনি যে, বিপ্লবীদের ক্রীড়াকৌশল অন্য পথে চালিত হয়ে তাঁকে পর্য্যুদস্ত করার ষড়যন্ত্রে বদ্ধপরিকর। আক্রান্ত হলেন মিঃ বার্জ্‌ ও তৎসঙ্গে মিঃ জোন্স। সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী ছিল চতুষ্পার্শ্বে, মাঠের বাইরে। বিপ্লবীদের সংগে সে-বাহিনীর সংঘর্ষ হবার পূর্ব্বে-ই বার্জ্‌ সাহেবের মৃতদেহ ধুলায় পড়েছে লুটিয়ে, আহত জোন্স-

জ্যোতির্ময় ভৌমিক

নারায়ণগঞ্জ পার্টি সম্মেলনে আত্মত্যাগীর জন্যে মৃত্যুবরণে শহীদ

এর দেহ মাটির বুকে যাচ্ছে গড়াগড়ি। কর্ম্মস্থলে অনাথ পাঞ্জা ও মৃগেন দত্ত গুলি-জর্জ্জরিত হয়ে ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁদের ফাঁসি হলো। আরো ফাঁসি হলো আর এক দফা এই মামলায় ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্ম্মলজীবন ঘোষের। পাঁচটি তরুণ-শহিদ মেদিনীপুরের বিপ্লবী-জীবনের ইতিহাস রক্ত-লিখনে সমৃদ্ধতর করে দিয়ে গেলেন। এঁদেরই দু'টি সঙ্গী, শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের সহায়হীনতায় বিভিন্ন স্থানে তাঁরা বন্দী। পুলিশের মার খেয়ে খেয়ে ফণীদাস সম্বিৎহীন। তাঁকে মৃত ঠাউরে মার বন্ধ করেছে পুলিশ। আর কিশোর নবজীবন—পুলিশী-অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত অবস্থায় বরণ কোরছেন তিনি মহামৃত্যুকে। তবু ওষ্ঠে উভয়ের দৃঢ় প্রত্যয়-লিখা, মন্ত্রগুপ্তি পালনের অটুট সংকল্প-চিহ্ন। ইতিমধ্যে ঢাকায় ডুর্নো সাহেব (ম্যাজিষ্ট্রেট) ঘায়েল হয়ে গেছেন, গ্র্যাসবী সাহেব (এ-এস্-পি) আক্রান্ত হয়েছেন, কামাখ্যা সেন (স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট) মরে ভূত হয়ে গেছেন বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে। কালিপদ ভট্টাচার্য্য ফাঁসি গেলেন কামাখ্যা সেনকে বৈপ্লবিক নিয়মে শাস্তি দান কোরে। গ্র্যাসবি-আক্রমণের মামলায় বিশ বছরের সাজা নিয়ে বিনয় দে-রায় দ্বীপান্তরিত হলেন আন্দামানে।·· কুমিল্লায় পুলিশ সাহেব মিঃ এলিসন অজানিত বিপ্লবীর হাতে প্রাণ দিলেন।···চট্টগ্রামে কল্পনাদত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, নির্ম্মল সেন প্রমুখ বিপ্লবী তাঁদের দুর্দ্দান্ত নেতা মাষ্টারদার (সূর্য্যসেন) সঙ্গে এক শেল্টারে থাকা কালে মিলিটারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে যে-যুদ্ধ দান কোরলেন তার-ও তুলনা নেই। কমাণ্ডাণ্ট্ ক্যামারণ্ গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হলেন, বিপ্লবীরা পালিয়ে

এলেন শেষটায় দুরান্তের অপর এক আশ্রয়ে।...'তেত্রিশ সালের মধ্যে বিপ্লবীদের কর্ম্মকাণ্ড প্রায় স্তম্ভিত হয়ে এলো এণ্ডার্স নী-শাসনের দাপটে। সার্ জন্ এণ্ডার্সনের মত জাঁদরেল গভর্ণর ইতিপূর্ব্বে আর আসেন নি এ-দেশে। আইরিশ মুভ্মেণ্ট দমন কোরবার সুনাম তাঁর রয়েছে, 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান্' সংরচনার কুকীর্ত্তিতে. তিনি আয়র্লণ্ডে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সমগ্র বাঙলা তখন অত্যাচারের বিষে জর্জ্জরিত। তারুণ্যশক্তি নিঃসাড়।...সহসা বিপ্লবীর আবার গর্জ্জে উঠল। 'ভিলেজ্ গার্ড' নামে এণ্ডার্সনী-চর গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াত যাবতীয় ইয়ুথ্-মুভ্মেণ্ট দমন করার কুটিল অভিপ্রায়ে। একদিন নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামের কাছে ঘটলো সেই ভিলেজ-গার্ডদের সংগে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ। রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীদের গুলির ঘায়ে মরলো একটা ভিলেজ্-গার্ড, যখম হলো তাদের একাধিক। পালিয়ে গেলেন সুকুমার (লণ্ট) ঘোষ। ধরা পড়লেন মতিমল্লিক। ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন সর্ব্বত্যাগী সে বীর। তমসাক্রান্ত গগনপটে অম্লান জ্যোতিষ্কের সহসা পরিপ্লাবিত-হয়ে-ওঠা কি সে নির্ম্মুক্ত, নিরুপাখ্য রূপ!...গভর্ণর এণ্ডার্স ন্‌কে শাসন কোরবার জন্য বিপ্লবীদের চেষ্টার সীমা থাকলো-না। এণ্ডার্স ন্‌কে পাওয়া দেবতার-ও বুঝি অসাধ্য! কিন্তু তপস্যার পরিসরে মানুষ যায় দেবতাকে-ও ছাড়িয়ে। বিপ্লবীদের তপশ্চর্য্যায় তাই এণ্ডার্স ন্‌কে না-পাবার বাধা শেষটায় আর থাকলো না। ১৯৩৪ সালের মে মাসের এক দ্বিপ্রহর। লিবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠ। গুটিকয় বিপ্লবী ও একটি বিপ্লবিনী গভীরতর ষড়যন্ত্রকে সুকৌশলে সফল কোরে, লক্ষ বাধা ও বিপত্তিকে অনায়াসে ফাঁকি দিয়ে

নিঃশঙ্ক-চিত্তে পৌঁছলেন এসে সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে। মুহূর্তে গর্জ্জে উঠলো রিভলভার। ঘোড়দৌড় গেল থেমে। মানুষের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে তখন। জাঁদরেল এণ্ডার্সনের ভয়ার্ত্ত-নৃত্যের ছবি শাসনপিষ্ট ভারতবাসীর পাণ্ডুর মুখে-ও হাসির ছাঁয়া লাগিয়ে দিল। ভবানী ভট্টাচার্য্য ফাঁসির মঞ্চে জীবনদান করলেন ১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি। চৌদ্দ বৎসরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হলেন উজ্জ্বলা মজুমদার। আন্দামানে নির্ব্বাসিত হলেন সুকুমার (লণ্টু) ঘোষ, মধু বানার্জি ও মনোরঞ্জন বানার্জি। বিপ্লব-যজ্ঞের এই পর্ব্বের শেষ শহিদ হয়ে রইলেন বীর ভবানী।...

পশুপতির দৃষ্টি অধিকতর প্রসারিত হতে থাকে। তারপর কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন ধরণী। সৃষ্টির রসশালা হয়তো সেখানে সৃষ্টিগর্ভের গোপন-বেদনায় কর্ম্মমুখর। কিন্তু চোখে পড়ে না সে-সৃষ্টিউৎসকে। চোখে পড়ে শুধুই তমিস্রা, শুধুই বাধ্যতামূলক-নিষ্ক্রিয়তা।... পশুপতি আরো প্রসারিত করেন তাঁর দৃষ্টি—আরো—আরো। ধ্যান পেতে থাকেন গভীরতম মগ্নতায়।...বেজে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা। জ্বলে ওঠে পৃথিবী-ব্যাপী প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধবহ্নি।... র দূরান্তের জলকল্লোল-গর্জ্জন শোনা যায়। তার-ও ও-পারে যায় পশুপতির। বিরাট নেতৃত্বের অধিকারী বিরাটতম পুরুষ সেখানে কর্ম্মদীপ্ত। সুভাষচন্দ্র—তাঁর আজাদ-ফৌজ।... নির তীর থেকে বর্ম্মার কূলে এসে ভিড়লো তাঁর সাবমেরিন্। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়া তাঁকে-যে ডেকে পাঠিয়েছে। এসেছেন সুভাষ। গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর 'আজাদহিন্দ হুকুমৎ', 'আজাদহিন্দ ফৌজ', 'ঝান্সির রাণী বাহিনী', 'বাল

সেনা' সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়ারই শক্তি এবং প্রেরণার উৎস রূপে। পশুপতির দৃষ্টিপাতের পরিসীমায় ঝল্‌সে যায় এ-ছবি—ঝল্‌সে যায় নেতাজীর সৈন্যাধ্যক্ষ শা'নওয়াজের নেতৃত্বে ইম্ফল-রণাঙ্গনে স্বাধীন সেনাবাহিনীর সম্মুখে ভারতীয় বৈজয়ন্তীর উড়ন্ত ছবি! বিপ্লবের খরতর ঝর্ণাধারা দুর্জ্জয় সাগরস্রোতের রূপ গ্রহণ কোরে উচ্ছ্বসিত। এই দুর্দ্দান্ত জলতরঙ্গ রোধিবে কে?···

কখন যেন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শুকতারা ডুবে গেছে কোথায়? কোথায়ই-বা বিপুলদা? কোথায় তাঁর উষ্ণ আলিঙ্গনটুকু? বাদলা হাওয়া কন্‌কন্ কোরছে। পশুপতি চোখ রগড়ে দেখেন গরাদে ধোরে মাটিতে এলিয়ে আছেন তিনি বহুক্ষণ। চিৎকার কোরছে মেট্‌পাহারার দল: 'তালাচাবি-লাল্‌টেম্-আসামী সব ঠিক্ হ্যায়, হুজুর!'···

পশুপতি গরাদে ছেড়ে নিজের শয্যায় এসে বোসলেন। ঢক্‌ঢক্ কোরে এক গেলাস জল খাবার ইচ্ছে হলো তাঁর। কিন্তু সেলে জল ছিল-না তখন। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমগ্র স্বপ্নটুকু স্মরণ কোরতে চাইলেন। ভবিষ্যতের কী যে ছবি তিনি দেখলেন তা এখন আর বুঝতে পারছেন-না। শুধু অব্যক্ত আশার কনকান্বিত জ্যোতিস্নানে মন তাঁর উদ্ভাসিত হতে থাকে। মনে পড়ে আবার বিপুলদাকে—তাঁর মন্ত্রদাতা গুরু বিপুলদাকে। দেখিয়ে দিলেন তিনি অশরীরী-সত্তায় নতুন কোরে যেন ঋষি বঙ্কিমের স্বপ্নচ্ছবি।···ঐ যে শোনা যায় গণ-অভ্যুদয়-কল্পে বিপ্লবশক্তির প্রাণোচ্ছ্বাসগর্জ্জন—দূরে, অতি দূরে এ-প্রাণপ্লাবন বাঙলার কূলে আর সীমাবদ্ধ নেই। সারা ভারতবর্ষ

পেরিয়ে, সমগ্র এসিয়ায় উঠেছে সে পরিস্ফীত হয়ে। এ-প্রাণোচ্ছ্বাসধারা রোধ কোরতে পারবে-না—নিশ্চয় পারবে না—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ঐ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-ও ভাবী-কালের দুঃসহ এক জাগরণ-ক্ষণে। "মা যা হবেন" তার স্পন্দিত স্বরূপ পশুপতির মানস-চোক্ষে আজ বুঝি ধরা পড়ে গেল!

বিনয়-বাদল-দীনেশ যে দলে ছিলেন

বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত এবং বাদল (সুধীর) গুপ্তর নাম বাঙালীর ঘরে ঘরে ধ্বনিত হলেও তাঁদের সম্পূর্ণ কর্ম্ম-কথা কারোই তেমন কোরে জানা নেই। জানা থাকতেও পারে না। কারণ, সকল বিপ্লবী শহিদেরই মত তাঁদেরও যা-কিছু কাজ সংঘটিত হয়েছে গোপনে, লোকচক্ষুর অগোচরে। তাঁদেরকে বুঝতে হলে, তাঁদের কর্ম্মকথা জানতে হলে—তাঁদের দলের ইতিহাস কিছুটা অন্তত জানা দরকার।

এ প্রসঙ্গে তাই বিনয়-বাদল-দীনেশ যে-বিপ্লবী দলের ছিলেন সভ্য ও স্বেচ্ছাসৈনিক, আমরা সে-দলের সংক্ষিপ্ততম পরিচয় দেবার চেষ্টা কোরবো।

আজ একথা কারো অজানা নেই যে, স্বদেশী যুগের (১৯০৫) পূর্ব্বেই বাঙলা দেশে গুপ্ত সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বাঙলা দেশে প্রধানত দুইটি দল গড়ে উঠেছিল—একটির নাম 'যুগান্তর দল', অপরটিকে বলা হত 'অনুশীলন সমিতি'। 'যুগান্তর' নাম অবশ্য সরকারের দেওয়া। সারা বাঙলা দেশের জিলায় জিলায় বহু বিপ্লবীদল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই দলগুলি একত্রে একটি বৃহত্তর দল-সমাবেশে রূপ নিয়ে বিপ্ললী-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। ইংরাজের সরকারী রিপোর্টে শেষোক্ত দলসমাবেশকে উহার মুখপত্র অধুনালুপ্ত "যুগান্তর" নামক পত্রিকার নামানুসারেই বলা হয় যুগান্তর দল। ক্রমে দলের কর্ম্মীগণও উক্ত নামই (পার্টির পরিচয় দিতে গিয়ে) গ্রহণ করেন স্বেচ্ছায় ও স্বাভাবিক ভাবে।

বিনয়-বাদল-দীনেশের দলও প্রাগ্‌-স্বদেশী যুগে বাঙলার অপরাপর বিপ্লবী দলগুলির মত সংগঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ যুগস্রষ্টাদের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি তরুণ ঢাকা শহরে প্রথম এর পত্তন করেন। এই তরুণ নেতার নাম শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘোষ। এ-দলের তেমন কোন নামকরণ প্রথমে হয়নি, হবার প্রয়োজনও ছিল না। হেমচন্দ্রের জন্মভূমি বরিশাল জিলায় হলেও প্রধান কর্ম্মস্থল ছিল তাঁর ঢাকায়। দুঃসাহসে দৃপ্ত এই তরুণ

দুই

গুটিকয়েক কিশোর সঙ্গী নিয়ে যেদিন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার বাঙলাকে বুঝবার ক্ষমতা আজকের সাধ্যায়ত্তে নেই। তখনকার অন্ধকারাচ্ছন্ন আশাহীন ও সামর্থ্যশূন্য বাঙলায় বাঙালী তথা ভারতবাসী যুবসমাজকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনে যে দুর্দ্দম নেতৃত্বের প্রয়োজন, তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তরুণ হেমচন্দ্রের মধ্যে ছিল। কাজেই স্বল্প সংখ্যকের এই দল সংঘশক্তিতে বৃহত্তর হতে হতে ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে বাঙলার বিপ্লবী-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান করে নিল। এই দল 'যুগান্তরে'র সঙ্গে অর্থাৎ বাঙলা দেশের বিভিন্ন দলগুলির সমাবেশের সংগে একত্রিত হয়েই ছোটবড় সকল কাজ করে আসছিল। এমন সময় ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ লেগে গেল। দলের কোলকাতাস্থ প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীশ পাল (এখন স্বর্গগত) এবং হরিদাস দত্ত। এঁরা হেমচন্দ্রের নির্দ্দেশ মত যতীন মুখার্জ্জির সঙ্গে দল হিসেবে যুক্ত হয়ে তৎকালীন বিপ্লবী চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। হরিদাস দত্ত বিপ্লবীদের মধ্যে একান্ত পরিচিত কর্ম্মী। দিনেদুপুরে ডালহৌসি স্কোয়ারের মত জায়গায় 'রডা কোম্পানি' থেকে গাড়ী বোঝাই 'মাউজার' পিস্তল ও বুলেট সরিয়ে আনার দুঃসাহসী ইতিহাসে হরিদাস দত্তের অবদান অক্ষয় হয়ে আছে। নেতা যতীন মুখার্জ্জি হরিদাস দত্তের সাহসিকতায় ও কর্ম্মনৈপুণ্যে খুশী হয়ে একটি রাইফেল তাঁকে উপহার দেন। সেনানায়কের এ উপহার মুক্তিসৈনিকের রক্তে কি আকুলতা এনেছিল তার আভাস আজও বৃদ্ধ দত্তমহাশয়ের সংগে উক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখে অনুভূত হয়।

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবচেষ্টা তথা 'জর্ম্মান্ কন্সপিরেসি' ব্যক্ত ও ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় যে পুলিশী অত্যাচার বাঙলার বুকে সেদিন নেবে এসেছিল তার নিষ্ঠুর ইতিহাস বাঙালীর অজানা নয়। দলে দলে যুবক বিনা বিচারে বন্দী হলেন। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হেমচন্দ্র 'তিন আইনে' আটক হলেন, হরিদাস দত্ত প্রমুখের সশ্রম কারাদণ্ড হল এবং দলের বহু বন্ধু পলাতক অবস্থায় নানা দুঃখ ও অব্যবস্থায় কাল কাটাতে লাগলেন।...

ক্রমে যুদ্ধ-সমাপ্তির দিন সমাগত হল। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেলেন। হেমচন্দ্রও দীর্ঘকাল পর কারামুক্ত হয়ে ফিরে এসে দেখলেন যে দল বোলতে তঁ

তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। হেমচন্দ্রের হিসেবে যাঁরা পলাতক ছিলেন অথবা যাঁরা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা পুলিশের পরিচিত বোলেই গুপ্ত-সমিতি গড়বার কাজে অনুপযুক্ত। তা ছাড়া যে সামান্য ক'টি কর্ম্মী পুলিশের কাছে অজ্ঞাত থেকেই বাহিরে সহজ-জীবন যাপন কোরছিলেন তাঁদেরও অনেকে অর্থ-কৃচ্ছ্রতায় ও নেতৃত্বের অভাবে অকর্ম্মণ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ঢাকা জিলায় কয়েকটি কর্ম্মী অনলস চিত্তে অপেক্ষা কোরছিলেন নেতার ফিরে আসবার ক্ষণটির জন্যে। খগেন দাস, সুরেন বর্দ্ধন, কৃষ্ণ অধিকারী প্রমুখ বিপ্লবীরা অতি সংগোপনে ও ধীরে ধীরে অথচ সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংগঠন-কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে আলিমদ্দিন সাহেব ওরফে মাষ্টার সাহেব নামে একটি মুসলমান যুবক ছিলেন অন্যতম। দারুণ যক্ষ্মারোগে অবশ্য যৌবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই তরুণের সংগঠন ক্ষমতা ছিল সুন্দর, মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষণ-শিক্ষা ছিল প্রশংসনীয়। এঁর মারফতে অতি সহজতায়ই সেই কালেও মুসলমান কর্ম্মীগণ দলীয় সভ্যসংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। তাঁরা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দল গড়ে ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এক স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন এবং আদর্শ-ই হেমচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ অন্তে বন্দীজীবন থেকে দলের নেতৃবৃন্দ ফিরে আসতেই ঢাকার কেন্দ্রকে আশ্রয় কোরে নতুনতর জীবন-দ্যোতনায় দল সংগঠনের চেষ্টা শুরু হলো এবং দলের নেতা ও কর্ম্মীরা স্থির কোরলেন যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বিরাটতর দল না গড়ে কোনো 'ওভার্ট্ য়্যাক্ট্'-এর প্রশ্রয়ই তাঁরা দেবেন না। এমন কি বাঙলার অপরাপর বিপ্লবী দলগুলিও যদি ব্যাপকতর ভাবে য়্যাক্‌শান কোরবার পরিকল্পনা গ্রহণ কোরে হেমচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদেরকে সাথী রূপে কামনা করেন তবুও তাঁরা তাঁদের নিজস্ব তৈয়েরি সম্পূর্ণ না হতে সংকল্পচ্যুত হবেন না।

হেমচন্দ্র জানতেন যে বিপ্লবীদলের প্রধানতম শক্তি নিহিত থাকে তার সংগোপনতায়। সত্যিকারের সিক্রেট্ পার্টি না গড়তে পারলে ইংরেজের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং এই সিক্রেসি অপরাপর দলের বিপ্লবীদের সম্পর্কেও পালন করা সমান প্রয়োজন। তাই তিনি প্রচার কোরে দিলেন যে

তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ রাজনীতি পরিত্যাগ কোরে আত্মিক সাধনায় মন দিলেন। শুধু প্রচার নয়, তাঁদের কার্য্যকলাপেও লোম্যান-টেগার্টের গুপ্তচরেরা পর্য্যন্ত স্থির কোরে ফেলল যে রাজনীতি ছেড়ে হেমচন্দ্র ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দিয়েছেন এবং তাঁর বন্ধুগণ রুজিরোজগারের ধান্দায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণ সংসারীর ধাপে চলে গেছেন।

হেমচন্দ্র ঢাকা থেকে বাস উঠিয়ে কোলকাতা চলে এলেন। শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, সুরেন বর্দ্ধন, হরিদাস রায় প্রমুখ নামী কর্ম্মীবৃন্দ ইত্যবসরে সক্রিয় রাজনীতি (দলেরই নির্দ্দেশে) স্থগিত রেখে শহরে বা সুদূর পল্লীতে নিজেদের স্থান কোরে নিলেন। দলের (তৎকালে পুলিশের অজ্ঞাত) নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী প্রমথ চৌধুরী, প্রমথ চক্রবর্ত্তী, কালিদাস ঘোষ এবং পরে অনিল রায়, সত্য গুপ্ত, রসময় শূর ভবেশ নন্দী, প্রফুল্ল দত্ত ও মণীন্দ্রকিশোর রায়ের পরিচালনায় যে সংঘ-পরিব্যাপ্তি অবিচলিত শক্তিতে ঢাকা ও কোলকাতায় বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল, তার আওতায় আসা বিপ্লবী সভ্যদের সংগে হেমচন্দ্র-হরিদাসদত্ত প্রমুখ নেতারা তখন নেহাৎ প্রয়োজনে অতি সংগোপনেই যোগাযোগ রক্ষা কোরে যেতেন।

পুলিশের চক্ষে একান্ত সাফল্যে ধুলি দিয়ে এই দল সকলের অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চয় কোরে চলল। এঁরা বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত শুধু নয়, কর্ম্মনিরতও হতেন অন্ধকারে, রাত্রিনিশীথের গোপন পরিবেশে। কিন্তু দিনের আলোয়ও এঁদের যে পরিচয় ছিল-না তা নয়। সেখানে এঁরা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে কাজ কোরতেন জনকল্যাণের জন্যে, আর্ত্তের সেবায়। ১৯২১ ও ১৯২২ সালের মধ্যে প্রথমে **'Social Welfare League'**, পরে 'শ্রীসংঘ,' 'শান্তি সংঘ' ও 'ধ্রুব সংঘ' নামে এঁরা কয়েকটি সমাজ সেবার প্রতিষ্ঠান গড়েন ঢাকা শহরে। এই সংঘগুলোর মারফতেই এই দলের জনহিতকর কাজগুলি সম্পন্ন হতো। শহরের সর্ব্বত্র উচ্চশিক্ষিত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, দুঃসাহসী ও চরিত্রবান জনকল্যাণকামী কর্ম্মীরূপে এই দলের কর্ম্মীদের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। সহরের পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়ামাগার খুলে নিয়মিতভাবে ডন-কুস্তি এবং লাঠি ও ছোরা খেলার চর্চা কোরে এঁরা বস্তুতই সাধারণ যুবকদের জীবনেও স্বাস্থ্যরক্ষার মান উন্নততর পর্য্যায়ে তুলে দিয়েছিলেন।

পাঁচ

এই দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে এই দলই সর্ব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে মেয়েদের মধ্যে বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তন করেন। লীলা নাগের (বর্ত্তমানে 'রায়') নেতৃত্বে, 'দীপালী সংঘে'র মারফতে এই দল বহু মহিলা কর্ম্মীকে বিপ্লব-কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত কোরে বাঙলা দেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। একই কর্ম্মক্ষেত্রে অজস্র নারী ও পুরুষ অসংকোচে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ কোরবে, সানন্দে মৃত্যুকে বরণ কোরে শাশ্বত জীবন-ধারাকে প্রতিষ্ঠিত কোরবে —এই কল্পনা কার্য্যত তৎকালীন বিপ্লবীদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কারণ, বাঙলার বিপ্লবীদলগুলোর অধিকাংশ নেতাই তখনো ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু হেমচন্দ্রের দলটি রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারা থেকে ক্রমশ মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং এই মুক্তি-লাভের মূলে ছিল হেমচন্দ্র ও নেতৃস্থানীয় তাঁর বন্ধুদের উদার মন ও যুগোপযোগী পরিবেশকে স্বীকার কোরে নেবার শিক্ষা ও ক্ষমতা এবং বিশেষ কোরে অনিল রায়ের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ ভাবপ্রসারতা। এঁদের নবতর দৃষ্টিভংগি ও প্রগতিশীল মতবাদ দলের স্বরূপকে বিভা দান করেছিল এবং এই বিভামণ্ডিত দলের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল লীলা নাগের মত প্রতিভাদীপ্তা মহিলাকে কর্ম্মীরূপে লাভ কোরে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবতীর্থে নূতনতর ধারাস্নান সংরচনা করা।

১৯২৬ সাল। তরুণ সমাজের কাছে ধীরে ধীরে নিজেদের মতবাদ পৌঁছে দেবার সময় আগত। এই দল উক্ত উদ্দেশ্যে **'বেণু'** নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত কোরলেন। ৯৩।১।এফ-নং বৈঠকখানা রোড (কলিকাতা) থেকে এই কিশোর-মুখপত্রখানার প্রকাশ বাঙলা দেশের কিশোর-সাহিত্যে এক বিপ্লব এনে দিল। অভূতপূর্ব্ব এক জীবনদ্যোতনায় বাঙলার কিশোর-কিশোরীর প্রাণ দুলে উঠল। সেই প্রাণস্পন্দনের মূর্ত্ত প্রতীক মৃত্যুহীন শহিদকুল। অনন্যসাধারণ এই কাগজখানার স্বরূপ আজকের বাঙলায় উপলব্ধি করার উপায় নেই। এককালে 'বন্দোমাতরম্', 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' কাগজ যেমন বাঙালীকে উন্মাদ কোরেছিল, 'বেণু'-ও ঠিক তার কালে কিশোর-তরুণকে ততোধিক পরিব্যাপ্তিতে উন্মাদ কোরেছিল। 'বেণু'র বৈশিষ্ট্যে সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র বিস্ময় মেনেছিলেন। মুগ্ধ শরৎচন্দ্র হেমচন্দ্রের

সংগে বন্ধুত্ব ঘটিয়ে 'বেণু'র কর্ম্মীদেরকে ছোট ভাইগুলোর মত ভালবেসে ফেলেছিলেন। তৎকালে শরৎচন্দ্রের লেখা 'বেণু' ব্যতীত অপর কোন কাগজেই বড় একটা বেরুতো না। চিঠি ও প্রবন্ধাদি ছাড়া 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানিই তিনি ধারাবাহিক রূপে 'বেণু'তে প্রকাশিত হতে দিচ্ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ কোরবো। তখন কেবলমাত্র মাসিক 'ভারতবর্ষে'ই শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' অতি মন্থর গতিতে মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে। অনেক হাঁটাহাঁটির পরে ও সাধ্যসাধনা কোরে এবং যথেষ্ট দক্ষিণার বিনিময়েও প্রতি মাসে ঐ লেখাটি ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ নিয়মিত ভাবে বার কোরতে পারছেন না, অথচ সেই সময়ই 'বেণু'তে প্রতিমাসে যথারীতি 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হয়ে চলছে। খেয়ালী শরৎচন্দ্রের এই খেয়ালে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে একদিন ভারতবর্ষের উৎসুক কর্ত্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন কোরে জানতে চান যে কত অর্থের বিনিময়ে তিনি 'বেণু'র ছোকরাদেরকে তাঁর লেখা দিচ্ছেন। উত্তরে স্মিতহাস্যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলেন : 'ওরা দেবে টাকা? কোথায় পাবে? ওদেরকেই আমার সাহায্য করা উচিত—কিন্তু তা পারি কই?' একটু স্তব্ধ থেকে আবার বলেন শরৎচন্দ্র : 'ওদের সঙ্গে যে আমার রক্তের পরিচয়, জন্মান্তরের আত্মীয়তা—ওদের কাছ থেকে নেব টাকা? বল কি তোমরা!'

শরৎচন্দ্র বহুদিন 'বেণু'র কর্ম্মীদেরকে বলেছেন : "দ্যাখো, তোমরা বড় দেখে একটা বাড়ি নিয়ে 'বেণু'র আপিস কর—আমি প্রায়ই যাবো, কোলকাতা গিয়ে ওখানেই উঠবো—দেখবে, বাঙলার সাহিত্যিকগোষ্ঠী তোমাদের সঙ্গে কেমন আত্মীয়তা করেন।" সম্বলহীন 'বেণু'র কর্ম্মীদের পক্ষে বড় বাড়ি ভাড়া কোরে আপিস খুলে শরৎচন্দ্রকে অমন ভাবে পাবার সৌভাগ্য না হলেও শরৎচন্দ্রের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 'বেণু'র বিশিষ্টতা ও নির্ভীক আদর্শবাদ প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তৎকালে কবিগুরু থেকে শুরু কোরে বাঙলার ছোট-বড় সাহিত্যসেবীগণ 'বেণু'কে আপন প্রতিষ্ঠান রূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

'বেণু'র উপর রাজরোষ প্রকটতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উহার (বেণুর) প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছিল। পর পর সম্পাদকদের দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ

প্রেস ও কাগজের উপর অর্থদণ্ড, উহার (বেণুর) পৃষ্ঠপোষক (এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সময় 'বেণু'র সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে শরৎচন্দ্রের পিস্তল ও রাইফেলের লাইসেন্স পুলিশ কর্ত্তৃক বাতিল হয় এবং উক্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়) এবং গ্রাহক-গ্রাহিকাদের অনেকের উপরই পুলিশের নির্যাতন সত্ত্বেও 'বেণু' প্রায় ছয় বৎসর জাতির সেবায় সার্থকতা লাভ করে। শেষের দিকে নিজস্ব প্রেস সহ 'বেণু' প্রথমে ঝামাপুকুর এবং পরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে উঠে এসেছিল। কিন্তু পরিশেষে ১৯৩১ সালের শেষাশেষি সরকারের অনাচারে 'বেণু'র প্রচার বন্ধ হতে বাধ্য হয়।

দলের কর্ম্মীদের মধ্যে এই পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব বর্ত্তেছিল যাঁদের উপর তাদের মধ্যে বিশেষ কোরে আজ মনে পড়ছে রেবতী বর্ম্মণ (স্বর্গগত), নির্ম্মল গুহ, বারীন রায়, যতীশ গুহ (স্বর্গগত), নীরদ দত্তগুপ্ত, ইন্দু সরকার, শচীন ভৌমিক, মণি সেন, সুধীর ঘোষ, চারু ঘোষ, কৃষ্ণ সরকার, সুনীল সেনগুপ্ত, নিরঞ্জীব রায়, প্রসন্ন পাল, মাখন দত্ত, হরিপদ ভৌমিক, পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, রবি ভট্টাচার্য্য ও অশোক সেনের কথা। 'বেণু' প্রকাশের শুরুতে রেবতী বর্ম্মণের অক্লান্ত চেষ্টা, বেণুর নিজস্ব প্রেস হবার পূর্ব্ব পর্যান্ত নির্ম্মল গুহর 'ডেভেন্ হাম্ প্রেস' কর্ত্তৃক বিনা পয়সায় বেণু-সম্পর্কিত যাবতীয় ছাপার কাজ সম্পূর্ণ করার সার্থক প্রয়াস এবং উল্লিখিত বন্ধুবৃন্দ ও দলের সকল কর্ম্মীদের বেণুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার তপঃসিদ্ধ ইতিহাস আজ যেন বর্ণঘন স্বপ্নের জাল বুনে যায়।

বেণু কেবলমাত্র একখানা মাসিকপত্র ছিল না। বেণু ছিল একটি যুগের সাধনাপ্রোজ্জ্বল আক্ষরিক রূপ। তখনকার কোন প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের ভাষায়: **"It was an age itself !"** বেণুর অবদান বিপ্লবী বাঙলার প্রতি রক্তরেণুতে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র বাঙলায় তরুণতরুণীর অন্তরে বেণুর ধ্বনি যে সুর তুলেছিল তার প্রতিশ্রুতি চট্টগ্রামের অরণ্যপর্ব্বত থেকে শুরু কোরে বাঙলার জিলায় জিলায় এবং সর্ব্বশেষে দার্জ্জিলিঙ-এর লেবঙ-প্রান্তর অবধি রক্তাক্ষরে লিখিত হয়েছিল। সেই অগ্নিযুগের যত বহ্নিজ্বালা—বেণুর ধ্বনিতরঙ্গেরই তারা অভ্রান্ত স্বাক্ষর।

আট

এর পর বহু বৎসর অতীত হয়ে গেছে। দেশের অবস্থান্তরও ঘটেছে প্রচুর। কিন্তু বেণুর দরদী বন্ধুরা যে বেণুকে ভুলতে পারেন না তার প্রমাণ পেলাম প্রখ্যাত সাহিত্যিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বেচ্ছায় প্রেরিত একখানা পত্র থেকে। পত্রখানা লিখেছেন তিনি ১৯৪৫ সনের ১৬ই জুলাই 'বেণু'র প্রাক্তন সম্পাদককে প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায়। পত্রাংশ উদ্ধৃত হল:…নববর্ষ যে কেন আসেন তা জানি না—তাঁরও বোধ হয় চাকরি বজায় করা। 'যা পাই তা চাই না, যা চাই তা পাই না'! তাই তাঁর আসার কোন সার্থকতা দেখি না। ফাঁকা আওয়াজ অনেক পাই বটে, তাতে লোকের শ্রদ্ধা জাগে না।…এখন আমার প্রিয় ভায়েদের ভালবাসা জানাই, তোমাকে না জানালেও সে সঙ্গেই রইল। যেখানেই থাকি 'বেণু'-রব ভুলব না ভাই।—তোমাদের শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপর সেদিন (২৭-১২-৪৭) বম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চবিংশতি অধিবেশনের শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুত বিমল ঘোষ (মৌমাছি) তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে 'বেণু' সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তা এখানে উল্লেখ কোরবো। তিনি বলেছেন:…বাঙলা শিশু-সাহিত্যের অমন উজল আঙিনা আঁধার হয়ে আসছে দেখে রামানন্দবাবু প্রবাসীতে 'পাততাড়ি' নাম দিয়ে ছোটদের বিভাগ খুললেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলো না। তখনই বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ক্লীবত্বের অবসান ঘটাতে বেরুলো 'বেণু' নামে কিশোর ও তরুণদের এক পত্রিকা—যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠলো দেশের রাজনৈতিক জাগরণের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই সঙ্গে শিশু-কিশোর যুবক-যুবতীদের জাগিয়ে তোলার মত সাহিত্যের সুর। আমরা, তখন যাদের 'খোকাখুকু' পড়বার বয়স পার হয়েছিল, যাদের মন বিপ্লবের চেতনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—যারা বুঝতে পারতেম তখনই যে, এখন আমাদের ডিটেকটিভ ও কাল্পনিক এ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়ে কল্পনাবিলাসী হওয়া উচিত নয়, যারা খুঁজছিল জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত ও সবল করার উপাদান—তারা তা সর্ব্বপ্রথম পেলো এই 'বেণু' পত্রিকাতেই। 'বেণু' কিশোর-মনে নির্ভীকতা ও স্বৈরতন্ত্রী-শাসকের বিরুদ্ধে শক্তি-সংগঠনের নূতন বীজ বপন করল। এ-কাজে সহযোগিতা করলেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সেই কঠোর আমলাতান্ত্রিক যুগে এই পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখা শক্ত হলো। রাজরোষের প্রবল চাপে 'বেণু' নিছক শিশু-পত্রিকা না হলেও দিয়ে গেল বাঙলার ছোটদের সাহিত্যের নতুন পথ-নির্দ্দেশ। সেই পথ ধরে আমরা কত লেখাই লিখলাম—আর সেই সব লেখা নিয়ে সে-যুগের দু'টি বিশিষ্ট শিশু-পত্রিকার সম্পাদকের দরবারে কত ছুটাছুটি করলাম, কত দরবারই না করলাম, কিন্তু তাঁরা বিশেষ কোনো কারণেই হয়তো আমাদের মত নতুন বিপ্লবীদের লেখা ছাপলেন না।···

এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য।

বাঙলা দেশে সর্ব্বদল নির্ব্বিশেষে নারী-বিপ্লবিনীদের আবির্ভাব ও তাঁদের কৃত ডাইরেক্ট্ য়্যাক্শানগুলোর মূলে এই দলের যে বিশিষ্টতর অবদান রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বেণুর আহ্বান নারী-পুরুষ প্রত্যেক তরুণ-মনের কাছেই অপ্রতিহত আবেগে পৌঁছলেও বাঙলার মেয়েদেরকে বম্-পিস্তল হস্তে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহ্বান বিশেষ কোরে জানিয়েছিল বেণুগোষ্ঠীর দ্বারা প্রকাশিত একখানা ছোটগল্পের পুস্তক। **"চলার পথে"** তার নাম। পুস্তকের প্রারম্ভে ছিল এক ভয়ঙ্কর সুন্দর শৃঙ্খলমুক্তা নারীর চিত্র—তার নীচে লিখিত ছিল, "ভাঙ্গনের পালা শুরু হ'লো আজি, ভাঙ্গ ভাঙ্গ শৃঙ্খল!"··

'চলার পথে' বইখানা বেরিয়েছিল ১৯২৯ সালের শেষের দিকে। তার ভূমিকা-পত্রে সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র সস্নেহে লিখেছিলেন: 'পথের দাবি' যখন সরকারে বাজেয়াপ্ত হয় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন তোমার বক্তব্য যদি প্রবন্ধাকারে লিখতে তার মূল্য অল্পই থাকতো। কিন্তু গল্পচ্ছলে যা দিয়েছো দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই। 'চলার পথে'র সম্বন্ধেও আমি এই আশীর্ব্বাদ করি। এবং বলি, বাঙলা দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েদের এই বইখানি পড়ে দেখা উচিত। (২০শে অগ্রহায়ণ, '৩৬)।

কিন্তু 'চলার পথে' প্রকাশিত হওয়া মাত্রই সরকার তাকে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ফল তাতে সরকারের পক্ষে শুভকর হয়নি। জীবনযাত্রায় নতুনতর প্রাণসত্তার দ্বার এ-পুস্তকখানাই মুক্ত কোরে দিল। 'চলার পথে'র নায়িকাবৃন্দ বাঙলার যৌবন-

ধর্ম্মের আদর্শ প্রতীক হয়ে বাঙালীর মেয়েদেরকে হাতছানি দিল। তারপর বাঙলা দেশে বিপ্লব-ইতিহাসে নারীর যে দুর্দ্দান্ত চলার স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয় তা' তো সত্যি গল্পের সীমা পেরিয়ে বাস্তবের কঠিন রূপেই পৃথিবীর বিপ্লবী-সমাজকেও বিস্ময়মুগ্ধ করে দিয়েছে!

প্রত্যেক বিপ্লবীদলের জীবনেই অজানিত শহিদেরও কর্ম্মকথা লিখিত থাকে। তাঁরা কবির ভাষায় যথার্থই "**unwept unhonoured and unsung**" রূপে অনামী হয়ে থাকেন। এই দলের কথা লিখতে গিয়ে আজ অমনই অজ্ঞাতনামা দু'টি তরুণ শহীদের কথা মনে পড়ে। দল সংক্রান্ত কোন বিপদসঙ্কুল কাজেই ঢাকার নৃপেন দত্ত এবং ফরিদপুরের বীরেন রায়-চৌধুরী এই যুগে নেতার আদেশে একান্ত আনুগত্যে একদা বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তর বঙ্গের এক অঞ্চলে। গভীর নিশীথের অন্ধকারে বিলীয়মান সেই যুবকদ্বয়ের শরীরী-রূপ প্রভাত সমাগমে আর লোকসমক্ষে ফিরে আসেনি। অজ্ঞাতের অন্ধকারে চিরদিনের জন্যে তাঁদের ঘটেছিল জীবন্ত-সমাধি। দু'একজন ব্যতীত দলের লোক পর্য্যন্ত বহুকাল জানেন নি তাঁরা কোথায়, তাঁদের সংবাদ-ই-বা কি! বাপ-মা, আত্মীয়-বন্ধু হয়তো কত নিশি জাগরণে কাটিয়েছেন তাঁদের অপেক্ষায়—কিন্তু সঠিক সংবাদ কাউকে জানানর যে উপায় ছিল না! বিপ্লবীদলের গোপন জীবনের নিয়মানুবর্ত্তিতা এমনই কঠোর, এমনই নির্ম্মম যে, আজ সর্ব্বসাধারণের কাছে সেই শহিদদ্বয়ের শুধু মাত্র নামোল্লেখ কোরবার সৌভাগ্য লাভে তুষ্ট থেকেই নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে কোরছি।

এক বৎসর পূর্ব্বে ফিরে যাবো। ১৯২৮ সাল। এ বৎসর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের দান বাঙলার রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসে বর্ণদীপ্ত হয়ে আছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার কারাজীবন ভোগ কোরে নানা দলের বিপ্লবী-কর্ম্মীবৃন্দ নতুন কোরে মুক্তিলাভ করেছেন। 'বেণু'-গোষ্ঠীর কোন বিপ্লবী নেতা বা কর্ম্মী এ-যাত্রায় জেলে যান নি। পূর্ব্বেই বলেছি যে, সকলের অজ্ঞাতে এ দল সমগ্র বাঙলা দেশে এবং বহির্বাঙলায় সংগঠন-কার্য্য সম্পন্ন করে যাচ্ছিলেন। ভবিষ্যতের বিপ্লব-রচনার প্রস্তুতি অব্যাহত ছন্দেই এ দলের পক্ষ থেকে নিরূপিত হচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কার্য্যপদ্ধতি নিয়ে দলের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীদের মধ্যে একান্ত ভাবে

মতান্তর ঘটায় দলে ভাগাভাগির লক্ষণ দেখা গেল। অনিল রায় ও লীলা নাগের নেতৃত্বে কিছু কর্ম্মী আলাদা হয়ে 'শ্রীসংঘ' নামেই ভিন্ন রাজনীতিক-দল গড়ায় মন দিলেন। উক্ত কর্ম্মীদের মধ্যে অনিল ঘোষ, অনিল দাস, শৈলেশ রায়, রেণু সেন ও কমলাকান্ত ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই ভাগাভাগির ফলে স্বভাবতই মূল দল কিছুটা দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু দুর্নিবার কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মস্পৃহা এবং বিপ্লবাত্মক কর্ম্মবোধ মূল দলটিতে অজস্রতায় বর্ত্তমান ছিল বলেই উক্ত দুর্ব্বলতা সহজেই কেটে গেল।

'বি-ভি' দলের সর্বময় কর্ত্তা হেমচন্দ্র ঘোষ হলেও কার্য্যত সেখানে স্থূল ভাবে একক নেতৃত্ব বর্ত্তমান ছিল না। প্রধান কর্ম্মীদের এক সমবেত নেতৃত্বে সমগ্র দলকে কর্ম্মবুদ্ধ প্রাণচঞ্চল কোরতো। এ সমবেত-নেতৃত্ব বা Combined Leadership-এর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেখানে একটি মানুষই যেন এক নেতৃত্বে সমগ্র দলের বাস্তব প্রতিনিধি রূপে কাজ করে যাচ্ছেন—মতের বা মনের অমিল কার্য্যক্ষেত্রে কেউ কোন মুহূর্ত্তেই হেমচন্দ্র ও তাঁর এই বন্ধুদের মধ্যে দেখে নি। 'বি-ভি'র এই কার্য্যকরী-কেন্দ্রের সভ্যরূপে হরিদাস দত্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী, রসময় শূর, সত্যগুপ্ত, মনীন্দ্র রায়, প্রফুল্ল দত্ত, জ্যোতিষ জোয়ারদার, যতীশ গুহ, সুপতি রায় ও নিকুঞ্জ সেনের নামই উল্লেখ কোরতে হয়। সত্যরঞ্জন বক্সী পাবলিক পলিটিক্স-এ দলের প্রতিনিধিত্ব কোরতেন। মীরা দত্তগুপ্তা মহিলা-বিভাগের ভার নিয়েছিলেন। ঢাকা ও কোলকাতায় অতি সন্তর্পণে ছাত্রীদের মধ্যে বিপ্লবের কাজ যাঁরা কোরতেন তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলা মজুমদার, সন্ধ্যারাণী দত্ত, উমা সেন ও কমলা দাসগুপ্তার নাম উল্লেখযোগ্য। এবং, কোলকাতা ও ঢাকায় ছাত্র-আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম শান্তিময় গাঙ্গুলি, স্বর্গীয় চিত্ত বিশ্বাস, সুধীন্দ্র পাল, অসিত ভোমিক, বকুল কর প্রমুখ। নির্ম্মল গুহ ও মণীন্দ্রনারায়ণ রায় (বিহারের তৎকালীন Search Light পত্রিকার সহকারী সম্পাদক) বাঙলার বাইরে দল-সম্প্রসারণে মনযোগী হলেন। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে শচীন ভৌমিক, মণি ভৌমিক, সুনীল সেনগুপ্ত, মালু বানার্জ্জি, কামাখ্যা রায়, বিনয় সেনগুপ্ত, মধু ভট্টাচার্য্য, নিরঞ্জীব রায়, সুকুমার ঘোষ, হরিদাস সেন, জিতেন সেন

(স্বর্গগত) প্রমুখ কর্ম্মীদের ধৈর্য্যে ও নৈপুণ্যে সংঘবনিয়াদ সুগঠিত হয়ে চলল। দীনেশ গুপ্তকে পাঠান হলো মেদিনীপুর অঞ্চলে। পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, হরিপদ ভৌমিক, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, অমর চাটার্জ্জি, কমেট দাসগুপ্ত, অমর সেন, ভূপতি মণ্ডল, ক্ষিতি সেন প্রভৃতি কিশোর বন্ধুদের সাহায্যে যে-দল তিনি ক্রমশ অদ্ভুত নিষ্ঠায় গড়েছিলেন তার রোমাঞ্চকর ইতিহাস আজতো সর্ব্বজনবিদিত। বিরাট বৈপ্লবিক প্রেরণায় ও প্রাণপ্রবণতার প্রাচুর্য্যে এই দল দিনের পর দিন সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধতর হয়েই চলছিল। এমন সময় সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে মেজর সত্যগুপ্তর প্রতিভাদীপ্ত নেতৃত্বে এ-দলের কর্ম্মীগণ বেঙ্গল্ ভলান্টিয়ার্স-এ স্বেচ্ছাসৈনিক রূপে যোগ দিয়ে বাঙলা দেশ জুড়ে ভলান্টিয়ার-মুভমেণ্ট পরিচালনার কার্য্যক্রম গ্রহণ কোরলেন। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বিপ্লবীদেরই কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হল। তন্মধ্যে বেণু'-গোষ্ঠীর বিপ্লবীগণ 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'কেই সর্ব্বনিষ্ঠায় বৈপ্লবিক ম্যুভমেণ্ট রূপে গ্রহণ কোরে স্বীয় কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করায় 'যুগান্তরে'র মত এ-দলকেও পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট 'বি-ভি' (Bengal Volunteers) নামে অভিহিত করেন। বিনয়-বাদল-দীনেশ বেণু-গোষ্ঠী তথা এই '**বি-ভি**' দলেরই সদস্য।

বাঙলা দেশে নিখুঁত সামরিক-কায়দার সঙ্গে বৈপ্লবিক আদর্শমগ্নতায় সংগঠিত স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর প্রথম পত্তন হয় সুভাষচন্দ্রের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' পরিচালনায়। এই বেঙ্গল-ভলান্টিয়ার্স সংগঠনে সত্য গুপ্তর অবদান অপূর্ব্ব। সমগ্র দেহমনের তপস্যাস্ফূরিত তাঁর সেনানীর মূর্ত্তি তৎকালে বাঙলার তরুণ রক্তে যে দুঃসাহসের বন্যা বহন কোরে এনেছিল তাকে বিপ্লবীর পরিকল্পনায় সেনা-বাহিনীর রূপ দিতে গিয়ে তিনি যথোপযুক্ত সাথী রূপে পেয়েছিলেন কয়েকটি কিশোর-তরুণকে। সেই তরুণ দলের মধ্যে কতিপয়কে স্মরণ কোরতে গিয়ে মনে পড়ে তেজোময় ঘোষ, জ্যোতিশ জোয়ারদার, বিনয় বসু, হারাণ দত্ত (স্বর্গগত), দীনেশ গুপ্ত, বাদল গুপ্ত, অশোক সেন, বীরেন ঘোষ, ননী চৌধুরীকে। নিয়মানুবর্ত্তিতার সুকঠোর শিক্ষায় শক্তিশালী হয়ে ইংরেজের শাসন-কাঠামোকে মারণ-আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে গঠিত 'বি-ভি'র যে গুপ্ত-বিভাগ তার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, প্রফুল্ল দত্ত, সুপতি রায় ও নিকুঞ্জ সেনের উপর। এই দায়িত্ব সুসম্পন্ন কোরতে

ায়ে ১৯৩১ সাল থেকে সবার অজ্ঞাতে দুঃখজর্জ্জরিত বিপদসংকুল অথচ রোমাঞ্চকর
়-পথে তাঁদের অধিকাংশের যাত্রা রচিত হয়েছিল তারই নাম **Underground অথবা**
.bsconders' World !

১৯৩০ সালের মধ্যে 'বি-ভি'র প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলো। চট্টগ্রামের বিজয়-দুন্দুভি
়রো আওয়ার' অতিক্রান্ত হবার সংকেত জানালো। টেগার্টের উপর বম পড়ল।
়রপর ১৯৩০ সালেরই ২৯শে আগষ্ট বি-ভি সর্ব্বপ্রথম আঘাত হানলো ব্রিটিশ
়াসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঢাকা শহরে লোম্যান ও হডসন্‌কে ঘায়েল কোরে। এরপর
পর্য্যুপরি '৩৪ সাল পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে এই 'বি-ভি'র বিপ্লবীগণ যে বিপ্লব-প্রচেষ্টার
দান্ত রক্তস্বাক্ষর দুঃসাহসিকতায় লিখে গেছেন তার তুলনা পৃথিবীর যে-কোনো
রাধীন জাতির মুক্তিলাভের ইতিহাসেই সহজলভ্য নয়। লোম্যান্, সিম্পসন, প্যাডি,
গলাস্, বার্জ্জ-এর জীবনে মৃত্যুর যবনিকা এঁরাই টেনে দেন। হড্‌সন্, নেল্‌সন,
়নাম, ভিলিয়ার্স, জন্‌সন, সার্ জন্ এণ্ডারসন এঁদেরই গুলির আঘাতে
। এ-দলেরই ছেলেরা দিনেদুপুরে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ঢুকে ইংরেজের পুলিশ
হিনীর সংগে যুদ্ধ করেন, মেদিনীপুর শহরে পর পর তিন জন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে
ত্যা করেন। ইউরোপীয়ান য়্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেণ্ট ভিলিয়ার্সকে গিলিণ্ডার
ফিসে (ক্লাইভ ষ্ট্রিটে) ঢুকে আহত কোরে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যেতে এঁরাই
করেন। এঁদেরই বিনয়, বাদল ও দীনেশ বিরচিত অলিন্দ-যুদ্ধ স্বচোক্ষে
়খে বিহ্বল কণ্ঠে সিভিলিয়ান প্রেস-অফিসার টাফ্‌নেল ব্যারেট তৎকালে বোলেছিলেন :
–"**My tongue stuck to the roof** !"···

'বি-ভি'র সংগঠন শক্তি ও প্রস্তুতি এত নিখুঁত হয়েছিল যে, বছরের পর বছর
রেজ রাষ্ট্রশক্তির শাসন-সংস্থাকে কঠোরতম আঘাত দিতে গিয়ে, সাম্রাজ্যলোভী
রেজের বর্ব্বর অত্যাচারে বিদ্ধস্ত হতে থেকেও, অন্যান্য দলগুলোর মত সে ভেঙ্গে
য় নি। এক হাতে বিষ অপর হাতে রিভলভার নিয়ে কর্ম্মপ্রবুদ্ধ হওয়া এই
লরই প্রদর্শিত দুঃসাহসী টেক্‌নিক। ইংরেজ হত্যার যে তাণ্ডব 'বি-ভি' শুরু
রেছিল তাতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলার পথ কর্ম্মীরা কোন সময়েই খোলা
খেন নি। "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই"—

এই বাণী তৎকালীন 'বি-ভি'র কর্ম্মীদের উপলব্ধ বাণী। তাই মৃত্যুপণ কোরে তাঁদের কর্ম্মী যখন আত্মদান কোরতে যেতেন তখন মনে হতো তাঁর সকল চৈতন্য যেন দৃপ্ত কণ্ঠে বলছে: "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা।" এ সর্ব্বনাশ মামুলী সর্ব্বনাশ নয়—এ সর্ব্বনাশ নটরাজের বিশ্বধ্বংসী নৃত্যচ্ছন্দের সংগে ছন্দিত নবতর জীবন-জ্ঞাপক সর্ব্বনাশ।

এ-দলের শহীদ হলেন বিনয় বসু, বাদল (সুধীর) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, নৃপেন দত্ত, বীরেন রায়-চৌধুরী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, অনাথ পাঞ্জা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্ম্মলজীবন ঘোষ, নবজীবন ঘোষ, মতি মল্লিক, ভবানী ভট্টাচার্য্য, অসিত ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক ও গোপাল সেন। 'বি-ভি'র কর্ম্মনৈপুণ্য ও নিখুঁত সংঘশক্তির কথা উল্লেখ কোরতে গিয়ে প্রথমেই স্বীকার কোরতে হয় দলীয় কর্ম্মীদের অদ্ভুত মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষার সামর্থ্য এবং সংগঠন-ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য। এঁদের **resourcefulness** সাধনালব্ধ বস্তু বোলেই এঁদের কর্ম্মসাফল্যও অশ্রুতপূর্ব্ব। একই ব্যক্তি পুলিশের সর্ব্বময় কর্ত্তা লোম্যানকে ঢাকা শহরের জনাকীর্ণ মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে দিবালোকে হত্যা কোরে ও ঢাকার জাঁদরেল এস-পিকে চূড়ান্ত রূপে ঘায়েল কোরে পালিয়ে এসে তিন মাস কোলকাতার বুকেই লুকিয়ে থেকে জেল-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা সিম্পসনকে ইংরেজ শাসকদের দুর্ভেদ্য দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ ঢুকে হত্যা কোরলেন—এমন কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পৃথিবীর যে-কোন দেশের বিপ্লব-ইতিহাসেই খুঁজে পাওয়া ভার। এই কর্ম্মের জন্য বিনয়কৃষ্ণ বসুর কৃতিত্ব অতুলনীয়—কিন্তু এ-কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না যদি 'বি-ভি'র মত কোন নিখুঁত বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে তিনি কর্ম্মপ্রবৃত্ত না হতেন। মেদিনীপুর শহরে প্যাডিকে হত্যা কোরেও কেউ ধরা পড়লেন না এবং 'ব্ল্যাক-এণ্ড-ট্যান' নীতি অনুসৃত দুর্দ্দান্ত ব্রিটিশ-শাসনে বিভীষিকাগ্রস্ত ঐ ক্ষুদ্র শহরেই পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে পর পর ডগলাস ও বার্জ সাহেবকে হত্যা করার কৃতিত্ব একমাত্র 'বি-ভি' জাতীয় একটি বিপ্লবী দলের সভ্যদের পক্ষেই সম্ভব। পুলিশ তো দূরের কথা, দলের অধিকাংশ সভ্যও তখন জানতো না যে, বিমল দাসগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষই প্যাডিকে হত্যা করেন।

বিমল দাসগুপ্তই কোলকাতা শহরে পলাতক থেকে অতঃপর ভিলিয়ার্সকে আহত কোরে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড সানন্দে বরণ করেন। অধিকন্তু ডগলাস হত্যায় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য অকুস্থলে ধরা পড়ে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিলেও তাঁর সহকর্মীর পরিচয় পুলিশ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জানতে পারে নি। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যেরই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসের সৌকর্য্যে কাজ হাসিল কোরেই প্রভাংশু পাল পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। প্রদ্যোতের একান্ত বন্ধু ফণী দাসকে প্রভাংশু ভ্রমে পুলিশ ধোরে নিয়ে যায়। ফণী দাসের উপর পুলিশের জুলুম ইংরেজ বর্ব্বরতার চরম নিদর্শন। দিনের পর দিন তার উপর মারধোর চলতে থাকে স্বীকারোক্তি বার করার অভিসন্ধি নিয়ে। একদিন সমানে ডাণ্ডা চালিয়ে ও লাথি-গুঁতো মেরে তাকে শেষটায় মৃত ঠাউরেই পুলিশ আঁৎকে উঠে মার বন্ধ কোরে দেয়। কিন্তু এত সত্ত্বেও 'বি-ভি'র এই কর্ম্মীর কাছ থেকে একটি তথ্যও পুলিশ আদায় কোরতে পারেনি। ফণী দাস বেঁচে গেলেও এবম্বিধ পুলিশী অত্যাচারের ফলেই আর একটি বিদ্রোহী কিশোর বন্ধন-কালের অসহায় অবস্থায় নিহত হন। সেই তরুণ বীরের নাম নবজীবন ঘোষ। শহিদ নির্ম্মলজীবনের আপন ভ্রাতা হলেন এই নবীন শহিদ। 'বি-ভি'র মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষার চরম প্রমাণ যুগিয়ে এঁরা 'বি-ভি'র বিপ্লব-আদর্শকে অক্ষয় কোরে রেখে গেছেন। এ-ছাড়া এই সূত্রে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত 'বি-ভি'র কর্ম্মী শান্তি সেন, সুকুমার সেন, কামাখ্যা ঘোষ, সনাতন রায় ও নন্দদুলাল সিংহের উপর অত্যাচারও সামান্য হয় নি—কিন্তু 'বি-ভি' দলের মন্ত্রগুপ্তি-শিক্ষার মর্য্যাদা এঁদের ক্ষেত্রেও ছিল অক্ষুণ্ণ।

পাঁচ বৎসর ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক রূপে বাঙলার নানা জিলায় য়্যাকশানের পর য়্যাকশান কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সমাপিত করে যাওয়ার এবং পুলিশের সর্ব্বগ্রাসী নির্য্যাতন সত্ত্বেও দলের কাঠামোকে অক্ষয় রাখার নজির বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসে এই 'বি-ভি' প্রতিষ্ঠিত কোরে গেছে। সর্ব্বশেষে এণ্ডার্সনী আমলে, সমগ্র বাঙালী জাতি যখন সরকারী নির্য্যাতনে পঙ্গু এবং পুলিশের নজরে বন্দী, তখন সবার অলক্ষ্যে ক'টি তরুণ ও একটি তরুণী সমগ্র প্রতিরোধ সংগোপনে তুচ্ছ কোরে দার্জিলিঙ শহরে পৌঁছে অগণিত সান্ত্রী ও গুপ্তচর

পরিবেষ্টিত লাটসাহেবের দুর্ভেদ্য পরিপার্শ্বে ঢুকে এণ্ডারসনের মত দুর্দ্দান্ত লাটকে গুলির আঘাতে নৃত্য করালেন! এই অপ্রত্যাশিত দুর্দ্দান্ত কর্ম্মের পশ্চাতে যে কতদূর কুশল ব্যবস্থাপনের প্রয়োজন ছিল তা বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়েও আজ বিস্ময় মানতে হয়। এই কৃতিত্ব লাভের পরম সৌভাগ্য সেই কালে 'বি-ভি'রই হয়েছিল।

'বি-ভি'র তৎকালীন বৈপ্লবিক কর্ম্মকাণ্ড 'এণ্ডারসন্ শুটিং' তথা 'লেবং রেইড্'-এ এসে স্থগিত হয়। ভবানী ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী, উজ্জ্বলা মজুমদারের চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সুকুমার (লণ্টু) ঘোষ, মধু বানার্জি, মনোরঞ্জন বানার্জি ও রবি বানার্জির সুদীর্ঘকালের জন্য আন্দামানে দীপান্তর এবং বহু কর্ম্মীর বিনা বিচারে বন্ধন-দশা ঘটা সত্ত্বেও 'বি-ভি'র কার্য্যকলাপ থামতো না, যদি ত্রাসবিহ্বল মহাত্মা গান্ধী বনাম কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো দেশোদ্ধারের কর্ম্ম মুলতুবী রেখে এই সব বিপ্লবী কার্য্যের বিরুদ্ধে সরকারের চেয়েও উচ্চতরকণ্ঠে জনমত বিগড়ে দেবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর না হতেন।

বিপ্লব-কর্ম্ম থেমে যাওয়া সত্ত্বেও 'ব্রিটিশ প্রেষ্টিজ্' ইতিমধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ইংরেজের রাষ্ট্রিক মেরুদণ্ড তখন ক্ষতবিক্ষত। দেবতার পৌরুষ নিয়ে যে জাতি ভারতবাসীকে গোলাম করে রেখেছিল, তার কাপুরুষতা ও ভয়ার্ত্ত রূপ ভারতবাসী দেখে ফেলেছে স্বচক্ষে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের দুর্ব্বার কর্ম্মে ভীতিগ্রস্ত ইংরেজ সমগ্র বাংলার বিপ্লবীদের অনুষ্ঠিত 'লোম্যান-হড়সন্ শুটিং' থেকে শুরু কোরে 'রাইটার্স রেইড', ষ্টিভেন্স-গার্লিক-প্যাডি-ডগলাস-ক্যামারন-এলিসন হত্যা এবং টেগার্ট-ভিলিয়ার্স-নেলসন-ক্যাসেল-ডুর্ণো-জনসন-টয়নাম-গ্র্যাসবি-ওয়াটসন ও ষ্ট্যানলি জ্যাকসন হত্যা-চেষ্টার দাপটে গলদঘর্ম্ম। তাই অবশেষে নিরুপায় ব্রিটিশরাজ আইরিশ-বিপ্লব-শায়েস্তাকারী, 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান'-নীতির আবিষ্কর্ত্তা স্যর্ জন এণ্ডারসনকে এনে ইংরেজের লুপ্ত সম্ভ্রম উদ্ধারে ব্রতী হলেন। সারা বাঙলা দেশের রূপ তখন বিরাট 'ব্যাষ্টিল'-এ পরিণত হল। কিন্তু এণ্ডারসন সাহেব যত বড় দাম্ভিক ও দুর্দ্দান্ত লাটই হোন না কেন, তাঁরই আমলে যখন মেদিনীপুর শহরেই আবার একটি শ্বেত ম্যাজিষ্ট্রেট নিপাত হলেন, দেওভোগ শহরে তাঁরই অনুচররূপী 'হোমগার্ড' হত্যা কোরে মতি মল্লিক ফাঁসী গেলেন ও সুকুমার ঘোষ গুলিবিদ্ধ অবস্থায়ই পালিয়ে

যেতে পারলেন, এবং পরিশেষে তাঁকেই তাক্ কোরে দার্জিলিঙ-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিপ্লবীর গুলি গর্জে উঠল—তখন তাঁর দম্ভের ফানুসও ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ জাতির গৌরব-বিভা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উপায় রইল না। ভারতবর্ষের ভূমিতে বৃটেনের বরাদ্দ স্থান যে বিলুপ্ত হতে চলেছে, এ সত্য ইংরেজ উপলব্ধি কোরল। ভয়কম্পিত ইংরেজ-রাজপুরুষদের সুখ-রবি দুঃখের গগনে অস্তপ্রায়। কাঁটা-তার বেষ্টিত কোয়ার্টারগুলোকে ছোটখাট দুর্গরূপে পরিণত কোরে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হয়ে তৎকালের বাঙলা দেশে তাঁরা বাস কোরতেন, আর তাঁদের সহধর্ম্মিনীরা শিশুদেরকে ঘুম পাড়াবার কালে কম্পিত কণ্ঠে গুণগুণ কোরে বোলতেন: **Sleep on, Baby, Sleep on—Terrorists are Coming**! মেদিনীপুর অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ ললনাদের মাতৃকণ্ঠে শোনা যেতো: **Baby, Sleep on, another April is coming**! বলা বাহুল্য যে মেদিনীপুরের প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসেই নিহত হন। অধিকন্তু ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসেই চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনও সংঘটিত হয়।

বাঙলা দেশের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের কাছে কুমিল্লার ললিত বর্ম্মণ সুপরিচিত। ললিত বাবু '২৬ সালের মাঝামাঝি উল্লিখিত বি-ভি দলের নেতার সংগে পরিচিত হয়ে তাঁর দলের কর্ম্মাদর্শে নূতন প্রেরণা লাভ করেন এবং উক্ত দলের বিশ্বস্ত সভ্যপদ গ্রহণ করেন। ললিত বর্ম্মণের বন্ধুগণ উক্ত দলের একাঙ্গ হয়েই কুমিল্লায় যে বিপ্লব-কর্ম্ম সাধিত কোরেছিলেন তার অপূর্ব্ব পরিস্ফূরণ ঘটেছিল ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স-এর হত্যায়। সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ অভাবনীয় সাহসে ও নৈপুণ্যে কল্পনার অতীত এই হত্যাকাণ্ড সুসম্পন্ন কোরে পৃথিবীর মানুষদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা এতকাল অবলা নারীরূপে যাদেরকে কৃপার চোখে দেখে এসেছে, সেই অবহেলিতা নারীই সর্ব্বশক্তিদায়িনী চণ্ডিকার সার্থক বংশধরা।

বিপ্লবদলের প্রধানতম একটি শক্তি-উৎস হলো পলাতক কর্ম্মীদের জন্যে সংরক্ষিত প্রচুর আশ্রয়স্থল বা 'শেলটার'। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত রাজেন্দ্র গুহ এবং স্বর্গগতা নির্ম্মলা বসুর (বেহালা) নেতৃত্বে এই গুরু দায়িত্ব 'বি-ভি' দলে সম্পূর্ণ হতো। বহু ত্যাগ স্বীকার কোরে এবং দুর্জ্জয় সাহসে দুঃসাহসী হয়ে একান্ত

বিশ্বস্ততার সহিত বিপ্লবমুগ্ধ প্রবীণ এই গৃহস্থত্রয়ী 'বি-ভি'র পলাতক কর্ম্মীদের গোপন বাসস্থান সংগ্রহ কোরে দিতেন। দলের অধিকাংশ সভ্যই সেকালে এঁদের চিনতেন না। আজ দেশের সে দুর্দ্দিন কেটে গেছে। নিঃসংকোচে জনগোচরে এঁদের নাম উচ্চারিত কোরতে পেরে তাই খুশী হতে পারছি। অধিকন্তু বাঙলার শহরে শহরে ও নিভৃত পল্লীগুলির কোলে বহু শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা মা-বোনেরা আশ্রয়দানের কার্য্যে যে মমতা, সাহস ও নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণ কোরে আজ অভিভূত হয়ে পড়ছি। কিন্তু এই সংকীর্ণ স্থান-পরিসরে তাঁদের কর্ম্মকাণ্ড বিবৃত করার সুযোগ নেই ভেবে দুঃখ আমার কম নয়।

পূর্ব্বেই বলেছি '৩৪ সালের পর বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ স্থগিত হয়ে যায়। প্রত্যেক দলেরই নেতৃবৃন্দ ও অসংখ্য কর্ম্মী এতদিন জেলে-জেলে এবং ক্যাম্পে-ক্যাম্পে বন্দী হয়ে গেছেন। 'বি-ভি'র নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য কর্ম্মীও বাঙলা দেশে ও বহির্বাঙলায় কারারুদ্ধ। অধিকন্তু বিপ্লব-দমনের কার্য্যে কংগ্রেস ও নেতৃবৃন্দ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে কিছু কোরবার অবকাশ এখন 'বি-ভি'রও রইল না।

'৩৭ সালের শেষ ভাগে রুদ্ধ কারা-দ্বার পুনরায় খুলে গেল। বন্দীরা দলে দলে মুক্তি পেতে লাগলেন। '৩৮ সালের শেষভাগে বাঙলার নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীগণও মুক্ত হলেন দীর্ঘ আট বৎসরের বন্ধনদশা কাটিয়ে। 'বি-ভি'র কর্ম্মীগণ '৩৮ সালের শেষান্তেই ছাড়া পেয়েছেন, কারণ তাঁদের উপর পুলিশ তথা গভর্ণমেণ্টের আক্রোশের আর সীমা ছিল না। এবার জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পাব্লিক পলিটিক্সে 'বি-ভি' দল অনেকখানি আত্মনিয়োগ করল। এদিকে সরকারী চাপে 'বেণু'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হওয়ায় রাষ্ট্রনীতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'চলার পথে' নামক মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্র তখন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির আসন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জনসাধারণকে তিনি আবেদন জানান: **The now-defunct 'Benu' once provided the opportunity of doing national service to the country through the medium of literature. It ceased to exist due to its own merit in a certain line. That is a long story which is known to the country. The country further knows**

how deep and abiding has been the impression left by it in the minds of youths. The organisers of 'Benu' who are my friends were detained for long years in prison without trial. On their release, they have ventured upon the project of publishing a first class monthly entitled 'Chalar Pathe'. It is my firm belief that.........the journal will exercise a powerful influence upon the minds of my countrymen. I unhesitatingly appreciate the utility of 'Chalar Pathe' for those who are pledged to sacrifice their all to lead the country to liberation through political, social, economic & cultural movements conceived from a newer angle of vision. I fervently pray for the long life of 'Chalar Pathe'. I humbly entreat my countrymen to manifest their sympathy for the journal by helping it in its onward march (Sd/- Subhas Chandar Bose, 38/2, Elgin Road. 30. 1. 39.).

'চলার পথে'র প্রথম সংখ্যাই প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র রূপে বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঙলার প্রথিতযশা বহু কথাশিল্পী, শান্তিনিকেতন ও পণ্ডিচেরী আশ্রমের সুসাহিত্যিকবৃন্দ 'বেণু'র মতোই 'চলার পথে'কে আপন জ্ঞানে গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় শরৎচন্দ্র তখন স্বর্গলোকে —তাঁর স্নেহ ও নেতৃত্ব না-পাওয়া 'চলার পথে'র জীবনের পক্ষে এক পরম বেদনাবহ বঞ্চনা।

'চলার পথে'র আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। পর পর তিন মাস কাগজ চালানর পর সরকারপক্ষ এ-পত্রিকার প্রকাশ নির্ম্মম হস্তে বন্ধ কোরে দিল।

কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মত-বিভেদের ফলেই যে ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি এ সংবাদ সর্ব্বজনবিদিত। এই ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ততম বন্ধু ছিলেন 'বি-ভি' দল। কিন্তু বছর দেড়েকও পার হলো না— ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে, রামগড় কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই, জর্ম্মান সৈন্যবাহিনী যেদিন নরওয়েতে পদার্পণ কোরল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা কঠিনতর হস্তে বাজিয়ে,

কুড়ি

সেদিনই গভীর নিশীথে সমগ্র বাঙলা দেশ থেকে পঁচিশ জন দেশকর্ম্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার কোরে ফেলল—এঁরা প্রত্যেকেই হলেন 'বি ভি'র নেতৃস্থানীয় সভ্য।

আকস্মিক এই ধরপাকড়ে 'বি-ভি'-র কর্ম্মীদের একান্ত ক্ষতি হলেও তাঁদের গোপন সংহতি নষ্ট হলো না। সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক-কর্ম্মের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তৎসঙ্গে 'বি-ভি'র যে-ধারার গোপন যোগাযোগ থাকতে বাধ্য, তা আজো প্রকাশ করা না গেলেও নিঃসংকোচে এইটুকু বলা চলে যে, সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক সকল কর্ম্মের সংগেই 'বি-ভি'-র যুক্ত হয়ে থাকা একান্ত স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষ ছিল। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্হিত হবার পরে আফগানিস্থানের পথে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার্থে সত্যরঞ্জন বক্সী, যতীশ গুহ ও শান্তি গাঙ্গুলির অবদান 'বি-ভি'-র সংগঠন-শক্তি ও মন্ত্রগুপ্তি রক্ষারই কুশল নিদর্শন।

অতঃপর ধীরে ধীরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের তীরে এসে উপস্থিত হলো। সুভাষচন্দ্র তখন 'নেতাজী'র অভ্রংলিহ্ আসনে উদ্ভাসিত। কংগ্রেস বহু পায়তারা করার পর বাধ্য হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্রমশ ভারতবর্ষের সমগ্র জনসাধারণ মহাত্মার আহ্বানে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলনের সূচনা কোরে বোসল। কাজেই সে-ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিপ্লবীদল তাদের যা কিছু সামর্থ্য অবশিষ্ট ছিল তা নিয়েই ১৯৪২ সনের এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কূলেকূলে তখন বেজে চলেছে 'আজাদ্ হিন্দ ফৌজে'র রণবাদ্য, 'ঝাঁসী রাণী বাহিনী'র জয়-ডঙ্কা, 'বাল-সেনা'-দের পদভারে উৎসারিত ধূলিরেণুর ধ্বনি। তখন 'আজাদ্ হিন্দ হুকমতে'র মুক্তি-পতাকা উড়ছে ইম্ফলে, প্রাচীনতম যুগ থেকে দুলতে-থাকা ভারতীয় সীমান্তদেশের সুনীল আকাশে।...'বি-ভি'-র কর্ম্মীরা (তাঁদের নেতৃবৃন্দ ও অসংখ্য সহকর্মী ইংরেজের জেলে-জেলে অবরুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উক্ত নেতৃবৃন্দেরই নির্দ্দেশে) নেতাজীর সেই ব্যাপক রণযাত্রায় অংশগ্রহণ কোরে ধন্য হয়েছেন। দিল্লী ও লাহোর দুর্গে 'বি-ভি'-র কর্ম্মীদেরকে (সত্য বক্সী, যতীশ গুহ, সুধীর বক্সী, সত্যব্রত মজুমদার) অমানুষিক নির্য্যাতন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভোগ কোরতে হয়। এই নির্য্যাতনের ফলেই যতীশ গুহ দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পতিত হন এবং ১৯৪৬ সালে অকালে

তাঁর অমূল্য জীবনদীপ নিভে যায়। এই সূত্রে আর একটি তরুণ শহীদের নাম স্মরণ কোরব—তিনি হলেন গোপাল সেন। পলাতক অবস্থায় পুলিশের তাড়া খেয়ে দোতলার ছাদ থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবন দান কোরে দলের গোপন তথ্য সংগোপনে রেখে দিলেন বালক-বীর চিরকালের জন্য। যাঁরা নেতাজীর সংগ্রামে ভারতবর্ষে বোসে পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কথা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু বর্ম্মার বনে-প্রান্তরে দুর্ম্মদ যে সংগ্রামে নেতাজী মানুষকে উচ্ছলচঞ্চল কোরে তুলেছিলেন তাতে 'বি-ভি'র অংশগ্রহণের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখেছেন যে তরুণ বীর, তাঁর নাম হরিপদ ভৌমিক। হরিপদ ভৌমিকের হাতের ক'টি আঙ্গুল শত্রুর বোমায় গিয়েছে উড়ে—তাতে আজো তাঁর চিত্তে অবসাদ নাবেনি, দুঃখের স্পর্শ স্থান পায়নি।

কিন্তু হাজার বছরের পুঞ্জীভূত পাপের অবসান তখনো ঘটেনি। তাই হার হয়ে গেল জর্ম্মানির। হেরে গেল জাপান। য়্যাংলো-য়্যামেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদ মরেও মরল না, নেতাজীর ভারতবাসীদের দ্বারা ভারতবর্ষকে সশস্ত্র সংগ্রামে স্বাধীন করার মহোত্তম চেষ্টা তাই হলো ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার সাথে সাথে ভারত-অভ্যন্তরের '৪২-এর আন্দোলন শুধু থেমে গেল না, কংগ্রেসের ইংরেজ-তোষণ-নীতি মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াল। বিরাট ব্যর্থতা, কংগ্রেসী তোষণ-নীতি এবং সর্ব্বোপরি সরকার তথা পুলিশের জুলুমে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল জাতি।

জেলে অবরুদ্ধ 'বি-ভি'-র কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ এ বিফলতায়ও হতাশ হলেন না। তাঁরা বিশ্বাস কোরলেন যে, নেতাজীর আরব্ধ কর্ম্ম মৃত্যুহীন। তাঁরা তাই স্থির কোরলেন যে, নেতাজীর সহযাত্রী সর্ব্ব-ভারতীয় যেসব দল 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' কাজ কোরেছে, তাদের সবাইকে নিয়ে নেতাজীর আদর্শে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'কে সমগ্র ভারতবর্ষ-ব্যাপী বিরাট এক 'পার্টি' রূপে গড়ে তুলে সুমুখের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। কারণ, এবম্বিধ এক বিপুল 'পার্টি'-ই কেবল নেতাজীর অসমাপ্ত কর্ম্মকে সমাপ্তির রূপ দান কোরবার সফল দায়িত্ব গ্রহণ কোরতে পারে। অজস্র দলে বিভক্ত বিপ্লবী-সমাজের সাধ্য নেই পূর্ব্ব পন্থায় একটুও এগিয়ে চলার, যেখানে যুদ্ধোত্তর য়্যাংলো য়্যামেরিকান্ সাম্রাজ্য-বিদ্বেষী পুঁজিবাদ-পুষ্ট কংগ্রেসের সঙ্গেও সংগ্রাম সূচিত

হবে প্রতি পদক্ষেপে। কাজেই 'বি-ভি'-র নেতৃবৃন্দ জেলে ও জেলের বাইরে অবস্থিত তাঁদের সমগ্র কর্ম্মীর অভিমত নিয়ে স্থির কোরলেন যে, যেহেতু 'বি-ভি'-র স্বপ্ন ও কর্ম্মাদর্শ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে নেতাজীর 'আজাদ্ হিন্দ হুকমৎ' ও 'আজাদ্ হিন্দ ফৌজে'র রূপ-পরিসরে—সেহেতু বর্ত্তমানে তার একমাত্র করণীয় হল 'বি-ভি'কে ভেঙ্গে দিয়ে 'বি-ভি'রই নিষ্ঠায় ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় সমগ্র ভারতবর্ষে ফরওয়ার্ড ব্লক'কে ('বি-ভি' তথা নেতাজীর আদর্শে ও কর্ম্মপন্থায়) জীবন্ত এক 'পার্টি' রূপে গড়ে তোলা। দল-উপদলের সমস্ত মমতা ত্যাগ কোরে শুধু উল্লিখিত 'পার্টি'কেই ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক কর্ম্মী সর্ব্বানুগত্য না দিলে বড় পার্টি দাঁড়াতে পারে না—এব সে-জন্যই শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বক্সা-ক্যাম্পেই 'বি-ভি'র সভ্যবৃন্দ সমবেত হয়ে তাঁদের 'বি-ভি'দলকে ভেঙ্গে দিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি'র আনুগত্য স্বীকার কোরে উক্ত পার্টির মত-চুম্বক এবং শপথ গ্রহণ কোরলেন। এই পার্টি গড়ার চেষ্টা বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। যেসব অবরুদ্ধ (বাঙলার বিভিন্ন বিপ্লবী-দলের) নেতৃবৃন্দ এই চেষ্টাকে মন-প্রাণে জয়যুক্ত করায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ঘোষ লীলা রায়, অনিল রায়, পূর্ণ দাস, সত্য গুপ্ত, অমলেন্দু দাসগুপ্ত, ডাঃ মিহির মোতায়েদ দ্বিজেন দাস, সুরেন সরকার, দেবেন দে, আস্রাফউদ্দিন চৌধুরী, হরেন ঘোষ রসময় শূর, কমলাকান্ত ঘোষ, ফণী মজুমদার প্রমুখের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

এই সূত্রে এ-ও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নেতাজীর অদ্ভুত কৃতিত্ব ও ঐতিহাসিক নেতৃত্ব কংগ্রেসস্থ প্রাক্তন বিপ্লবী-কর্ম্মীদের চিত্তেও অভূতপূর্ব্ব দোলা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে চার্চিল-লিংলিথ্‌গো অনুসৃত চণ্ডনীতি কংগ্রেস-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। মহাত্মা গান্ধি থেকে শুরু কোরে ছোটবড় নেতৃবৃন্দ এবং অগণিত কর্ম্মী জেলে অবরুদ্ধ, শাসকের রুদ্র শাসনে মানুষের মেরুদণ্ড গেছে ভেঙ্গে, জাতির ভবিষ্যৎ-জীবন দুঃখত্রাস-লাঞ্ছিত জন-চিত্তের কল্পনায় অন্তহীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন পরিপার্শ্বে তখন কেবল একা মাত্র জ্যোতিষ্কই আশার গগনে উদ্ভাসিত যাঁর মহান নেতৃত্বে ভারতের অধিকাংশ সমস্যা সমাধানের রূপই চিহ্নিত, বন্ধুর পথযাত্রায় উদ্যম ও প্রেরণা লাভের মন্ত্র নিহিত। সে মহোত্তম বিপ্লবী নেতাজীর আদর্শ-প্রভাবেই বাঙলার কংগ্রেসেরও বিপ্লবী-কর্ম্মীগণ চঞ্চল

হয়ে উঠলেন ফরওয়ার্ড-ব্লক প্রমুখ বিপ্লবী-সংস্থাগুলির সঙ্গে সদ্ভাব সৃষ্টি কোরে ব্রিটিশদ্রোহী সর্ব্বশক্তির সমন্বয়ে কংগ্রেসকে কেন্দ্র কোরে এমন একটি জাতীয় প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ পুনঃসৃষ্টি করার আগ্রহে, যার অপ্রতিহত আক্রমণে বিরাটতর বিপ্লবের পথে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা সম্ভব। এই স্বপ্নোৎকর্ষতায় সেই কালে কারাগৃহে যাঁরা উৎসুক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন ঘোষ, সুরেশ দাস, ভূপতি মজুমদার, কোহিনুর ঘোষ ও নগেন চক্রবর্ত্তীর কথা বিশেষ কোরে মনে পড়ে।

১৯৪৬ সালে বাঙলার সমগ্র বিপ্লবী-বন্দী যখন মুক্তি পেলেন, গোটা ভারতবর্ষ তখন নেতাজীর স্বপ্নে স্বপ্নবিভোর। এতোকালের জালা ও বেদনা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তম সন্তানের আদর্শ ও কর্ম্মসংঘটনায় আশাচঞ্চল। নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ একটি প্রাণীও বিশ্বাস করেনি। তাঁর আগমন-আকাঙ্ক্ষায় তেমন অবিশ্বাসীর চোখেও আনন্দাশ্রু চক্‌চকিয়ে ওঠে। নেতাজীর সহকর্ম্মী, বিশেষ কোরে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'পন্থী বিপ্লবীদলকে নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়ে সারা বাঙলা আই তখন আশা ও উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত। সে-উচ্ছ্বসতা আজকের বাঙালীর অজানা নয়।

'বি-ভি'-র প্রাক্তন কর্ম্মীদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনাও কম ছিল না। ইতিমধ্যে কোলকাতায় উদ্‌যাপিত 'ভিয়েৎনাম-দিবসে'র সমর্থনে মৈমনসিংহ শহরে উক্ত কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলিতে অমলেন্দু ঘোষ মৃত্যুকে বরণ কোরে শহীদ হলেন, অনীতা বসু গুলির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে বহুকাল হাসপাতালে থাকলেন। আরো ছেলেমেয়ে যাঁরা সেদিন ঘায়েল হয়েছিলেন মৈমনসিংহ শহরে তাঁদের সংখ্যাও বড় কম নয়। মৈমনসিংহ শহরের যুব-সমাজের বুকে আগুন জ্বলে উঠল। জ্যোতিশ জোয়ারদারের কুশল নেতৃত্বে ও বিমল নন্দীর সহকারিতায় ক্রমশ বিরাট স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী (আজাদ্‌ হিন্দ ভলান্টিয়ার্স) ঢাকা-মৈমনসিংহ অঞ্চলে, ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নামে, সংগঠিত হতে থাকল। '৪৭ সালে এ-বাহিনীরই একটি সৈনিক জাতীয়-পতাকা রক্ষার্থে ঢাকা-মৈমনসিংহ লাইনে চলন্ত-ট্রেনে আত্মদান কোরে বাহিনীর সম্মান রক্তলিখনে প্রোজ্জ্বলতর করে গেছেন। নাম তাঁর শচীন কর। ও-বছরেরই শেষের দিকে প্রায় বার হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিক সমবেত কোরে জ্যোতিশ জোয়ারদার এক রাষ্ট্রনৈতিক-সম্মেলন

আহ্বান করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসুর সভানেতৃত্বে। সে-সম্মেলন উপলক্ষে হাজার-হাজার তরুণ ও তরুণী স্বেচ্ছা-সৈনিক ও সৈনিকাদের অভূতপূর্ব্ব কুচকাওয়াজ দেখে শহরবাসী মনে করেছিল তাদের শুভদিন সমাগমের বুঝি বা বিলম্ব নেই!···

কিন্তু রাজনীতি—বিশেষ কোরে শান্ত পরিবেশের রাজনীতি—এক অদ্ভুত বস্তু। 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র জনপ্রিয়তা দেখে বহু সুবিধাবাদীই এ-প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে লাগল, তা ছাড়া কম্যুনিষ্ট-পার্টি-বিতাড়িত এবং কম্যুনিষ্টদের ভাবে ভাবাপন্ন সভ্যদের সংখ্যাও এর সর্ব্বভারতীয় শাখা-উপশাখায় বৃদ্ধি পেয়ে চলল। ফলে, আদর্শগত মতবিভেদের জন্যেই ফরওয়ার্ড ব্লকের 'পার্টি' রূপে পরিণতি লাভ করা আর সম্ভব হলো না। দল-উপদলে জর্জ্জরিত প্লাটফর্ম্ম-রূপী ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্ধকার ভবিষ্যৎ মর্ম্মেমর্ম্মে অনুভব কোরে, অধুনালুপ্ত 'বি-ভি'-র প্রাক্তন সভ্যগণ এক যোগে, শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে, 'Socialist Republican Party' (S. R. P.) নাম দিয়ে 'আই-এন্-এ'র কিয়দংশকে সঙ্গী কোরে এক নতুন পার্টি গড়লেন। তাঁরা মনে করলেন যে, সর্ব্বভারতে নেতাজীর আদর্শানুগ এই সংঘকে 'পার্টি' রূপে রূপদান কোরে যথার্থ কাজ কোরতে পারলেই জাতি নেতাজীর আদর্শকে কার্য্যত উপলব্ধি কোরবে।

যা হোক্, 'বি-ভি-র' ইতিহাস (সংক্ষিপ্ততম রূপে) লেখা আমার সাঙ্গ হয়ে গেছে 'ফরওয়ার্ড ব্লক্ পার্টি' গড়ার উদ্দেশ্যে 'বি-ভি'কে ভেঙ্গে দেবার সাথে-সাথেই। তৎপর অধুনালুপ্ত 'বি-ভি'র* প্রাক্তন কর্ম্মীদের যে রাষ্ট্রনীতিক কার্য্যকলাপ তার সঙ্গে সংঘগত ভাবে অতীতের 'বি-ভি'র কোন যোগাযোগ যে নেই এবং থাকতেও পারে না—এ-সত্য সবারই বোধগম্য। 'বি-ভি' এখন আর দল হিসেবে বেঁচে নেই। 'বি-ভি' এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আদর্শবাদ রূপে মৃত্যুহীন সত্তায় বেঁচে আছে। যে নিয়মানুবর্ত্তিতা, নিষ্ঠা, সংঘশক্তি, ত্যাগ, দুঃসাহস ও আত্মগুপ্তি-শিক্ষা অনাহত সাধনায় 'বি-ভি' দল মানুষ-হয়ে-ওঠার আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে তা' ছড়িয়ে রয়েছে শহিদবৃন্দের রূপজ্যোতিতে মূর্ত্তি ধোরে। সেই আদর্শ কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে আর নেই, সে-আদর্শ চিরকালের জন্যই হয়ে আছে সর্ব্বজনের ও সর্ব্বদেশের।

---

* (Secret Revolutionary Party.)

মেদিনীপুরে দীনেশ গুপ্ত অর্থাৎ বি-ভি

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামক বিপ্লবীদলের তরফ থেকে গুপ্ত-সমিতি গড়ার গুরু দায়িত্ব নিয়ে ঢাকার দীনেশ গুপ্ত (ঢাকার-ই প্রিয় দাশ-গুপ্ত ও কমেট দাস-গুপ্ত সহ) মেদিনীপুর যান। দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুর কলেজে ভর্ত্তি হন। মেদিনীপুর তখন শাসমলের আদর্শে কর্ম্মমুগ্ধ। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে তরুণের প্রাণ আন্দোলিত হয় না—বিশেষতঃ বাঙলার তরুণের। সত্যেন বসুর মেদিনীপুর সত্যেন বসুকে ভুলে গেলেও সত্যেন বসুর আদর্শকে যে অজ্ঞাতে তখনো ভালবাসতো তা দীনেশ গুপ্ত কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন। মেদিনীপুরের তরুণ-কিশোরদের মধ্যে তাই স্বল্পকালেই দীনেশ বৈপ্লবিক চেতনা সম্বুদ্ধ কোরতে পারলেন। "বেণু" ও "চলার পথে" ছেলেদের পথ চলার আদর্শকে রহস্যঘন আকর্ষণে ক্রমশ দুর্দ্দমনীয় ও দুঃসাহসী করে তুলল। তারা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের আগ্রহে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার মন্ত্র জপ করা শুরু কোরে দিল। দীনেশ গুপ্তর অনন্যসাধারণ প্রভাব, কর্ম্মশক্তি ও সংঘ-সংগঠনের ফল স্বরূপই তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠল বঙ্গীয় 'বি-ভি' দলের মেদিনীপুর শাখা। এই শাখার বৈপ্লবিক কর্ম্ম আজ ইতিহাস-বিশ্রুত। সে কর্ম্ম-কাণ্ডেরই কিছুটা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ কোরবো।

১৯৩১ সনের ২৭শে এপ্রিল। মেদিনীপুরের দুর্দ্ধর্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডি সাহেবের পতন সংবাদ বাঙলা দেশে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি কোরল। ইতিপূর্ব্বে বিনয় বসু একা লোম্যান্ সাহেবকে হত্যা কোরে এবং হড্‌সন সাহেবকে ঘায়েল কোরে অভূতপূর্ব্ব রেকড সৃষ্টি করেছেন ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক ইতিহাসে। তৎপর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর অলিন্দ-যুদ্ধে সিম্পসন্‌কে হত্যা কোরে এবং নেলসন্-টয়নাম্ প্রমুখ আই-সি-এস্ গোষ্ঠীর প্রধানদেরকে জখম কোরে বিনয়-বাদল-দীনেশ শৌর্য্যের চোখ-ঝলসানো দ্যুতি বিচ্ছুরিত কোরে হলেন শহিদ। তথাপি ইহার পরই আরো একটি দুঃসাহসী বৈপ্লবিক কার্য্যের সঙ্গে পরিচিত হবার কল্পনা বোধ হয় ছিল-না ইংরাজের পদভারে-পিষ্ট পঙ্গু জনসাধারণের। অথচ ঘুমন্ত নির্জীব ভারতবাসীর চৈতন্যে প্রচণ্ডতম আঘাতে সাহসিকতার সামর্থ্যবোধ জাগ্রত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিপ্লবী। আজ তাঁরা

বোঝাতে চান যে যাকে ভয় করা হয় ইংরাজ বোলে, যাকে মনে করা হয় তোমার চেয়ে শক্তিমান এবং তোমার অবধ্য, যার পদতলে বোসে থাকার বিধানই ভগবৎদত্ত বিধান বোলে ধরে নেয়া হয়—আজ প্রচণ্ড আঘাতে তোমার ধারণাগত যত ভুল যাক টুটে। আজ চেয়ে ছাখো সেই শক্তিশালী অবধ্য শক্র ধরার ধূলায় লুণ্ঠিত, বিপ্লবীর পদতলে গড়িয়ে রয়েছে তার মৃতদেহ !—

মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে প্যাডি সাহেব গিয়েছিলেন সেদিন যেন মৃত্যুরই আহ্বানে। সহসা গর্জ্জে উঠল বিপ্লবীর পিস্তল। দুর্দ্ধর্ষ প্যাডি হলেন ধরাশায়ী ! বরিশালের বিমল দাসগুপ্ত ও মেদিনীপুরের জ্যোতিজীবন ঘোষের এই কীর্ত্তি তরুণ-বাঙলার অক্ষয় কীর্ত্তি। উভয়েই পালিয়ে এলেন ! জ্যোতি জীবনের নাম-ও কেউ জানলো না। পলায়ন কালে জনৈক ব্যক্তি বিমলকে চিনে ফেলায় তাঁর নাম রটে গেল। তাঁকে ধোরে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হল আড়াই হাজার টাকা। কিন্তু পলাতক বিপ্লবীর খোঁজ অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

কিন্তু ১৯৩১ সনের ২৯শে অক্টোবর বিমল দাস-গুপ্ত আত্মপ্রকাশ কোরলেন। সে আত্মপ্রকাশ অসহ্য পদভরে প্রকম্পিত। থর্থর কোরে কেপে উঠল কোলকাতা মহানগরী। দুর্গের মত সুরক্ষিত ছিল ইংরাজ বণিকের বাণিজ্য-প্রাসাদ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটস্থ গিলিণ্ডার্স হাউস্। সেখানে দ্বিপ্রহরে কর্ম্মরত ইউরোপীয় য়্যাসোসিয়েশান্-এর সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স। এ সেই ভিলিয়াস' এবং সেই বণিক-সমিতির সভাপতি যাঁর নির্লজ্জ শক্রতা ভারতবাসীর ভুলবার নয়। এঁরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তম্ভ এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সর্ব্বাধিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্র। বিমল দাস-গুপ্ত মৃত্যুদূতের মত রিভলভার হস্তে গিলিণ্ডার্স হাউসে ভিলিয়ার্স-এর কক্ষে ঢুকে তাঁকে কোরলেন ঘায়েল। বেচারা বৃহৎ সাহেব বৃহৎ টেবিলের নীচে পলায়ন কোরে পেলেন কোনক্রমে অমোঘ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা। কিন্তু সেই শক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হলো না বিমলের। বন্দী হলেন বিমল।

তাঁর বিরুদ্ধে প্যাডি-হত্যার মামলা রুজু করা হল। ভেস্তে গেল সে মামলা। কারণ, মেদিনীপুর থেকে একটি সাক্ষী যোগাড় করাও মহামান্য ইংরাজ-শক্তির পক্ষে

ম্ভব হলো না !···ভিলিয়ার্সকে হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কিত মামলায় অবশ্য দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হলেন বিমল।

বাঙলার তৎকালীন অবস্থা একান্তই ভয়াবহ। ইংরাজ কৃত সন্ত্রাসবাদ নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার নির্লজ্জতায় বাঙলার নরনারীকে তখন সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। পুলিশ ও মিলিটারীর ত্রাসসঙ্কুল রাজ সর্ব্ব-বাঙলায় বিরাজিত। ঢাকা, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে তার জ্বালা অত্যধিক। এমন কালে ১৯৩২ সনের ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ডগ্‌লাস সাহেবের হত্যা-সংবাদ প্রচারিত হল। জিলা বোর্ডের এক সভায় অগণিত সশস্ত্র সান্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে ডগ্‌লাস যখন মেদিনীপুরের ভাগ্যনিয়ন্তার কর্ম্মে লিপ্ত, তখন বিধাতার নির্দ্দেশে বাঙলার বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য একটি সঙ্গী সহ (প্রভাংশু পাল) ছদ্মবেশে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্বেতপুরুষের দম্ভ বিচূর্ণ কোরে তাকে মৃত্যুর দ্বারে পাঠিয়ে দিলেন। কর্ম্মসম্পাদন কালে চিত্রার্পিতের ন্যায় বন্দুকধারিগণ পর্য্যন্ত ছিল দাঁড়িয়ে। তারপর দুই রুদ্র-কিশোরের অন্তর্দ্ধানের সাথে সাথেই সাজসাজ রবে পাহারার দল ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটলো চতুর্দ্দিকে তাঁদের অনুসরণে।

কিছুদূর চলে যাবার পর প্রদ্যোৎ বুঝলেন যে দু'জনেরই ধরা পড়া অনিবার্য্য। তখন সঙ্গীকে পালিয়ে যাবার ফুরসৎ দিয়ে প্রদ্যোৎ রুখে দাঁড়ালেন ডগ্‌লাসের সশস্ত্র অনুচরদেরকে। আহত প্রদ্যোৎ অবশেষে বন্দী হলেন। তাঁর সাথী অনায়াসে গেলেন পালিয়ে। ইংরাজের পুলিশ আজও সেই পলাতক বিপ্লবীর সন্ধান পায় নি।

বন্দী প্রদ্যোৎ-এর উপর চলল অমানুষিক অত্যাচার গোপন তথ্য বার করার উদ্দেশে। সন্দেহক্রমে প্রদ্যোতের একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও গ্রেপ্তার করা হলো, যাঁর উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনী নির্লজ্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষেও এক লজ্জাকর কুকীর্ত্তি। বুটের লাথি, ডাণ্ডা, ঘুষি, বেত সব কিছুই পুরাদমে চালিয়ে হঠাৎ পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ফণী দাসের উপর মার বন্ধ করল এই প্রত্যয়ে যে সে মরে গেছে! কিন্তু ফণী মরেন নি। এ সত্ত্বেও বীর ফণীর কাছ থেকে একটি গোপন কথাও প্রকাশিত হল না। কারণ মেদিনীপুরের তরুণদল যে তাঁদের নেতা দীনেশ গুপ্তর দীপ্তশিখায় পথ চলার সৌভাগ্য লাভ করেছেন! তাঁরা, ফাঁসির মঞ্চে সত্যেন-দীনেশ যে জয়গান গেয়ে গেছেন তার আহ্বানে হৃৎপিণ্ড দান কোরবার জন্যে যে একান্ত ভাবে-ই তৈয়ের!

আটাইশ

১৯৩৩ সনের ১২ই জানুয়ারি প্রদ্যোতের হল ফাঁসি। তাঁর বাণী ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ কোরে উচ্চারিত হল পদানত ভারতবাসীর উদ্দেশে : "আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগোরে সকল দেশ !"...

আবার এলো ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের একটি দিন। মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের প্রায়শ্চিত্ত কোরবার তারিখ হল ২রা সেপ্টেম্বর।...অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। মেদিনীপুর শহরে পুলিশ-গ্রাউণ্ডে হবে ফুটবল খেলা মহম্মদিয়া ক্লাব ও টাউন্ ক্লাবের মধ্যে। ব্রিটিশ অফিসারগণ অংশ গ্রহণ কোরবেন এই খেলায়। সমগ্র মাঠের চতুর্দ্দিক সশস্ত্র বাহিনী ও লাঠিধারী পুলিশে ঘেরাও। গুপ্তচরের দল ও-অঞ্চলের সর্ব্বত্র ছেয়ে ফেলেছে। তা ছাড়া খেলার মাঠখানা আবার জেল ও আর্মারির মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং নির্ভয়ে ইংরাজকুল সখের ফুটবল খেলার আয়োজন কোরলেন অমন দুর্দ্দিনেও। কিন্তু বিপ্লবীর ধর্ম্মই হলো দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে অতিক্রম কোরে জয়ের পদধ্বনি রচনা করা। এই দুর্ভেদ্য ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে তাই বিপ্লবীদল অনুপ্রবিষ্ট হলেন ঠিক যাদুকরের মত।

বিভিন্ন গাড়িতে ক্রীড়াস্থলে সবে মাত্র এসেছেন মিঃ বার্জ, মিঃ জোন্স, মিঃ স্মিথ, মিঃ লিণ্টন ও জঙ্গী কমাণ্ডাণ্ট—এবং বার্জ সাহেব নামছেন মোটার থেকে—ঠিক এমনি সময় বার্জ-এর উপর পিস্তল হস্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্ব্বার গতিতে অনাথ পাঞ্জা। তৎসঙ্গেই তাঁর অপর সঙ্গীরাও ছুঁড়লেন গুলি। জোন্স ও বার্জ গুলিবিদ্ধ হয়ে ধূলায় গড়ালেন। জঙ্গী কমাণ্ডাণ্ট ফুল্-স্পিড-এ গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে গেলেন। এ দিকে অগণিত সান্ত্রীর সঙ্গে বিপ্লবীদের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অনাথের পিস্তল গুলিশূন্য হওয়ায় ঐ যুদ্ধক্ষণেই তিনি পুনরায় সে-পিস্তলে গুলি ভরে বার্জ-এর বুকে ব্যাঘ্রশিশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পর পর তাঁর সবগুলো গুলি বার্জ-এর বক্ষ দীর্ণ কোরে দিল। অনাথ পাঞ্জা ও মৃগেন দত্ত পুলিশের গুলিতে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন। পরাধীন দেশের ধূলিতল তার মুক্তিদাতা সন্তানের রক্তধারায় তর্পণ করে উঠল।

অপর সঙ্গীরা ইতিমধ্যে উধাও হয়ে গেলেন। বিভ্রান্ত পুলিশ ও স্পাইবৃন্দ তাঁদের সন্ধান পেল না! অবশ্য ঘণ্টা চারেক পর ধরা পড়লেন ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ রায়, নির্ম্মলজীবন ঘোষ ও নন্দদুলাল সিংহ। এঁদের উপর কি নির্ম্মমতায়ই

উনত্রিশ

না অত্যাচারের মাত্রা নিষ্ঠুরতম রূপ গ্রহণ করেছিল! সমগ্র মেদিনীপুর জুড়ে ইংরাজের সন্ত্রাসবাদ পুলিশ ও সৈন্যের মাধ্যমে বলগা-ছাড়া বেগে অনুষ্ঠিত হয়ে চলল। জনসাধারণ সে-অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেল না। নির্ম্মলজীবনের ছোট ভাই নবজীবন অত্যাচারের কশাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কিন্তু সেই মৃত্যুবার্ত্তায় বাঙলার তরুণের তারুণ্যে প্রত্যয়লিখা দৃঢ়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্ম্মলজীবনের ফাঁসির হুকুম হল। কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন, সনাতন রায় ও নন্দদুলাল সিংহের হল যাবজ্জীবন দীপান্তর। তৎপর এই প্রসঙ্গেই সাপ্লিমেণ্টারি কেস্-এ ঢাকায় শান্তি সেন-ও সাজা পেলেন যাবজ্জীবন দীপান্তরের।

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ঘনিয়ে এলো ২৫শে অক্টোবার। বীর ব্রজকিশোর ও বীর রামকৃষ্ণ ফাঁসির মঞ্চে জয়গান উচ্চারিত কোরলেন। কিন্তু তাতেই শেষ নয়! আবার এলো ২৬শে অক্টোবর। বীর নির্ম্মলজীবন সেদিন ফাঁসির রজ্জুকে চুম্বন কোরে মৃত্যুঞ্জয়ীর নির্ম্মল বিভায় প্রদীপ্ত হয়ে রইলেন।

মেদিনীপুর জেলের সেই দুইটি দিবস পরাধীন জাতির ইতিহাসে এক তপস্যাক্ষরা মুহূর্ত্ত। সমগ্র জেলে নারীপুরুষ যত বন্দী (হাজার হাজার সাধারণ কয়েদী ও অজস্র রাজবন্দী) এবং অফিসার-ওয়ার্ডার পর্য্যন্ত সবাই ঐ দিবসদ্বয় সর্ব্বক্ষণই শহীদকুলের বীরত্ব প্রবাহে তন্ময় হয়ে ছিল, তাদের কাতর কামনায় কেবলই বুঝি ঐ একই জিজ্ঞাসা রহিয়া রহিয়া ব্যাপ্ত হয়ে উঠছিল :

> "বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
> এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?"

দীনেশ গুপ্তর চিঠি

এক

আলিপুর সেনট্রাল জেল,
৩০শে জুন, ১৯৩১
কলিকাতা

মা,

যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়ত ভাবিতেছ, ভগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ তাঁহার কানে পৌছায় না। ভগবান কি আমি জানি না, তাঁর স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তবু এ কথাটা বুঝি, তাঁর সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁর বিচার চলিতেছে। তাঁর বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে সে-বিচার মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া?

মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজুবুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দু'দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য?

যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল। মৃত্যু যে মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

তোমার নসু

দুই

[দ্বিতীয় পত্র এই গ্রন্থের ১৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে]

তিন

আলিপুর সেনট্রাল জেল,
১৮ই জুন, ১৯৩১, কলিকাতা

বৌদি,

তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অসময়ে কাহারো জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। যাহার যে কাজ করিবার আছে, তাহা শেষ হইলেই ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি কাহাকেও ডাক দেন না।

তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত, "কেন ডাকাইছ আমার মোহন ঢুলী?" যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, তাহাকে আর ষ্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়া পুতুল নাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে আপশোষ করিবার কি আছে?

পৃথিবীর যে-কোন ধর্ম্মমতকে মানিতে হইলেই আত্মার অবিনশ্বরতা বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, একথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান-ধর্ম্মও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তার রু কবজ্ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, "আ্যায় রুহ্, নিকল্ ইস্ কালিব্‌সে, চল্ খুদাকা জান্নৎমে।" অর্থাৎ তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল্। তাহা হইলে বোঝা গেল, মানুষ মরিলেই তার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমানধর্ম্মের এ বিশ্বাস আছে। খৃষ্টান-ধর্ম্ম বলে, "Very quickly there will be an end of thee here; consider what will become of thee in the next world."—অর্থাৎ দিন তো তোমার ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোঝা গেল খৃষ্টানধর্ম্ম-ও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। এই তিন ধর্ম্মের কোন একটা স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই। আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই।

ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্ম্মপ্রবণ। ধর্ম্মের নামে ভক্তিতে আমাদের পণ্ডিতদের টিকি খাড়া হইয়া উঠে। তবে আমাদের মরণের এত ভয় কেন? বলি ধর্ম্ম কি আছে আমাদের দেশে? যে দেশে দশ বছরের মেয়েকে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ ধর্ম্মের নামে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশে ধর্ম্ম কোথায়? সে দেশের ধর্ম্মের মুখে আগুন। যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চাইতে বড় ধর্ম্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই ভাই খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি। এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবেন, না খোদা বেহস্তে আমাদিগকে স্থান দিবেন?

যে দেশকে ইহজন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছি, যার ধূলিকণাটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে পরম পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তার সম্বন্ধে এসব কথা বলিতে হইল।

আমরা ভাল আছি। ভালবাসা ও প্রণাম লইবে।

—স্নেহের ছোট-ঠাকুরপো

চার

আলিপুর সেনট্রাল জেল,
২৯-৩-৩১,
রবিবার,
কলিকাতা

শ্রীচরণেষু,

বৌদি, গত কল্য তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমাদের ফাঁসির হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

বৌদি, এজন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। জানি, বিদায় দিতে তোমাদের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব বিদায় যে লইতেই হইবে।

আজ অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই যেদিন তোমাকে আমার বৌদি রূপে পাইলাম সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই আমার চোখের

সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশ বৎসর বয়স হইতে এই বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত অনেক যন্ত্রনাই দিয়া আসিয়াছি। সমস্তই তুমি স্নেহের অত্যাচার রূপে হাসিমুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছ, কখনও বিরক্ত হও নাই, কখনও মুখ ভার করিয়া থাক নাই। চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বার্লি, আহারে তোমার হাতের রান্না আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে কেন, আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত আন্তরিক ভালবাসা দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিলে। সেদিন পর্য্যন্ত, আমার যদি অনেক টাকা হয় তবে তোমার কি কি প্রিয় জিনিষ আমি তোমায় উপহার দিব, সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কল্পনা মনে মনে করিয়াছি। যাক্ ভগবান জন্মজন্মান্তরে তোমার মত বৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই প্রার্থনা।

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে, তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তা বলিতে পারি! তবে আমার মনে হয়, মরণকে আমরা বড় ভয় করি, তাই মরণের কাছে আমরা পরাজিত হই। এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় করিলে ধর্ম্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি—আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, "আমিই সে। আগুন আমাকে পুড়িতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয়।" গীতা বলিয়াছেন,—শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী।

তুমি বলিবে এ সব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না, মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্ম-সমর্পণ। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। আমরা যতই জপতপ করি না কেন, যতই ফোঁটাতিলক কাটিনা কেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই? তাঁহাকে

চৌত্রিশ

যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তার কাছে একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাঁকে তেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিল বাংলার নিমাই, প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট—আর আমাদেরই দেশের সে-সব ছেলেরা, যারা হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল।

মনের আবেগে আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদের কষ্টের কারণ আমি হইয়াছি জানিয়া আমি নিজের মনেও কম ব্যথা পাই নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।

আমার সঙ্গীটী এখন বেশ ভালই আছে। অসুখবিসুখ আর নাই। আমিও ভালই আছি। ভালবাসা জানিবে। ইতি—

স্নেহের ঠাকুরপো

পাঁচ

আলিপুর সেনট্রাল জেল,
কলিকাতা

মণিদি,

কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। বলেছিলাম রবিবারেই আপনার চিঠির উত্তর দেব, কিন্তু ছ'দিন পেছিয়ে পড়লাম, যদিও এতে আমার দোষ বিশেষ কিছুই নাই। নূতন বছর সুরু হয়েছে, 'আটত্রিশ সনের ভেতর' সাইত্রিশ সন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। নূতনের কাছে পুরাতন হার মেনেছে। গাছের জীর্ণ পাতা ঝ'রে পড়ে নব কিশলয়কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই-ই নিয়ম। নিরন্তর ভগবানের চিরনবীন সত্যমূর্ত্তি এর ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের যত নিয়ম-কানুন সবই উল্টো; এখানে বুড়োরা সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের একেবারে অচল, অনড় করে রেখে দিয়েছে। গদী ত ছাড়বেই না, বরং সময়-অসময় চোখ রাঙাবে আর এঁড়ে গলায় চিৎকার করে এ কথাই জানিয়ে দেবে যে বুড়ো হয়ে চোখকাদ আর আত্মসম্মানের মাথা না খাওয়া পর্য্যন্ত কেহই কোন কার্য্যের যোগ্য হয় না। আমাদের দেশে তরুণেরাও সাপের মাথায় ধূলো-পড়ার এ সব কথা শুনে নিজেদের বল-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এটা তারা কিছুতেই বুঝবেনা যে, বৃদ্ধ ও

তরুণের মত ও পথ চিরকাল ভিন্ন। এদের এক করতে গেলে হয় তরুণকে বৃদ্ধ হ'তে হবে, নয় ত বৃদ্ধকে তরুণ হ'তে হবে। এদেশে তরুণই বৃদ্ধ হয়। ভালবাসা জানবেন।

—স্নেহের দীনেশ

ছয়

১৯-৬-৩১

আলিপুর সেনট্রাল জেল,

কলিকাতা

স্নেহের বোন,

পুঁটু, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। চিঠিও লিখতে ইচ্ছা হ'ল। তুমি বোধ হয় নিবেদিতার নাম শুনেছ। তাঁর জীবনচরিতখানা জোগাড় করে পড়বে। দেখবে তিনি দুঃখী-প্রপীড়িতের জন্য নিজকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন—পূজোর ফুল যেমন ক'রে ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করে। অপবিত্র হ'লে পূজোর ফুল দিয়ে যেমন পূজো হয় না, তেমনি অপবিত্র দেহ নিয়ে নারায়ণের সেবা করা যায় না। ভগিনী নিবেদিতা তাই নিজকে রেখেছিলেন অনাঘ্রাত পুষ্পের মতই পবিত্র ও নির্ম্মল।

মেয়ে-পুরুষ যেকোন বড় কাজ করতে চাক্‌না কেন, পবিত্রতার সাধনা ভিন্ন তা অসম্ভব। পবিত্রতার দৃঢ় ভিত্তি না থাকলে দু'দিন পরে সব কল্পনা তাসের মত উড়ে যায়। দেখনা, কত লোকে কত বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের বেলা সব ঢুঢু। কেন এমন হয়, জান? পবিত্রতার, আত্মার নির্ম্মলতার অভাব।

মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য উমার তপস্যার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। এর অর্থ কি জান? কঠোর তপস্যা ভিন্ন, সংযম ও পবিত্রতা অবলম্বন না করলে কেউ শ্রেয়কে লাভ করতে পারে না, সাধনায় সিদ্ধি হয় না। তেমনি তোমার জীবনের সুমুখে যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে তবে আজ যেমন পবিত্র আছ তেমনি চিরজীবন থাকতে হবে। আর যদি উচ্চ লক্ষ্য না থাকে তবে গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন ক'রে সংসারের তুচ্ছ সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিও ক্ষুদ্র তৃণের মত। ভাল আছি—

নসুদা

ছত্রিশ

সাত

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
৩০-৬-৩১,
কলিকাতা

খুকুদি,

তোমার চিঠি পেলাম। মানুষ কোন কাজই করতে পারে না। আনন্দিত মনে যদি না সে-কাজটাকে সে ভালবাসে। সংসারী ব্যক্তি সংসারের জন্য দিনরাত খেটে যাচ্ছে কেন? সংসারকে সে ভালবাসে তাই। সন্ন্যাসী কেন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে? সৎকে সে ভালবাসে, তাই সৎকে পাবার জন্য তার এই প্রচেষ্টা।

ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিষ।

যে যাকে ভালবাসে তার জন্যে প্রাণ দিতেও কি সে কুণ্ঠিত হয় কখনও? মানুষের বড় বড় কাজ দেখে আমরা অপরিসীম বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকি। ভাবি, একাজ সে করল কেমন করে? কিন্তু মূল খুঁজলে পাওয়া যাবে ভালবাসার প্রস্রবণ। তারই সরস রসে সিঞ্চিত হয়ে মানুষ দিতে পারে হাসি-মুখে আত্মবিসর্জন। কঠিন কাজ হয়ে পড়ে অতি সোজা।

ভালবাসা হিসেব জানে না।

বেহিসাবে উছলে পড়াই তার স্বভাব। আপনাকে বিলিয়ে দিতে যে চায়, প্রতিদানে ভিক্ষার কণা পাবার দুর্বুদ্ধি তার নেই। তাই সে সুন্দর, অতুলনীয়। দিয়েই যায় সে, নেয় না কখনও।

আমাদের সব চেয়ে মুস্কিল হল কি জান? আমাদের ভালবাসার গণ্ডী বড় সঙ্কীর্ণ, বড়ই অল্প পরিসর। একে বড় করতে হবে। পারবে না?

ভালবাসার সাধনা করতে হয়। স্বার্থত্যাগ সে-সাধনার প্রথম কথা। স্বার্থ আমাদের বড় জড়িয়ে ধরে; তাই কিছু করতে পারিনা।

পারব, আমরা সব পারব। যার কাছে গিয়ে ভালবাসা আপন উৎস খুঁজে পায়, তিনি আমাদের হৃদয়ে উৎসারিত ভালবাসা দেবেন—সে ভালবাসা তাঁকেই উৎসর্গ করে ধন্য হয়।

ভালবাসা ও প্রণাম জানবে। —স্নেহের নমু

আট

আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেল,
৫॥টা (সন্ধ্যা),
৬-৭-৩১,
কলিকাতা

মা,

তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।

তোমার কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না-করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহই বুঝিবে না, বুঝাইতে চাই-ও না।

আমার যত দোষ, যত অপরাধ দয়া করিয়া ক্ষমা করিও।

আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

-তোমারই নমু

নয়

আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেল,
কলিকাতা

স্নেহের বোন প্রতিভা,

তোমাকে অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু বলা হইল না। দোষ আমার নয়। যেদিন আসিতে বলিয়াছিলাম, আস নাই। তাই আর সুযোগও হয় নাই।

জানি, অনেক বাধাবিঘ্ন তোমাকে ভাঙ্গিয়া চলিতে হইবে; কিন্তু অর্দ্ধেক পথে তুমি থামিয়া যাইবে না—সেই বিশ্বাসও আছে, অল্প দিনের ভিতরই তোমার সব পরিচয় আমি পাইয়াছি। এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি—ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে।

—নমু

দশ

আলিপুর সেনট্রাল জেল
৫॥টা (সন্ধ্যা),
৬-৭-৩১,
কলিকাতা

স্নেহের ভাইটি,

তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে জীবন-সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া আজ তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হউক।

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না, ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া-আসা-ই বিশ্বকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, তার বুকের প্রাণ-স্পন্দনকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

তোমার—দাদা

এগার
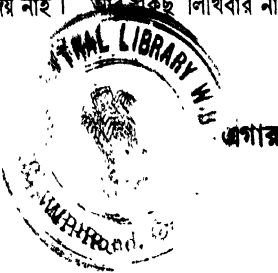
আলীপুর সেনট্রাল জেল,
কলিকাতা

বৌদি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব বল তো? আমার সব কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে। এ জন্মের মত বিদায়। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

তোমার—ঠাকুরপো

সমাপ্ত